তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

কোর্স কোড: **HSC-1853**

হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

কোর্স কোড : HSC-1853

হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম

(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

রচনায়

অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু

প্রো-উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

ও

অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এবং

সাবেক অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান

রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মো: দুলাল মাহমুদ

প্রভাষক (আইসিটি), ওপেন স্কুল, বাউবি।

রুবাইয়া রহমান

প্রভাষক (কম্পিউটার সায়েন্স), স্কুল অব এডুকেশন, বাউবি

মানজিরা আকন্দ নিশি

প্রভাষক (কম্পিউটার সায়েন্স), এসএসটি, বাউবি।

মো: মনোয়ারুল ইসলাম

প্রভাষক, সিএস.ই বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সম্পাদনায়

জাহেদ মাননান

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়।

সমন্বয়কারী

মো: দুলাল মাহমুদ

প্রভাষক (আইসিটি), ওপেন স্কুল, বাউবি।

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

কোর্স কোড : HSC-1853
এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১৭

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

চিত্র
লেখকদ্বয় কর্তৃক সরবরাহকৃত এবং সংগ্রহ।

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ শরিফুল ইসলাম

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN 978-984-34-3146-2

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি **কোর্স কোড : HSC 1853**

জাতীয় জীবনের উন্নয়নে ও গতিশীল জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। সুশিক্ষিত জনশক্তি ছাড়া দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা ও প্রাথমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে গড়ে তোলা। তাই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অনেক বিস্তৃত ও পরিবর্তনশীল বিষয়। প্রতিনিয়তই এই বিষয়ে ব্যাপক উন্নয়ন ও গবেষণা হচ্ছে। এখন জীবনের প্রতিটি শাখায় এর ছোঁয়া লেগে আছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে একজন মানুষ বিশ্বের যে কোন প্রান্তে অবস্থানরত আরেক জনের সাথে খুব অল্প সময়ে সহজেই যোগাযোগ করতে পারছে। এর সঠিক ব্যবহার শিল্প থেকে শুরু করে মানুষ তার ব্যক্তি জীবনেও আশাতীত উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের এক কার্যকর মাধ্যম। বর্তমান সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উদ্ভাবন আর অর্থনীতির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় বিবেচ্য এক বিষয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্য হারে শুধু উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তোলেনি, পাশাপাশি তা মানবসমাজের সামনে সুযোগ করে দিয়েছে উন্নত জীবনযাপন ও সহজতর উপায়ে কর্মসম্পাদানের। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নত কিংবা উন্নয়নশীল অথবা তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশেই ব্যবসায়ে, শিক্ষায়, বিশ্ব পর্যায়ে মিথস্ক্রিয় যোগাযোগ ইত্যাদিতে এনেছে এক নয়া দিগন্ত, এক নয়া বিপ্লব ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি প্রয়োগিক বিষয়। বর্তমান যুগোপযুগী শিক্ষার ধারা এবং সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনার আলোকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বাধুনিক তথ্য, কৌশল ও রীতি নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় উৎকর্ষতা সাধনের ভিত্তি তৈরি করতে পারেন।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীরা যাতে এই বই পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হল :

- ইউনিটের শিরোনাম, ভূমিকা ও উদ্দেশ্য পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন। কোথাও চিত্র থাকলে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তু মিলিয়ে পড়ুন।
- কোন ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- প্রতিটি ইউনিটের বিষয়গুলো ভালভাবে বোঝার ক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীর কাজ (অ্যাকটিভিটি) সংযোজন করা রয়েছে। ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালভাবে অধ্যয়ন করে অ্যাকটিভিটিগুলো সম্পন্ন করুন।
- অধ্যয়নের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের সমস্যাগুলো নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করুন। বই-এর শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি

আবারও ভাল করে পড়ুন এবং সমস্যার সঠিক সমাধানের চেষ্টা করুন। চূড়ান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রয়োজনে সহপাঠিদের সাথে সমস্যার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন, দেখবেন সমাধানের পথ সহজ হয়ে গেছে।

- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল ইউনিটকে কতটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রত্যেক টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোনো ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের (শিক্ষকের) সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে সম্পূর্ণ কোর্স মডিউল এর কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে এই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো-

 কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	 কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	 উদ্দেশ্য	 বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	 শিক্ষার্থীর কাজ	 সারসংক্ষেপ
 পাঠোত্তর মূল্যায়ন	 চূড়ান্ত মূল্যায়ন	 উত্তরমালা	 ভিডিও বা দেখা	 অডিও বা শোনা	 সাহায্য/প্রয়োজনে

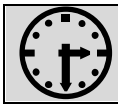 **কোর্স সমাপ্তির সময়**	**কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩৬ সপ্তাহ।**

	সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–	**আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর** **অথবা,** **মোঃ দুলাল মাহমুদ** প্রভাষক (আইসিটি) ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

পাঠ্যসূচি

ইউনিট ১ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঃ প্রাথমিক ধারণা

তথ্য, উপাত্ত এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ও অবদান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপাদান।

ইউনিট ২ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বিশ্বগ্রামের ধারণা, বিশ্বগ্রামের ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানসমূহ, টেলিকন্‌ফারেন্সিং এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা, সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা।

ইউনিট ৩ : কমিউনিকেশন সিস্টেম

কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা ও বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম, ডাটা কমিউনিকেশনের ধারণা, ডাটা কমিউনিকেশন এর উপাদান ও ব্যান্ডউইডথ, ডাটা ট্রান্সমিশনের মেথড এবং মোড, ডাটা কমিউনিকেশন এর মাধ্যম এবং প্রকারভেদ, তার মাধ্যম, তারহীন মাধ্যম, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তির উদাহরণ : ব্লু-টুথ, ওয়াইফাই ও ওয়াই ম্যাক্স, সেলুলার বা মোবাইল ফোন প্রযুক্তি, বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোন, মোবাইল ইন্টারনেট।

ইউনিট ৪ : নেটওয়ার্কিং

কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ধারণা, নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ, নেটওয়ার্কিং ডিভাইস -মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার ও গেটওয়ে, ইন্টারনেট, নেটওয়ার্ক টপোলজি, ক্লাউড কম্পিউটিং।

ইউনিট ৫ : সংখ্যা পদ্ধতি

সংখ্যা আবিস্কারের ইতিহাস, সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ, সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর, দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তর, দশমিক থেকে অক্ট্যালে রূপান্তর, দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর, বাইনারি থেকে দশমিকে রূপান্তর, অক্ট্যাল থেকে দশমিকে রূপান্তর, হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিকে রূপান্তর, বাইনারি থেকে অক্ট্যালে রূপান্তর এবং অক্ট্যাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর, বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেলে এবং হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর, অক্ট্যাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর এবং হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্ট্যালে রূপান্তর, বাইনারি যোগ ও বিয়োগ, চিহ্নযুক্ত সংখ্যা, কোড ও কোডের ধারণা ।

ইউনিট ৬ : বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস

বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও বুলিয়ান উপপাদ্য, সত্যক সারণি ও ডি-মরগ্যান এর উপপাদ্য, লজিক ফাংশন সরলীকরণ, লজিক গেইট ও মৌলিক গেইট, সার্বজনীন গেইট, বিশেষ গেইট, এডার, এনকোডার ও ডিকোডার, ফ্লিপ ফ্লপ, রেজিস্টার, কাউন্টার ।

ইউনিট ৭ : ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML

ওয়েব ডিজাইন এর ধারণা, ওয়েবসাইট এর কাঠামো, HTML এর মৌলিক বিষয়সমূহ, HTML ট্যাগ ও সিনট্যাক্স পরিচিতি, HTML নকশা ও কাঠামো লেআউট, HTML টেক্সট ফরমেটিং, HTML ডকুমেনেট টেবিল যোগ করা, HTML ডকুমেন্টে ফর্ম যোগ করা, HTML ইমেজ, লিঙ্ক যোগ করা, ওয়েব সাইট পাবলিশিং, ব্যবহারিক (Practical) ।

ইউনিট ৮ : প্রোগ্রামিং এর ভাষা

প্রোগ্রাম এর ধারণা ও প্রোগ্রামের ভাষা, বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামের ভাষা, উচ্চস্তরের ভাষা, অনুবাদক প্রোগ্রাম, প্রোগ্রামের সংগঠন ও প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ, অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট, বিভিন্ন ফ্লোচার্ট তৈরির নিয়ম ও উদাহরণ, প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল।

ইউনিট ৯ : সি প্রোগ্রামিং

সি প্রোগ্রামিং এর ধারণা, সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ও হেডার ফাইল, সি ভাষার প্রোগ্রামিং এর গঠন, সি ভাষার নমুনা প্রোগ্রাম ও প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ, প্রোগ্রাম কম্পাইলিং ও প্রোগ্রাম নির্বাহ করা, ডাটা টাইপ, ভ্যারিয়েবল বা চলক এবং এর টাইপ অপারেন্ড, অপারেটর ও এক্সপ্রেশন এবং ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট, কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট, Switch স্টেটমেন্ট, Loop স্টেটমেন্ট, Break স্টেটমেন্ট ও continue স্টেটমেন্ট, Array (অ্যারে), function (ফাংশন), ব্যবহারিক (Practical) ।

ইউনিট ১০ : ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

ডাটাবেজের ধারণা, ডাটাবেজের ব্যবহার ও ডাটাবেজের বিভিন্ন উপাদান, এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল, এনটিটি, এনটিটি সেট, ভ্যালু, এট্রিবিউট ও বিভিন্ন ধরনের কী, ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ডাটাবেজ তৈরি, ডাটা টাইপ, কোয়েরি ও কোয়েরি ল্যাংগুয়েজ, ডাটাবেজ সর্টিং ও ডাটাবেজ ইনডেক্সিং, ডাটাবেজ রিলেশন, রিপোর্ট তৈরি ও ব্যবহার, কর্পোরেট ডাটাবেজ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজ, ডাটা সিকিউরিটি ও ডাটা এনক্রিপশন, ব্যবহারিক (Practical)।

মান বণ্টন

পূর্ণমান : ১০০

তত্ত্বীয় অংশ : ৭৫

প্রশ্নের ধরণ	প্রশ্নের সংখ্যা	উত্তর দিতে হবে	প্রতি প্রশ্নে নম্বর	মোট নম্বর
সৃজনশীল	৬টি	৪টি	১০	১০×৪= ৪০
বহুনির্বাচনি	৩৫টি		১	১×৩৫= ৩৫

তত্ত্বীয় মোট নম্বর = ৭৫ নম্বর

ব্যবহারিক অংশ : ২৫

একটি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার	০৫ নম্বর
ফলাফল উপস্থাপন	১২ নম্বর
[প্রক্রিয়া অনুসরণ : ০৪ নম্বর; ব্যাখ্যা : ০৪ নম্বর; ফলাফল : ০৪ নম্বর]	
মৌখিক অভীক্ষা	০৫ নম্বর
নোটবুক	০৩ নম্বর

মোট = ২৫ নম্বর

কার্যক্রমটি দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করতে হবে।

সর্বমোট (৭৫+২৫) = ১০০ নম্বর

বিস্তারিত সূচিপত্র

ইউনিট- ১ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঃ প্রাথমিক ধারণা ----------১-১১
পাঠ - ১.১ : তথ্য, উপাত্ত এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ---------- ২
পাঠ - ১.২ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ ---------- ৫
পাঠ - ১.৩ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ও অবদান ---------- ৭
পাঠ - ১.৪ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপাদান ---------- ৯

ইউনিট-২ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত----------১২-৩৩
পাঠ - ২.১ : বিশ্বগ্রামের ধারণা----------১৩
পাঠ - ২.২ : বিশ্বগ্রামের ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানসমূহ ----------১৫
পাঠ - ২.৩ : টেলিকন্‌ফারেন্সিং এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ----------১৯
পাঠ - ২.৪ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা ----------২১
পাঠ - ২.৫ : সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব----------২৫
পাঠ - ২.৬ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন----------২৭
পাঠ - ২.৭ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা ----------২৯

ইউনিট-৩ : কমিউনিকেশন সিস্টেম----------৩৪-৬৩
পাঠ - ৩.১ : কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা ও বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম----------৩৫
পাঠ - ৩.২ : ডাটা কমিউনিকেশনের ধারণা, ডাটা কমিউনিকেশন এর উপাদান ও ব্যান্ডউইডথ ----------৩৭
পাঠ - ৩.৩ : ডাটা ট্রান্সমিশনের মেথড এবং মোড----------৩৯
পাঠ - ৩.৪ : ডাটা কমিউনিকেশন এর মাধ্যম এবং প্রকারভেদ ----------৪২
পাঠ - ৩.৫ : তার মাধ্যম----------৪৪
পাঠ - ৩.৬ : তারহীন মাধ্যম ----------৪৭
পাঠ - ৩.৭ : ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম----------৫০
পাঠ - ৩.৮ : ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তির উদাহরণ : ব্লু-টুথ, ওয়াইফাই ও ওয়াই ম্যাক্স ----------৫২
পাঠ - ৩.৯ : সেলুলার বা মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ----------৫৪
পাঠ - ৩.১০ : বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোন----------৫৬
পাঠ - ৩.১১ : মোবাইল ইন্টারনেট ----------৫৯

ইউনিট-৪ : নেটওয়ার্কিং----------৬৪-৮১
পাঠ - ৪.১ : কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ধারণা ----------৬৫
পাঠ - ৪.২ : নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ ----------৬৭
পাঠ - ৪.৩ : নেটওয়াকিং ডিভাইস -মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার ও গেটওয়ে----------৭০
পাঠ - ৪.৪ : ইন্টারনেট----------৭২
পাঠ - ৪.৫ : নেটওয়ার্ক টপোলজি----------৭৪
পাঠ - ৪.৬ : ক্লাউড কম্পিউটিং ----------৭৭

ইউনিট-৫ : সংখ্যা পদ্ধতি ---------- ৮২-১১৭
পাঠ - ৫.১ : সংখ্যা আবিস্কারের ইতিহাস, সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ ---------- ৮৩

পাঠ - ৫.২ : সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর ----------৮৬
পাঠ - ৫.৩ : দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তর ---------- ৮৮
পাঠ - ৫.৪ : দশমিক থেকে অক্টালে রূপান্তর----------৯০
পাঠ - ৫.৫ : দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর----------৯৩
পাঠ - ৫.৬ : বাইনারি থেকে দশমিকে রূপান্তর----------৯৬
পাঠ - ৫.৭ : অক্টাল থেকে দশমিকে রূপান্তর----------৯৮
পাঠ - ৫.৮ : হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিকে রূপান্তর---------- ১০০
পাঠ - ৫.৯ : বাইনারি থেকে অক্টালে এবং অক্টাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর---------- ১০২
পাঠ - ৫.১০ : বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেলে এবং হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর---------- ১০৫
পাঠ - ৫.১১ : অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে এবং হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টালে রূপান্তর ---------- ১০৭
পাঠ - ৫.১২ : বাইনারি যোগ ও বিয়োগ---------- ১০৯
পাঠ - ৫.১৩ : চিহ্নযুক্ত সংখ্যা ----------১১১
পাঠ - ৫.১৪ : কোড ও কোডের ধারণা ---------- ১১৩

ইউনিট-৬ : বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস---------- ১১৮-১৪৯
পাঠ - ৬.১ : বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও বুলিয়ান উপপাদ্য ---------- ১১৯
পাঠ - ৬.২ : সত্যক সারণি ও ডি-মরগ্যান এর উপপাদ্য ---------- ১২২
পাঠ - ৬.৩ : লজিক ফাংশন সরলীকরণ ---------- ১২৫
পাঠ - ৬.৪ : লজিক গেইট ও মৌলিক গেইট ---------- ১২৭
পাঠ - ৬.৫ : সার্বজনীন গেইট ---------- ১২৯
পাঠ - ৬.৬ : বিশেষ গেইট ---------- ১৩২
পাঠ - ৬.৭ : এডার ---------- ১৩৪
পাঠ - ৬.৮ : এনকোডার ও ডিকোডার---------- ১৩৭
পাঠ - ৬.৯ : ফ্লিপ ফ্লপ---------- ১৩৯
পাঠ - ৬.১০ :রেজিস্টার ---------- ১৪২
পাঠ - ৬.১১ : কাউন্টার---------- ১৪৫

ইউনিট-৭ : ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML---------- ১৫০-১৮৪
পাঠ - ৭.১ : ওয়েব ডিজাইন এর ধারণা---------- ১৫১
পাঠ - ৭.২ : ওয়েব সাইট এর কাঠামো ---------- ১৫৪
পাঠ - ৭.৩ : HTML এর মৌলিক বিষয়সমূহ ---------- ১৫৭
পাঠ - ৭.৪ : HTML ট্যাগ ও সিনট্যাক্স পরিচিতি ---------- ১৬০
পাঠ - ৭.৫ : HTML নকশা ও কাঠামো লেআউট ---------- ১৬২
পাঠ - ৭.৬ : HTML টেক্সট ফরমেটিং---------- ১৬৫
পাঠ - ৭.৭ : HTML ডকুমেন্টে টেবিল যোগ করা ---------- ১৬৮
পাঠ - ৭.৮ : HTML ডকুমেন্টে ফর্ম যোগ করা---------- ১৭১
পাঠ - ৭.৯ : HTML ইমেজ ও লিঙ্ক যোগ করা---------- ১৭৬
পাঠ - ৭.১০ : ওয়েব সাইট পাবলিশিং---------- ১৭৮
পাঠ - ৭.১১ : ব্যবহারিক (Practical) ---------- ১৮০

ইউনিট-৮ : প্রোগ্রামিং এর ভাষা ---------- ১৮৫-২১০
পাঠ - ৮.১ : প্রোগ্রাম এর ধারণা ও প্রোগ্রামের ভাষা ---------- ১৮৬
পাঠ - ৮.২ : বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামের ভাষা---------- ১৮৮
পাঠ - ৮.৩ : উচ্চ স্তরের ভাষা ---------- ১৯১
পাঠ - ৮.৪ : অনুবাদক প্রোগ্রাম---------- ১৯৪
পাঠ - ৮.৫ : প্রোগ্রামের সংগঠন ও প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ ---------- ১৯৭
পাঠ - ৮.৬ : অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট ---------- ২০০
পাঠ - ৮.৭ : বিভিন্ন ফ্লোচার্ট তৈরির নিয়ম ও উদাহরণ ---------- ২০২
পাঠ - ৮.৮ : প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল---------- ২০৫

ইউনিট-৯ : সি প্রোগ্রামিং ---------- ২১১-২৫৬
পাঠ - ৯.১ : সি প্রোগ্রামিং এর ধারণা ---------- ২১২
পাঠ - ৯.২ : সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ও হেডার ফাইল---------- ২১৪
পাঠ - ৯.৩ : সি ভাষার প্রোগ্রামিং এর গঠন---------- ২১৬
পাঠ - ৯.৪ : সি ভাষার নমুনা প্রোগ্রাম ও প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ---------- ২১৮
পাঠ - ৯.৫ : প্রোগ্রাম কম্পাইলিং ও প্রোগ্রাম নির্বাহ করা---------- ২২২
পাঠ - ৯.৬ : ডাটা টাইপ---------- ২২৫
পাঠ - ৯.৭ : ভ্যারিয়েবল বা চলক এবং এর টাইপ ---------- ২২৭
পাঠ - ৯.৮ : অপারেন্ড, অপারেটর ও এক্সপ্রেশন এবং ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট ---------- ২২৯
পাঠ - ৯.৯ : কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট---------- ২৩৫
পাঠ - ৯.১০ : Switch স্টেটমেন্ট---------- ২৩৯
পাঠ - ৯.১১ : Loop স্টেটমেন্ট---------- ২৪১
পাঠ - ৯.১২ : Break স্টেটমেন্ট ও continue স্টেটমেন্ট ---------- ২৪৪
পাঠ - ৯.১৩ : Array (অ্যারে) ---------- ২৪৬
পাঠ - ৯.১৪ : function (ফাংশন)---------- ২৪৮
পাঠ - ৯.১৫ : ব্যবহারিক (Practical) ---------- ২৫১

ইউনিট-১০ : ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ----------২৫৭-২৮৭
পাঠ - ১০.১ : ডাটাবেজের ধারণা, ডাটাবেজের ব্যবহার ও ডাটাবেজের বিভিন্ন উপাদান ---------- ২৫৮
পাঠ - ১০.২ : এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল, এনটিটি, এনটিটি সেট, ভ্যালু, এট্রিবিউট ও বিভিন্ন ধরনের কী--------- ২৬১
পাঠ - ১০.৩ : ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম---------- ২৬৫
পাঠ - ১০.৪ : ডাটাবেজ তৈরি, ডাটা টাইপ ও কোয়েরি ---------- ২৬৭
পাঠ - ১০.৫ : ডাটাবেজ সর্টিং ও ডাটাবেজ ইনডেক্সিং ---------- ২৭২
পাঠ - ১০.৬ : ডাটাবেজ রিলেশন, রিপোর্ট তৈরি ও ব্যবহার---------- ২৭৫
পাঠ - ১০.৭ : কর্পোরেট ডাটাবেজ ---------- ২৭৯
পাঠ - ১০.৮ : ডাটা সিকিউরিটি ও ডাটা এনক্রিপশন ---------- ২৮১
পাঠ - ১০.৯ : ব্যবহারিক (Practical) ---------- ২৮৩

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঃ প্রাথমিক ধারণা

ইউনিট ১

ভূমিকা

বর্তমান যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কাজ করছে। যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তির সাথে তা একীভূত হওয়ার ফলে এর প্রতি মানুষের নির্ভরতা বেড়েছে অনেকগুণ। পৃথিবীর উপরিভাগ কিংবা অভ্যন্তর, গভীর সমুদ্র থেকে দূর মহাকাশ সর্বত্রই আজ প্রযুক্তির ব্যবহার। ব্যক্তিগত কাজ থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, যোগাযোগ সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। এদেশেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই ইউনিটে তথ্য ও উপাত্ত, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ও অবদান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১.১ : তথ্য, উপাত্ত এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

পাঠ - ১.২ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

পাঠ - ১.৩: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ও অবদান

পাঠ - ১.৪ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপাদান

পাঠ-১.১ তথ্য, উপাত্ত এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তথ্য ও উপাত্ত কি তা বলতে পারবেন।
- তথ্য ও উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	তথ্য, উপাত্ত, তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রযুক্তি।

১.১.১ তথ্য ও উপাত্তের ধারণা

উপাত্ত

ডাটা বা উপাত্তকে আমরা কাচাঁমালের সাথে তুলনা করতে পারি। কাচাঁমালকে যেমন ব্যবহার উপযোগী করতে হলে প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন তেমনি উপাত্তকেও অর্থবহ করতে হলে প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত কাচাঁমাল সমূহকে ডাটা বা উপাত্ত বলে। উপাত্ত শব্দ, সংখ্যা, ছবি, প্রতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ উপাত্তের জন্ম দেয়। কোন ঘটনায় বহু উপাত্ত জড়িত থাকে। যেমন আমরা যখন কোন সুপার শপ থেকে পণ্য ক্রয় করি তাহলে রিসিট দেয়া হয়। একটু লক্ষ্য করলেই এতে কিছু উপাত্ত দেখতে পাবো যেমন: পণ্য ক্রয়ের তারিখ এবং সময়, পণ্যের বিবরণ, দাম ইত্যাদি। এসব উপাত্তকে প্রক্রিয়াকরণ করেই একটি সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটি বৈধ রিসিট পাওয়া যায়।

তথ্য

কোন বিশেষ প্রেক্ষিতে ডাটাকে অর্থবহ করাই হল তথ্য বা ইনফরমেশন। ডাটা হল কিছু বিশৃঙ্খল ফ্যাক্ট যা অর্থবহ বা কার্যকর নয়। আর তথ্য হল কোন প্রেক্ষিতে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো উপাত্ত যা সহজবোধ্য, অর্থবহ, কার্যকর এবং ব্যবহার উপযোগী।

উপাত্ত + প্রেক্ষিত + অর্থ = তথ্য

ধরা যাক ০৬১২১৪ একটি উপাত্ত; এটি তথ্য হবে যখন কোন বিশেষ প্রেক্ষিতে এটিকে অর্থবহ করা হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে এর অর্থ ভিন্ন হবে। যেমন-

(ক) যদি এই উপাত্তটি দিয়ে dd.mm.yy ফরমেটে ইংরেজী তারিখ প্রকাশের প্রেক্ষিতে চিন্তা করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে ২০১২ সালের এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ।

(খ) আবার যদি এটি দিয়ে hour:min:sec এই ফরমেটে সময় প্রকাশ করা হয় তবে এর অর্থ হবে ৬ টা ১২ মিনিট ১৪ সেকেন্ড।

কম্পিউটার বিজ্ঞান অনুসারে বলা যায় যে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কম্পিউটারে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের ফলাফলই হল তথ্য।

১.১.২ উপাত্ত ও তথ্যের মধ্যে পার্থক্য

উপাত্ত	তথ্য
সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত কাচাঁমাল সমূহকে ডাটা বা উপাত্ত বলে।	তথ্য হল কোন প্রেক্ষিতে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো উপাত্ত যা সহজবোধ্য, অর্থবহ, কার্যতর এবং ব্যবহার উপযোগী।
তথ্যের ক্ষুদ্রতম এককই উপাত্ত যা বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়।	উপাত্তকে প্রসেস করে তথ্যে রূপান্তর করা হয়।
উপাত্ত পুরোপুরি কোন অর্থ বা ভাবার্থ প্রকাশ করে না।	তথ্য কোন বিষয়ের অর্থ বা ভাবার্থ প্রকাশ করে যা ব্যবহারকারী বুঝতে পারে।
উপাত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে না।	তথ্য উপাত্তের উপর নির্ভর করে।
উপাত্ত তথ্য তৈরি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।	তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

১.১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তি

আধুনিক যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। সাধারণভাবে তথ্য প্রযুক্তি বলতে তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রয়োগ করার প্রযুক্তিকে বুঝায়। একে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা আইটি বলা হয়ে থাকে। টেলিযোগাযোগ, স্যাটেলাইট যোগাযোগ, অডিও ভিডিও সম্প্রচার, ডাটাবেস ব্যবস্থাপনা, সফ্টওয়্যার উন্নয়ন, নেটওয়ার্ক, মুদ্রণ প্রযুক্তি, বিনোদন প্রযুক্তি, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, তথ্য ভান্ডার সবগুলোকে তথ্য প্রযুক্তি বলা যেতে পারে। এক কথায় কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, একত্রিকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রয়োগ ব্যবস্থাকে তথ্য প্রযুক্তি বলা হয়।

যোগাযোগ প্রযুক্তি

কম্পিউটার কিংবা অন্য কোন যন্ত্রের মাধ্যমে ডাটাকে একস্থান হতে অন্য স্থানে কিংবা এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া হচ্ছে ডাটা কমিউনিকেশন। কাজেই কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একস্থান (উৎস) হতে অন্যস্থানে (গন্তব্য) নির্ভরযোগ্যভাবে ডাটা বা উপাত্ত আদান-প্রদান সম্ভব। ডাটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন টেকনোলজি (Communication Techology) বলে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ মাধ্যমের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে একত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information and Communication Technology-ICT) বলা হয়। কম্পিউটার বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে তথ্যকে এক স্থান থেকে অন্যত্র নির্ভরযোগ্য ভাবে আদান-প্রদান করাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার মানুষ ও তাদের কার্যক্রমকে বহুগুণে গতিশীল ও কার্যকর করে তুলেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	"তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একে অপরের পরিপূরক"- এ সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত মতামত দিন।

সারসংক্ষেপ

সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত কাচাঁমালসমূহকে ডাটা বা উপাত্ত বলে। আর কোন বিশেষ প্রেক্ষিতে ডাটাকে অর্থবহ করাই হল তথ্য বা ইনফরমেশন। আবার তথ্য সংগ্রহ, এর সত্যতা ও বৈধতা যাচাই, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, আধুনিকীকরণ, পরিবহন, বিতরণ ও ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিকে বলা হয় তথ্য প্রযুক্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। উপাত্ত কি ধরনের হতে পারে?

ক. ছবি
খ. সংখ্যা
গ. শব্দ
ঘ. উপরের সবগুলো

২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-

ক. অপচয় কমায়
খ. শারীরিক শ্রম বাড়ায়
গ. ব্যয় বৃদ্ধি করে
ঘ. মানুষের মেধা ব্যবহার কমায়

পাঠ-১.২ তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রযুক্তি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ।

তথ্য প্রযুক্তি বলতে সাধারণত তথ্য রাখা এবং একে ব্যবহার করার প্রযুক্তিকেই বোঝানো হয়। তবে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি আর এ ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নতুন নতুন সব প্রযুক্তির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে তথ্য প্রযুক্তি এক অভিনব রূপ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকাই প্রধান। যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, অডিও ভিডিও কম্পিউটিং, সম্প্রচারসহ আরো বহুবিধ প্রযুক্তি এর সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে তথ্য প্রযুক্তি বা আইটি এখন আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

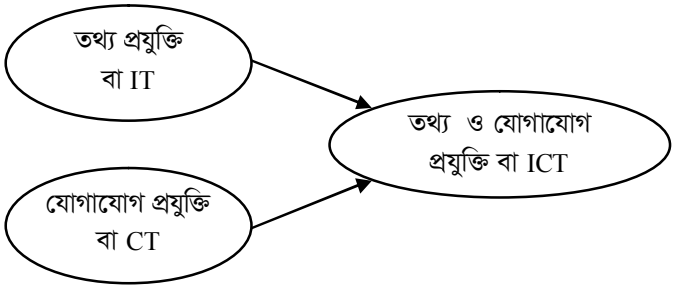

চিত্র ১.২.১ : তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূতকরণ

ইন্টারনেট আবিষ্কার নিঃসন্দহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি মাইলপলক। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন ঘরে বসেই বিশ্বকে পাওয়া যাচ্ছে হাতের মুঠোয়। প্রচলিত চিঠির বদলে এসেছে ই-মেইল এর ব্যবস্থা যার সাথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো সংযুক্ত করে পাঠিয়ে দেয়া যাচ্ছে বিশ্বের যে কোনো স্থানে। ইন্টারনেটের কল্যাণে এখন টেক্সট, ভয়েস ও ভিডিও চ্যাটিং, ব্রডকাস্টিং, ভিওআইপি, অনলাইন অডিও-ভিডিও স্ট্রিমিং প্রভৃতি কাজগুলো করা সম্ভব হচ্ছে। অনলাইন রেডিও, অনলাইন টিভির মতো সেবাগুলোও প্রসার লাভ করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি ওয়েবসাইট তথ্যের প্রাপ্যতাকে আরও সহজ করেছে।

টেলিফোনের মাধ্যমে শব্দকে ইলেক্ট্রনিক ডাটায় রূপান্তরিত করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা যায়। বর্তমানের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু শব্দ নয় লেখা, গ্রাফিক্স, স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্র সবকিছুকেই ডিজিটাল ফরমেটে নিয়ে ইলেক্ট্রনিক ডাটায় রূপান্তর করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করা যায়। মডেমের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে টেলিফোন লাইনের সংযোগ দিয়ে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আরেক শক্তিশালী উদ্ভাবন হলো মোবাইল টেলিফোন। মুঠোয় ধরে রাখা এ ফোনের মাধ্যমে আজ বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে কথা বলা যাচ্ছে। যে কোনো স্থানে এ ফোন বয়েও বেড়ানো যাচ্ছে। আধুনিক স্মার্টফোনগুলো আরও বেশি সুবিধা দিচ্ছে। হ্যান্ডসেটেই ইন্টারনেট ব্রাউজিং, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সেবা গ্রহণ, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছবি ও ভিডিও ধারণ করে তা ইন্টারনেটে প্রকাশ করা যাচ্ছে। এসএমএস বা ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের যেকোনো স্থানেই পাঠিয়ে দেয়া যাচ্ছে তথ্য। আর এমএমএস এর মাধ্যমে প্রেরণ করা যাচ্ছে মাল্টিমিডিয়া সম্বলিত তথ্য। শুধু তাই নয় জিপিএস বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এর সেবাও নেয়া যাচ্ছে মোবাইল ফোনে। স্মার্টফোনগুলো আজ চলছে অপারেটিং সিস্টেমে। হ্যান্ডসেটগুলোতে আরও বেশি ইন্টারনেটনির্ভর সুবিধা নিয়ে এসেছে চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি যার সফল বাস্তবায়ন হলো WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) এবং 3GPP LTE (Long Term Evolution) স্ট্যান্ডার্ড।

এতসব প্রযুক্তির সম্মিলনে তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি এসেছে সমকেন্দ্রিকতায়। এদের আর এখন আলাদা করে ভাববার কোনো অবকাশ নেই। তাই এখন এই দুই প্রযুক্তি মিলেমিশে একক একটি প্রযুক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে যাকে বলা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

শিক্ষার্থীর কাজ	"তথ্য প্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত"- এ সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

তথ্য প্রযুক্তি বলতে সাধারণত তথ্য রাখা এবং একে ব্যবহার করার প্রযুক্তিকেই বোঝানো হয়। তবে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি আর এ ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নতুন নতুন সব প্রযুক্তির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে তথ্য প্রযুক্তি এক অভিনব রূপ লাভ করেছে। যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, অডিও ভিডিও কম্পিউটিং, সম্প্রচারসহ আরো বহুবিধ প্রযুক্তি এর সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে তথ্য প্রযুক্তি বা আইটি এখন আইসিটি বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক কোনটি ?

ক) মাল্টিমিডিয়া খ) ইন্টারনেট

গ) মোবাইল ঘ) ফ্যাক্স

পাঠ-১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ এবং অবদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান।

১.৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ

আধুনিক যুগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ মানুষের দীর্ঘ দিনের চেষ্টার ফসল। অনসন্ধানে দেখা যায় মানুষ সূচনা লগ্নে আকার-ইঙ্গিতে তথ্যের আদান-প্রদান করত। পরবর্তীতে দেয়ালে আঁচড় কেটে, পাথর খোদাই করে ইত্যাদি পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ করা হত। অবশেষে কাগজ-কলমের আবির্ভাব ঘটে। আধুনিক সভ্যতার উন্নয়ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নয়নের হার অত্যন্ত উচ্চ। ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটিং, কনজিউমার ইলেক্ট্রনিক্সসহ প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখাকে পৃথকভাবে কল্পনা করা যায় না। এসব প্রযুক্তি মিলে সৃষ্টি হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

ষাটের দশকে উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রে নতুন অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে প্রতিটি ইন্টেলস্যাট উপগ্রহে ২৪০টি টেলিফোন সার্কিট অথবা একটি টেলিভিশন চ্যানেল পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল। তথ্য যুগের সূচনা হলো কম্পিউটারের প্রাথমিক যুগের বিবর্তনসমূহ। মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে যন্ত্রের সাহায্যে গণনা কাজের সহায়তা পেতে শরু করে ছিল। তথ্য প্রযুক্তির সত্যিকার বিকাশ ঘটে মূলত ১৯৭০-৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসরের আবিষ্কার ও সফলভাবে কম্পিউটারের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তাই তথ্য প্রযুক্তির যুগকে মাইক্রোপ্রসেসরের যুগ বললেও খুব বেশি বলা হবে না। মাইক্রোপ্রসরের কল্যাণে ১৯৭৬ সালে মাইক্রোকম্পিউটার, ১৯৮১ সালে পার্সোনাল কম্পিউটার, ১৯৮৪ সালে মেকিনটোশ এবং সেই থেকে ১৯৯৬ সালে ভার্চুয়্যাল রিয়েলিটি, ইন্টারনেট ইত্যাদি প্রতিটি মুহূর্তই তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ প্রযুক্তির মূলে রয়েছে আধুনিক টেলিযোগাযোগ, ডাটা নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা।

টেলিযোগাযোগ আধুনিক বিশ্বের একটি অপরিহার্য ব্যবস্থা। বাঁধা বা কোন প্রকার সেন্সরশীপ ছাঁড়াই পৃথিবীর এক স্থান হতে অন্য স্থানে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ সম্ভব। টেলিফোন কল ছাড়াও বিশাল পরিমাণ ডাটা এ নেটওয়ার্ক দিয়ে স্থানান্তর করা যায়। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স এবং সফ্টওয়্যার কৌশলের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে আধুনিক ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায়। কম্পিউটার দিয়ে ডাটা প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপক প্রসারের সাথে বিভিন্ন কম্পিউটারের মধ্যে সরাসরি ডাটা স্থানান্তরের গুরুত্ব ও প্রযোজনীয়তা বেড়ে চলেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এখন পর্যন্ত সর্বশেষ ধারাটি হলো ডিজিটাল প্রযুক্তি যার মূলে রয়েছে বাইনারি পদ্ধতি। তাই বর্তমান যুগকে ডিজিটাল যুগও বলা যায়। ফাইবার অপটিক ক্যাবল আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। চুলের মত সরু এ ক্যাবল দিয়ে বয়ে নেয়া যায় একসাথে অসংখ্য টেলিফোন কল, বিশাল পরিমাণ ডাটা এবং অনেক টেলিভিশন সংকেত। বিশ্বব্যাপি দ্রুত যোগাযোগের জন্য সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে স্থাপিত হয়েছে ফাইবার অপটিক ক্যাবল। ফাইবার অপটিক ক্যাবল দিয়ে প্রেরিত সংকেতের গুণ ও মান উপগ্রহ দিয়ে প্রেরিত সংকেতের তুলনায় অনেক উন্নত।

১.৩.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান

আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। এই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অবদান হলো –

১। অপচয় রোধ করে।
২। সময় সাশ্রয় হয়।
৩। তথ্যের প্রাপ্যতা সহজ হয়।
৪। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব হয়। ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল, এসএমএস, এমএমএস প্রভৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
৫। প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের গতিকে ত্বরান্বিত করে।
৬। সর্বক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
৭। ব্যবসায়-বাণিজ্যে লাভজনক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।
৮। ই-কমার্সের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা যায়।
৯। ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে পছন্দের এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের অর্ডার দেয়া যায়।
১০। শিল্প প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার মনুষ্যশক্তির অপচয় কমায়।
১১। মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটায়।
১২। শিক্ষার্থীরা এখন ঘরে বসেই অনলাইনে বিশ্বের বিভিন্ন নামী-দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে।
১৩। ই-গভর্নেন্স চালুর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে কাজের সমন্বয় ঘটানো যায়।
১৪। সিটিজেন চার্টারের মতো নাগরিক সুবিধাগুলো ঘরে বসেই পাওয়া যায়।
১৫। ঘরে বসেই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফোন বিলের মতো বিভিন্ন ইউটিলিটি বিলগুলো এখন মোবাইল ফোনেই দেয়া যায়।

সারসংক্ষেপ

তথ্য প্রযুক্তির সত্যিকার বিকাশ ঘটে মূলত ১৯৭০-৭১ সালে মাইক্রোপ্রসেসরের আবিষ্কার ও সফলভাবে কম্পিউটারের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। তাই তথ্য প্রযুক্তির যুগকে মাইক্রোপ্রসেসরের যুগ বললেও খুব বেশি বলা হবে না। মাইক্রোপ্রসরের কল্যাণে ১৯৭৬ সালে মাইক্রোকম্পিউটার, ১৯৮১ সালে পার্সোনাল কম্পিউটার, ১৯৮৪ সালে মেকিনটোশ এবং সেই থেকে ১৯৯৬ সালে ভার্চুয়্যাল রিয়েলিটি, ইন্টারনেট ইত্যাদি প্রতিটি মুহূর্তই তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

২। কত সালে মাইক্রোপ্রসেসরের আবিষ্কার হয়?

ক. ১৯৭০-৭১ সালে খ. ১৯৭৫-৭৬ সালে
গ. ১৯৮০-৮১ সালে ঘ. ১৯৮৫-৮৬ সালে

৩। মাইক্রোকম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়–

ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৬ সালে
গ. ১৯৭৮ সালে ঘ. ১৯৮২ সালে

পাঠ-১.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপাদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল।

তথ্য প্রযুক্তিতে বর্তমানে যে সব মৌলিক উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হলো– কম্পিউটার, নেটওর্য়াক ব্যবস্থা, আধুনিক টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট, ই-মেইল, অডিও ভিডিও, মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইট, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স ইত্যাদি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে আলোচনা করা হলো-

১.৪.১ কম্পিউটার

ল্যাটিন শব্দ Computare থেকে ইংরেজি Computer শব্দটির উৎপত্তি। Computer শব্দটির আভিধানিক অর্থ গণনাযন্ত্র বা হিসাবকারী যন্ত্র। পূর্বে কম্পিউটার দিয়ে শুধুমাত্র হিসাব-নিকাশের কাজই করা হতো। কিন্তু বর্তমান অত্যাধুনিক কম্পিউটার দিয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে জটিল হিসাব-নিকাশের কাজ নির্ভুলভাবে করা ছাড়াও বহু রকমের কাজ করা যায়। কম্পিউটার সেকেন্ডের মধ্যে কোটি কোটি হিসাব-নিকাশ করতে পারে। কম্পিউটারে কাজ করার গতি হিসাব করা হয় সাধারণত ন্যানোসেকেন্ড এ। ন্যানোসেকেন্ড হচ্ছে এক সেকেন্ডের একশত কোটি ভাগের একভাগ সময় মাত্র। ইলেকট্রন প্রবাহের মাধ্যমে কম্পিউটারের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

মূলত কম্পিউটার একটি অত্যাধুনিক ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র, যা নিজস্ব স্মৃতিভাণ্ডারে সুনির্দিষ্ট এক বা একাধিক কাজের নির্দেশাবলি সংরক্ষণ করে রাখে। ব্যবহারকারী ডাটা বা উপাত্ত সরবরাহ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটার প্রক্রিয়াকরণ (প্রসেসিং) করে কাজের ফলাফল প্রদান করে।

১.৪.২ ইন্টারনেট

ইন্টারনেট শব্দটির পূর্ণরূপ হলো ইন্টারকানেকটেড নেটওয়ার্ক (Inter Conntected Networks) । অন্য কথায় নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্কই হলো ইন্টারনেট। বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়া একমাত্র আধিপত্য বিস্তারকারী মাধ্যমটির নাম ইন্টারনেট (Inernet)।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা

ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় হলো–

১. ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে কাঙ্ক্ষিত তথ্যের নাম লিখে সার্চ করলেই তথ্যগুলো প্রদর্শিত হয়।

২. ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তেই বিশ্বর যে কোন প্রান্তে ই-মেইল করে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

৩. ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফ্যাক্স সুবিধা পাওয়া যায়।

৪. VOIP এর মাধ্যমে প্রচলিত ফোনের চাইতে খুব কম খরচে বিশ্বর যে কোন প্রান্তে কথা বলা যায়।

৫. ইন্টারনেট টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও চালুর ফলে ঘরে বসেই কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায়।

৬. বিভিন্ন ধরনের সফ্টওয়্যার, ফ্রিওয়্যার, বিনোদন উপকরণ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যায়।

৭. ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা পড়া যায়।

৮. ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-কমার্সের সাহায্যে ঘরে বসেই পণ্য কেনা যায়।

৯. ঘরে বসেই বিশ্বের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

১০. ইয়াহু মেসেঞ্জার, গুগল টক, স্কাইপি ইত্যাদি ইন্সট্যান্ট মেসেঞ্জারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে থাকা যে কোন ব্যক্তির সাথে টেক্সট ও ভিডিও শেয়ার করা যায়।

১১. অনলাইনে চিকিৎসা সেবা নেয়া যায়; ইত্যাদি।

১.৪.৩ ই-মেইল

ই-মেইল হলো কম্পিউটর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সীমিত স্থানের মধ্যে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের যে কোন স্থানে ই-মেইল পাঠানো যায়।

বিভিন্ন ই-মেইল প্রোগ্রাম ব্যবহার করে মেইল পাঠানো যায়। ই-মেইল প্রোগ্রামে ঢুকে বার্তা টাইপ করে প্রাপকের ঠিকানা নির্দিষ্ট করে পাঠানো (Send) নির্দেশ দিলে ই-মেইল তথ্য সরাসরি প্রাপকের কম্পিউটারে না গিয়ে তার টার্মিনাল বা ওয়ার্কস্টেশন বা সার্ভারে গিয়ে জমা হয়। প্রাপক তার নামে কোন মেইল এসেছে কিনা তা অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলে টার্মিনাল থেকে প্রাপকের কম্পিউটারে মেইলটি চলে আসে। একটি মেইল একই সঙ্গে অনেকের নিকট পাঠানো যায়। অন্য প্রোগ্রামে করা (যেমন, এমএস-ওয়ার্ড) ফাইলকে ই-মেইলের সাথে যুক্ত করে পাঠানো যায়। একে ফাইল এটাচমেন্ট (Attachment) বলা হয়। এটাচমেন্ট করে ভিডিও এবং অডিও ফাইলও পাঠানো যায়।

সারসংক্ষেপ

দিন দিন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং পরিধি বেড়েই চলেছে। বর্তমানে যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, অফিস, বাসস্থান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সংবাদ, বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ, সাংস্কতিক বিনিময়, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, রোবট্রিক্স, মহাকাশ অভিযান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। তথ্য প্রযুক্তিতে বর্তমানে যে সব মৌলিক উপাদান ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হলো- কম্পিউটার, নেটওর্য়াক ব্যবস্থা, আধুনিক টেলিযোগাযোগ,ইন্টারনেট, ই-মেইল, অডিও ভিডিও, মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইট, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। কোনটি কম্পিউটারের কার্যনীতির অংশ ?

ক) ইনপুট খ) প্রক্রিয়াকরণ

গ) আউটপুট ঘ) উপরের সবগুলো

২। এক ন্যানোমিটার সমান কত মিটার?

ক. $১০^{-৩}$ খ. $১০^{-৬}$

গ. $১০^{-৯}$ ঘ. $১০^{-১২}$



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

মইন সাহেব একটি সরকারি দপ্তরে চাকুরি করেন। তিনি সরকারি নির্দেশনা ও তথ্য আদানপ্রাদানের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করেন এবং কোন সভা বা সেমিনারে অফিসে কর্মরত সকলকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বার্তা প্রেরণ করে আমন্ত্রণ করেন।

ক. ই-মেইল কী? ১

খ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে কী বুঝায়। ২

গ. মইন সাহেবের বার্তা প্রেরণের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. মইন সাহেবের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার কোন ধরনের কর্মকান্ড? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠ - ১.১	১	ঘ	২	ক
পাঠ - ১.২	১	খ		
পাঠ - ১.৩	১	ক	২	খ
পাঠ - ১.৪	১	ঘ	২	গ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ইউনিট ২

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। সেই সাথে বিকাশ ঘটতে থাকে মানুষের জীবনযাত্রার কৌশল ও পদ্ধতির। নিত্য নতুন আবিষ্কার মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করছে। বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা Information & Communication Technology (ICT) এর যুগ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে গোটা পৃথিবী আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। আজ যারা এই প্রযুক্তিকে পূর্ণাঙ্গভাবে কাজে লাগাতে পারছে তারাই সাফল্য লাভ করছে।

এই ইউনিটে মূলত বিশ্বগ্রামের ধারণা, বিশ্বগ্রামের ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানসমূহ, টেলিকনফারেন্সিং এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা, সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রভাব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ২.১ : বিশ্বগ্রামের ধারণা

পাঠ - ২.২ : বিশ্বগ্রামের ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানসমূহ

পাঠ - ২.৩ : টেলিকন্‌ফারেন্সিং এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

পাঠ - ২.৪ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা

পাঠ - ২.৫ : সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব

পাঠ - ২.৬ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

পাঠ - ২.৭ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা

পাঠ-২.১ বিশ্বগ্রামের ধারণা

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিশ্বগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিশ্বগ্রামের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বিশ্বগ্রাম, হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার, কানেকটিভিটি।

২.১.১ বিশ্বগ্রাম

গ্রাম বা Village শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। বর্তমানে এর সাথে Global শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে Global Village নামক একটি নতুন ধরণা প্রচলিত হয়েছে যার অর্থ হলো বৈশ্বিক গ্রাম বা বিশ্বায়ন। বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর ব্যাপক ব্যবহার ও প্রভাবে আজ বিশ্বের যে কোন দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের সাথে খুব সহজেই যোগাযোগ করতে পারছে। গ্রামে যেমন আমরা সহজেই আশেপাশের মানুষের খবর জানতে পারি তেমনি বর্তমানে আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে এক দেশে বসে অন্য দেশে প্রতিবেশির মতো তথ্য বিনিময় করতে পারি। এটাই মূলত বিশ্বগ্রামের ধারণা।

কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিখ্যাত দার্শনিক মারশেল ম্যাকলুহান (Marshall McLuhan) সর্বপ্রথম গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রাম কথাটি ব্যবহার করেন। মারশেল ম্যাকলুহান ১৯১১ সালের ২১ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮০ সালের ৩১ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৬২ সালে তাঁর রচিত 'The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic' গ্রন্থে বিশ্বগ্রামের ধারণা দেন। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে 'Understanding Media' গ্রন্থে বিশ্বগ্রাম সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, " ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সারা বিশ্বকে একটি গ্রামে পরিণত করাই হল বিশ্বগ্রাম। যার মাধ্যমে খুব সহজেই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষের সাথে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করা সম্ভব।" এখানে ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি বলতে ইন্টারনেটকে বুঝানো হয়েছে।

সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জাতিগোষ্ঠীকে একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসা হলো গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম। বিষয়টিকে আর একটু পরিষ্কার করা যেতে পারে যেমন কোন একটি অঞ্চলের অথবা দেশের অধিবাসীরা যেমন নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে ঠিক তেমনি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনগোষ্ঠী ইন্টারনেট কিংবা স্যাটেলাইট টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে একটি একক সম্প্রদায় তথা যৌথ সমাজ হিসেবে আবদ্ধ হতে পারে। আর এটিই হলো গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রাম।

২.১.২ বিশ্বগ্রামের সুবিধা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষ গ্লোবাল ভিলেজে প্রবেশ করছে। এর ফলে দৈনন্দিন জীবনে অনেক সুবিধা ভোগ করছে। গ্লোবাল ভিলেজের গুরুত্বপূর্ণ কিছু সুবিধা নিম্নরূপ:

- তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ বর্তমানে সারা বিশ্বের সাথে সহজেই যোগাযোগ করতে পারছে।
- মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।
- মানুষের কাজের দক্ষতা ও গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- অনলাইনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ই–কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা–বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারছে।
- টেলিমেডিসিন সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই দক্ষ চিকিৎসকের সেবা নিতে পারছে।
- ই–লার্নিং এর মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশ্বের স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষসেবা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হচ্ছে; ইত্যাদি।

২.১.৩ বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার উপাদানসমূহ

বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ হলো–

- হার্ডওয়্যার (Hardware)
- সফটওয়্যার (Software)
- কানেকটিভিটি (Connectivity)
- উপাত্ত ও তথ্য (Data and Information)
- সক্ষমতা (Capacity)

হার্ডওয়্যার : বিশ্বগ্রামে যে কোন ধরনের তথ্য আদান–প্রদানের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত হার্ডওয়্যার সামগ্রীর। হার্ডওয়্যারের মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার এবং এর সাথে যুক্ত পেরিফেরাল যন্ত্রপাতি, মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট, অডিও–ভিডিও রেকর্ডার, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি।

সফ্টওয়্যার : বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি প্রয়োজন সফ্টওয়্যার। সফ্টওয়্যারের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সিস্টেম সফটওয়্যার, এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার, ব্রাউজিং সফটওয়্যার, কমিউনিকেটিং সফ্টওয়্যার, প্রোগ্রামিং ভাষা ইত্যাদি।

কানেকটিভিটি : বিশ্বগ্রামের প্রতিটি মানুষ যাতে নিরাপদে তথ্য ও উপাত্ত আদান–প্রদান করতে পারে এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজন নেটওয়্যার্ক বা কানেকটিভিটি। বিশ্বের তথ্য ভান্ডারের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে বা প্রয়োজনে যুক্ত থেকে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কানেকটিভিটি মূল ভূমিকা পালন করে।

উপাত্ত ও তথ্য : উপাত্তকে প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেই ব্যবহারযোগ্য তথ্যে পরিণত করা হয়। বিশ্বগ্রামে উপাত্ত ও তথ্যকে মানুষের প্রয়োজনে একে অপরের সাথে বিনামূল্যে বা অর্থের বিনিময়ে শেয়ার করতে হয়।

সক্ষমতা : বিশ্বগ্রামের উপাদানগুলোর মধ্যে মানুষের সক্ষমতা অন্যতম। যেহেতু বিশ্বগ্রাম মূলত তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর তাই এ বিষয়ে মানুষের সচেতনতা, স্বাক্ষরতা ও সক্ষমতা ইত্যাদির উপর এর প্রয়োগ অনেকাংশে নির্ভর করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ নিয়ে দল গঠনপূর্বক আলোচনা করুন এবং পোস্টারে উপস্থাপন করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বগ্রাম বা Global Village বলতে সমগ্র বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট যে জাল বিস্তার করেছে তাকে বুঝানো হয়। কানাডিয়ান লেখক হারবার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ শব্দটিকে সকলের সামনে তুলে ধরেন। বিশ্বগ্রামের মাধ্যমে খুব সহজেই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষের সাথে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ করা যায়। বিশ্বগ্রামে সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি সফ্টওয়্যার ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিশ্বগ্রাম বা গ্লোবাল ভিলেজ ধারণার উদ্ভাবক-

ক. বিল গেইটস খ. মার্শাল ম্যাকলুহান
গ. স্টিভ জবস ঘ. মার্ক জুকারবার্গ

২। বিশ্বগ্রাম কি?

ক. তথ্য ও প্রযুক্তি ভরা বিশ্ব খ. বিশ্বের গ্রামাঞ্চল
গ. একটি গ্রাম ঘ. প্রযুক্তিহীন বিশ্ব

পাঠ-২.২ বিশ্বগ্রামের ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিশ্বগ্রামের ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ইলেকট্রনিক যোগাযোগ, ই-লার্নিং, Distance Learning, টেলিমেডিসিন, ডিজিটাল হোম।

বিশ্বগ্রাম ধারণার সাথে অনেক উপাদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রধান প্রধান উপাদানগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো। বিশ্বগ্রামের ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- যোগাযোগ
- কর্মসংস্থান
- শিক্ষা
- চিকিৎসা
- গবেষণা
- অফিস–ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে
- ব্যবসা বাণিজ্য
- সামাজিক যোগাযোগ ইত্যাদি।

২.২.১ যোগাযোগ

বর্তমান যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দ্রুততম যোগাযোগ ব্যবস্থা হলো ইলেকট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যম। সারা বিশ্বে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মানুষ মূহুর্তের মধ্যেই টেলিফোন, মোবাইল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন জায়গায় যোগাযোগ করতে পারে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার যাতায়াত ব্যবস্থাকে দিন দিন সহজতর ও উন্নততর করেই চলছে। সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ইঞ্জিনের গতি নিয়ন্ত্রণ, জ্বালানির হিসাব, যান্ত্রিক ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ, টিকেট বুকিং, ট্রাফিক সিগনাল নিয়ন্ত্রণ, প্রতিকূল পরিবেশে পূর্বাভাস প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বাড়ছে।

২.২.২ কর্মসংস্থান

বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের বাজার উন্মুক্ত করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। কর্মসংস্থানের জন্য কম্পিউটার অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পণ্য ডিজাইন থেকে শুরু করে ঝুঁকিপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কল-কারখানায় দক্ষতা ও সফলতার সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। আজকের পৃথিবীতে শিল্পোৎপাদনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অনেক উৎপাদন প্রক্রিয়া আছে যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া চিন্তাই করা যায় না।

লাভজনক কারখানার পূর্বশর্ত উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়যোগ্যতা। বিক্রয়যোগ্যতার শর্ত ভাল ডিজাইন। বর্তমানকালে CAD (Computer Aided Design) ব্যবহার করে অল্প সময়ে পণ্যের চমৎকার সব ডিজাইন তৈরি করা যায়। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এবং বাজার ঠিক রাখা ও বাজার বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা উৎপাদন ক্ষেত্রে Total Quality Management (TQM) প্রয়োগ করছে। TQM প্রয়োগের বড় সহায়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। যন্ত্রপাতির সঠিক কার্যক্রম ও প্রয়োগেই কেবল মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন করতে সক্ষম।

কারখানায় কিছু কাজ থাকে যেগুলো খুবই সূক্ষ্ম, আবার কিছু কাজ আছে যেগুলো ঝুঁকিপূর্ণ ও শ্রমসাধ্য। যেমন-কম্পিউটার কিংবা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ তৈরি, খনিতে উত্তোলনের কাজ অথবা ভারী শিল্পের বড় বড় স্থানান্তর করার কাজ রোবটের মাধ্যমে করানো হয়। তাছাড়া প্রতিকূল পরিবেশ যেখানে মানুষের পক্ষে কাজ করা দুষ্কর সেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত রোবট দিয়ে কাজ করাতে দেখা যায়।

উপরোক্ত ক্ষেত্র ছাড়াও শ্রমিক-কর্মচারীদের মাসিক বেতনের হিসাব, বার্ষিক রিপোর্ট ও বার্ষিক বাজেট তৈরির কাজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে করা সম্ভব হচ্ছে।

২.২.৩ শিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার শিক্ষাকে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এখন ইচ্ছা করলে যে কেউ বাংলাদেশে বসে আমেরিকার কোন লাইব্রেরি থেকে বই পড়তে পারে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা, পরীক্ষা দেওয়া কিংবা শিক্ষামূলক বিভিন্ন ওয়েবসাইট হতে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাকে ই-এডুকেশন বা ই-লার্নিং বলে। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর লাইব্রেরি কিংবা গবেষণা কর্ম সাথে সাথে ইন্টারনেটের তথ্য ভান্ডারে প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারছে। তাছাড়া টেলিভিশন, টেলিফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেট সর্বোপরি কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার যাবতীয় তথ্য সম্প্রচারিত হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর উপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষার্থীরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয় কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ডকুমেন্ট প্রসেসিং, স্প্রেডশীট বিশ্লেষণ ইত্যাদি ব্যবহার করতে শিখছে এবং সেই সাথে নতুন পাঠ্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ করছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষাদান অনেক সহজ হয়েছে। কম্পিউটারে Slide বা অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহারে একাধিক নিখুঁত বোধগম্য ছবি ব্যবহার করে শিক্ষাদান সম্ভব। আবার Lecture তুলতে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা সব বুঝে উঠতে পারে না। বর্তমানে সহজেই তারা Lecture এর কপি পেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ক্লাসের শুরুতে Lecture এর কপি Online এ ছাত্রদের সরাসরি দিয়ে দেয়, যার ফলে তারা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে পড়া বুঝতে পারে।

বর্তমানে Distance Learning এর সাহায্যে ঘরে বসে পড়া এমনকি ডিগ্রি নেয়া সম্ভব। শিক্ষার এ ক্ষেত্রে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিপ্লব এনেছে। বর্তমানে মাল্টিমিডিয়া সিডি ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে যে কোন বিষয় সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা জানতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা ছাত্রদের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের নাম ও ঠিকানা দিয়ে দেয় যাতে তাদের বিশ্লেষণ দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের অভ্যাস বৃদ্ধি পায় যা বর্তমান বিশ্বে জ্ঞানের প্রধান ভান্ডার হিসেবে বিবেচিত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী গ্রেড নির্ণয়, প্রাপ্ত নম্বর বা নাম অনুযায়ী সাজানো, নম্বরের ভিত্তিতে মন্তব্য (একক ও সাধারণ) বা রিপোর্ট তৈরি প্রভৃতি কাজ অতি সহজে ও অতি দ্রুত করা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে এমনকি মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে ফলাফল জানতে পারছে।

শিক্ষকদের পেশাদারীত্ব বৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। পাঠ্যক্রম তৈরি, শিক্ষাদানের তথ্য সংগ্রহ, মান নির্ণয় ও ফলাফল প্রকাশ, শিক্ষাদানের দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষাদানে বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যবহার, বিভিন্ন এলাকার শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের সাথে যোগাযোগ ও তাদের মতামত জানা, অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাদারীত্ব অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.২.৪ চিকিৎসা

বর্তমানে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কম্পিউটার দ্বারা রোগ নির্ণয় ও ঔষধের মান-নিয়ন্ত্রণের কাজ করলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে এখন মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে খুব সহজেই স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায়। অনলাইনের মাধ্যমে সাক্ষাৎ–সূচি বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় যা মূলত টেলিমেডিসিন নামে পরিচিত। অর্থাৎ টেলিমেডিসিন হল এমন একটি চিকিৎসা সেবা প্রযুক্তি যার মাধ্যমে বর্তমান স্থানে অবস্থান করে অন্য স্থানের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা যায়।

বর্তমানে চিকিৎসা সুবিধা ছাড়াও হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কর্মকান্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। হাসপাতলের সমস্ত হিসাবপত্র, বেডে রোগীর সংখ্যা, রোগীকে ঔষধ প্রদানের সময়সূচি, ডাক্তারের রোগী দেখার সময়সূচি, রোগীর যাবতীয় তথ্য এবং কর্মচারীদের তথ্য সংরক্ষণ করতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

২.২.৫ গবেষণা

গবেষণার ক্ষেত্র সনাক্তকরণ, ডিজাইন ও বিশ্লেষণসহ প্রতিটি ধাপে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আধুনিককালে গবেষণার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কম্পিউটার একটি অপরিহার্য উপকরণ। কম্পিউটার সামাজিক গবেষণার তথ্যাদি বিশ্লেষণ উপযোগী সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে গবেষককে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা এবং পরিসংখ্যান বিষয়ে গবেষণায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান অতুলনীয়। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই টেলিফোন, মোবাইল ফোন, টেলিভিশন, রেডিও, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িছে পড়ছে। বর্তমানে সর্বশেষ গবেষণা কর্মটি যেখানে শেষ সেখান থেকে অন্য গবেষক গবেষণা শুরু করতে পারছেন। ফলে বিজ্ঞান নিত্য নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দ্বারে হাজির হচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া মহাকাশ গবেষণার কথা ভাবাই যায় না। নভোযান তৈরির ডিজাইন থেকে শুরু করে সফল মিশন শেষে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসা পর্যন্ত সব কাজই কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত। মহাকাশ গবেষণায় যে সকল সূক্ষ্ম গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয় তা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া সম্ভব নয়।

২.২.৬ অফিস ব্যবস্থাপনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলেই অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিক ধারার প্রবর্তন হয়েছে। অফিস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের জটিল ও রুটিন কাজ সম্পাদন করতে হয়। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিস ডকুমেন্ট তৈরি, সংরক্ষণ, সিদ্ধান্তসমূহ বিভিন্ন বিভাগে প্রেরণ ও পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিভাগসমূহের মতামত বিশ্লেষণ করতে হয়। এসব ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.২.৭ বাসস্থান

বর্তমান বিশ্বগ্রামের যুগে মানুষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অত্যাধুনিক বাসস্থান তৈরি করছে। বাসস্থানের নকশা তৈরির ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনে সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে বহুতলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক ভবনের নকশা তৈরি করা হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে শহরকেন্দ্রিক বাসস্থান হিসেবে গ্লোবাল অ্যাপার্টমেন্ট বা বৈশ্বিক বাসস্থান তৈরি হচ্ছে। এ ধরনের বাসস্থান হলো ওয়ান-স্টপ সার্ভিস পয়েন্টের মতো, যেখানে বসবাসের জন্য সকল উপযোজন পাওয়া যায় যা ডিজিটাল হোম নামে পরিচিত।

২.২.৮ বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ

বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিনোদনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় না। ইন্টারনেটের ব্যবহার বিনোদন ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিখ্যাত সব কবি সাহিত্যিকদের লেখা গল্প, কবিতা বা উপন্যাসের বই এখন অনলাইনে পাওয়া যায়। যে

কেউ ইচ্ছা করলেই অনলাইনে বইগুলো পড়তে পারে। নতুন নতুন শিল্পকর্ম এবং সাহিত্যের খবর এখন ইন্টারনেটেই পাওয়া যায়। স্যাটেলাইটের পাশাপাশি এখন অনলাইনেও বিভিন্ন টিভি প্রোগ্রাম দেখা যায়। বিভিন্ন খেলাধুলার তাৎক্ষণিক আপডেট পাওয়া যায় এমনকি সরাসরি খেলাও দেখা যায়। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের ডিজিটাল ভার্সন এখন অনলাইনেই পড়া যাচ্ছে। মোট কথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের বিনোদনের সকল চাহিদাকে পূরণ করে যাচ্ছে।

ইন্টারনেট এখন সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। ইন্টারনেটের কল্যাণে মানুষ ফেসবুক বা টুইটারের সাহায্যে বিশাল সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর সাহায্যে মানুষ নতুন নতুন বন্ধু তৈরির পাশাপাশি খুঁজে পাচ্ছে পুরাতন বন্ধুদেরও। এর সাহায্যে সহজেই একে অন্যের খোঁজ–খবর নিতে পারছে, তথ্যের আদান–প্রদান করতে পারছে। এই সকল মাধ্যমগুলোতে মানুষ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারছে। ইন্টারনেটের সাহায্যে মানুষ আজ এই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছে যার মাধ্যমে সামাজিক চাহিদাও পূরণ হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বাসার কাছের কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল পরিদর্শন করে সেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া বিভিন্ন তথ্যকে কাজে লাগিয়েই মানুষ সৃষ্টি করছে সহজ, সুন্দর এ বিশ্ব জগৎ। কম্পিউটার নির্ভর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমানে সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে সমগ্র দেশ ও জাতি একটি পরিবারে একই সূত্রে গ্রথিত হচ্ছে। বিশ্ব পরিণত হয়েছে একটি বিশ্বগ্রামে। বিশ্বগ্রাম ধারণার সাথে অনেক উপাদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বগ্রামের ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা, অফিস–ব্যবস্থাপনা, বাসস্থান, বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

ঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট হলো–

i. বিং

ii. টুইটার

iii. ফেসবুক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। সকল বৈজ্ঞানিক কর্মকান্ড কিসের উপর নির্ভরশীল ?

ক) কম্পিউটার খ) আবহাওয়া

গ) যোগাযোগ ঘ) তথ্য

পাঠ-২.৩ টেলিকন্‌ফারেন্সিং এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- টেলিকন্‌ফারেন্সিং এর ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	টেলিকন্‌ফারেন্সিং, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি।

২.৩.১ টেলিকন্‌ফারেন্সিং

টেলিকন্‌ফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সভা, সেমিনার বা দলবদ্ধভাবে যোগাযোগ করা যায়। ভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে কিছু ব্যক্তি অবস্থান করে টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে কোন সভা অথবা সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়াকে বলা হয় টেলিকন্‌ফারেন্সিং।

বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে যে কোন ব্যক্তিই টেলিফোন মাধ্যম ব্যবহার করে টেলিকন্‌ফারেন্স করতে পারে। টেলিকন্‌ফারেন্স বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন: পাবলিক কন্‌ফারেন্স, ক্লোজড কন্‌ফারেন্স এবং রিড অনলি কন্‌ফারেন্স। পাবলিক কন্‌ফারেন্স সবার জন্য উন্মুক্ত। যে কেউ এই কন্‌ফারেন্সে অংশগ্রহণ করতে পারে। ক্লোজড কন্‌ফারেন্স সবার জন্য উন্মুক্ত নয়; পাসওয়ার্ড প্রটেকটেড। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড দিয়ে এই কন্‌ফারেন্সে অংশগ্রহণ করা যায়। টেলিকন্‌ফারেন্সিং সফ্‌টওয়্যার ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

২.৩.২ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হচ্ছে হার্ডওয়্যার ও সফ্‌টওয়্যারের সমন্বয়ে কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে কোনো বস্তু, ঘটনা বা পরিবেশের বাস্তবভিত্তিক বা ত্রিমাত্রিক চিত্রভিত্তিক রূপায়ণ। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে বাস্তব নয় কিন্তু বাস্তবের চেতনা উদ্যোগকারী বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বলে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি মূলত কম্পিউটার প্রযুক্তি ও সিমুলেশন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃত্রিম পরিবেশকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা ব্যবহারকারীর কাছে সত্য ও বাস্তব মনে হয়। ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ত্রি-মাত্রিক ইমেজ তৈরির মাধ্যমে অতি অসম্ভব কাজও করা সম্ভবপর হয়।

ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশের সময় একজন ব্যবহারকারীকে মাথায় হেড মাউন্টেড ডিসপ্লে (Head Mounted Display-HMD), হাতে একটা ডাটা গ্লোভ (Data Glove) বা একটি পূর্ণাঙ্গ বডি স্যুইট (Body Suit) পরতে হয় এবং ভার্চুয়াল রিয়েলিটি তাকে কোনো রকম শারীরিক ঝুঁকি বা বিপদ ছাড়াই বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

২.৩.৩ প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার ও প্রয়োগক্ষেত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহারের কয়েকটি ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হলো -

চিকিৎসা ক্ষেত্রে

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রেই আজ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের ভুল ও ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে ডাক্তারদের আধুনিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষানবীশ সার্জনদের জন্য অভিজ্ঞতা অর্জনের সবচাইতে বড় সুযোগ হলো অভিজ্ঞ কোনো সার্জনের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে নতুন চিকিৎসকরা ভার্চুয়াল রিয়েলিটিকে মেডিক্যাল ট্রেনিং টুল হিসেবে খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারে। এর সাহায্যে তারা একেবারে অপারেশন থিয়েটারে রোগীর অপারেশন পরিচালনার মতোই বাস্তবিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকেন। পাশাপাশি চিকিৎসা সেবার মানও উন্নত করা যায়। ভার্চুয়াল অপারেটিং কক্ষে ছাত্ররা কৌশলগত দক্ষতা, অপারেশন ও রোগ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদির কার্যপ্রণালি অনুশীলন করতে সক্ষম হয়।

খেলাধুলা ও বিনোদনের ক্ষেত্রে

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির কল্যাণে মানুষ বিভিন্ন খেলাধুলার নিয়ম–কানুন সম্পর্কে জানতে পারছে। কম্পিউটারের সাথে কোন একটি গেমে অংশগ্রহণ বা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তি একই গেমে অংশগ্রহণ করতে পারছে। দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক সিমুলেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কার্টুন, ঐতিহাসিক ছবি, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী বা পূরাণিক কাহিনীনির্ভর ছবি নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে।

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে

কম্পিউটারের সাহায্যে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি এখন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সড়ক, আকাশ, রেল এবং জলপথে চলাচলকারী যানবাহনের পরিচালনায় এখন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি যান চালক গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে চালকগণ যদি তাদের যান চালনায় পারদর্শী হয়, তাহলে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনা সম্ভব হয়।

রেলপথ এবং জলপথে চলাচলকারী যানের ক্ষেত্রে একইভাবে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগ করে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে রেল চালককে রেল চালনার রুট, জরুরি মুহূর্তে করণীয় বিষয়াবলি পূর্বেই শেখানো যায়। জলযানের ক্ষেত্রে সঠিক গন্তব্যে সাবধানতার সাথে কীভাবে তা পরিচালনা করা যায় তার কাল্পনিক উপস্থাপনার মাধ্যমে যান চলাচলে গতিশীলতা সৃষ্টি করা সম্ভব। বন্দরে জলযানের সার্বিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব।

ফ্লাইট সিমুলেশনের ক্ষেত্রে

ফ্লাইট সিমুলেশন হলো এমন একটি কাজ যা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির কৌশল প্রয়োগ করে বেসরকারি বা সামরিক বিমান চালকদের কোনো ধরনের সত্যিকার উড়োজাহাজ ব্যবহার না করে শুধুমাত্র স্পর্শকাতর কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে বিমান পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। উন্নত বিশ্বের বাণিজ্যিক বিমান সংস্থা কিংবা সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে বিমান পরিচালনা প্রশিক্ষণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করছে। এজন্য ফ্লাইট সিমুলেটর ব্যবহার করা হয়। ফলে বিমান চালকগণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিমান পরিচালনার নতুন নতুন দক্ষতার উন্নয়ন, নতুন বিমানের ফ্লাইট বৈশিষ্ট্যাবলি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিশেষ এক ধরনের প্রযুক্তির কল্যাণেই কম্পিউটারের চিন্তাভাবনাগুলো মানুষের মতই? এখানে কোন ধরনের প্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে? সেই প্রযুক্তির সুবিধা ও অসুবিধার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

ভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে কিছু ব্যক্তি অবস্থান করে টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের মাধ্যমে সংযুক্ত থেকে কোন সভা অথবা সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়াকে বলা হয় টেলিকন্‌ফারেন্সিং। আর ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হচ্ছে হার্ডওয়্যার ও সফ্‌টওয়্যারের সমন্বয়ে কম্পিউটার সিস্টেমের মাধ্যমে কোনো বস্তু, ঘটনা বা পরিবেশের বাস্তবভিত্তিক বা ত্রিমাত্রিক চিত্রভিত্তিক রূপায়ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কি তৈরি করে?

ক. বাস্তবভাবে কৃত্রিমজগৎ
খ. বাস্তবভাবে কাল্পনিক জগৎ
গ. কৃত্রিমভাবে বাস্তব জগৎ
ঘ. কাল্পনিকভাবে কৃত্রিম জগৎ

৩। ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার লক্ষ্যণীয় কোন ক্ষেত্রে ?

ক. দাবা খেলায়
খ. চলচিত্রে
গ. অনলাইন ব্যাংকিং-এ
ঘ. ই-বুকে

পাঠ-২.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এর ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রোবটিকস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ক্রায়োসার্জারীর ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বায়োমেট্রিক্স ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধারণা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, ক্রায়োসার্জারী, বায়োমেট্রিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলেই মানুষের কল্যাণ দিন দিন বেড়েই চলছে। বিগত দু'দশকে উন্নত দেশগুলো আইসিটি খাতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, ক্রায়োসার্জারী, বায়োমেট্রিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা হয়েছে। নিম্নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতার সাথে যুক্ত প্রযুক্তিসমূহ তুলে ধরা হলো-

২.৪.১ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI) হচ্ছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সমন্বয়। মানুষ যেভাবে চিন্তা করে তেমনি কৃত্রিম উপায়ে কম্পিউটারে সেভাবে চিন্তা ভাবনার রূপদান করাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা Artificial Intelligence (AI) বলে। AI এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কম্পিউটারকে উন্নত করা যাতে কম্পিউটার চিন্তা করার ক্ষমতা, পাশাপাশি দেখতে পারা, শুনতে পারা, হাঁটা এবং অনুভব করার ক্ষমতা পায়। কম্পিউটার কীভাবে মানুষের মতো চিন্তা করবে, কিভাবে অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে, কিভাবে সমস্যা সমাধান করবে, কিভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে ইত্যাদি বিষয়গুলোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর আরো গবেষণা করা হচ্ছে। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যেসব স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নরূপ :

১। কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ।
২। সমস্যার কারণ নির্ণয়পূর্বক সমাধানের পথ নির্দেশ।
৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা।
৪। সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা।
৫। নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন।
৬। ভাষা বুঝার ক্ষমতা।
৭। অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাবার মত সক্ষমতা।
৮। মানুষের মত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো।
৯। পরস্পর সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন এবং সাড়া দেয়ার ক্ষমতা।
১০। ভুল, অপ্রাসঙ্গিক এবং অসম্পূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পরিচালনা।
১১। জটিল অবস্থা অনুধাবন ও পরিচালনার ক্ষমতা।
১২। নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা; ইত্যাদি।

২.৪.২ রোবটিক্স

কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যে মেশিন মানুষের মতো কাজ করে তাকে বলা হয় রোবট। আর প্রযুক্তির যে শাখায় রোবটের নকশা, গঠন ও কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই শাখাকে রোবটিক্স বলা হয়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে রোবটের দর্শন ক্ষমতা, স্পর্শ ক্ষমতা, হাত ও পায়ের যথাযথ পরিচালন, চলাচলের ক্ষমতা, শারীরিক মুভমেন্ট ইত্যাদি উদ্ভব হয়েছে। রোবটিক্স প্রযুক্তির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে।

রোবট অত্যন্ত দ্রুত, ক্লান্তিহীন ও নিখুঁত কর্মক্ষম একটি যন্ত্র। রোবটের সাহায্যে যে কোন প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করা যায়। তবে রোবট তৈরি করা ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। জাপানের মুরাতা কোম্পানির "মুরাতা বয়", হোন্ডা কোম্পানির "আসিমো", সনি কর্পোরেশনের "আইবো" ইত্যাদি রোবট প্রায় মানুষের মতই বিশেষ কোন কাজ করতে পারে।

রোবটের ব্যবহার

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রোবটকে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন-

- শিল্পের বিপজ্জনক ও কঠিন কাজ করা।
- বৃহৎ মেশিনের কষ্টদায়ক যন্ত্রপাতির সংযোজন।
- খনি হতে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ উত্তোলন।
- মহাকাশ গবেষণায় রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে।
- মহাশূন্যের ছবি সংগ্রহ।
- ক্ষতিকর বিস্ফোরক সনাক্তকরণে।
- গৃহস্থালীর কাজে রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে।
- গভীর অরণ্য কিংবা বহুদূরত্বে শত্রুর উপস্থিতির প্রমাণে।
- শিল্প কারখানায় দ্রুত উৎপাদন কার্য হাসিলে রোবটের ব্যবহার হচ্ছে; ইত্যাদি।



চিত্র ২.৪.১ : রোবট

২.৪.৩ ক্রায়োসার্জারি

ক্রায়োসার্জারি হচ্ছে অত্যন্ত ঠান্ডা তাপমাত্রা ব্যবহার প্রক্রিয়া যার সাহায্যে শরীরের অস্বাভাবিক টিস্যু ধ্বংস করা হয়। ক্রায়োসার্জারিকে ক্রায়োথেরাপিও বলা হয়। ক্রায়োসার্জারি অশ্বরোগ, ছানি, হাড়, যকৃত, প্রোস্টেট ক্যান্সার ইত্যাদি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ক্রয়োসার্জারিকে একটি কার্যকর ও নিরাপদ চিকিৎসা বিবেচনা করা হয়। প্রায় বিগত ৪০ বছর ধরে প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ক্রায়োসার্জারির সুবিধাসমূহ

- ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে সার্জারি থেকে কম ক্ষতিকর।
- সার্জারির কারণে ব্যাথা, রক্তক্ষরণ ও অন্যান্য যে অসুবিধা হয়, ক্রয়োসার্জারিতে তা হয় না।
- ক্রায়োসার্জারি পদ্ধতিতে চিকিৎসা খরচ কম।
- অন্য পদ্ধতির তুলনায় হাসপাতালে কম সময় থাকতে হয়।

ক্রায়োসার্জারির অসুবিধাসমূহ

- দীর্ঘমেয়াদী ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা।
- মাইক্রোকপিক ক্যান্সার বিস্তার রোধে ব্যর্থ।
- কার্যকর কৌশলের বিষয়ে প্রশ্নবিদ্ধ।



চিত্র ২.৪.২ : ক্রায়োসার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতি

২.৪.৪ আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা

বর্তমানে উৎপাদন ব্যবস্থায় আইসিটি যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে উৎপাদন, পরিবহণ, বিপণনসহ সকল ধাপে আইসিটির সাহায্য নিতে হয়। অধিক উৎপাদন, শিল্প কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, সহজে কাস্টোমার সার্ভিস ও কাস্টোমারের চাহিদা পূরণে আইসিটির প্রভাব লক্ষ্যণীয় । এছাড়াও শিল্প কারখানার

যাবতীয় কাঁচামালের আমদানি হিসাব, রপ্তানি হিসাব, বাজেট প্রণয়ন, বার্ষিক রিপোর্ট, বেতন ভাতার হিসাব, শ্রমিক নিয়োগ ইত্যাদি কাজ আইসিটির কল্যাণে অতি সহজ হয়েছে। যা সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক।
কৃষি ক্ষেত্রে দেশে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ ঘাটতি ও আমদানির হিসাব দ্রুত নির্ণয় করা যায়। পরিবর্তিত আবহাওয়ার প্রেক্ষিতে উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ, নতুন জাতের বীজ উৎপাদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা , বীজ সংরক্ষণ, শস্যের গুনাগুণ নির্ণয় ইত্যাদিতে আইসিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২.৪.৫ বায়োমেট্রিক্স

গ্রীক শব্দ metron অর্থ পরিমাপ এবং "bio" অর্থ জীবন, এ দু'টি শব্দ থেকে Biometrics শব্দের উৎপত্তি। বায়োমেট্রিক্স হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কোন ব্যক্তির দেহের গঠন এবং আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাকে অদ্বিতীয়ভাবে চিহ্নিত বা সনাক্ত করা যায়। কম্পিউটার বিজ্ঞানে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিকে ব্যক্তি সনাক্তকরণ এবং কোন সিস্টেমে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দেহের গঠন এবং আচরণগহত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা–

ক. দেহের গঠন ও শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক পদ্ধতি
১. ফিংগার প্রিন্ট (Fingerprint)
২. হ্যান্ড জিওমিট্রি (Hand geometry)
৩. আইরিস এবং রেটিনা স্ক্যান (Iris and retina scan)
৪. ফেইস রিকোগনিশন (Face recognition)
৫. ডিএনএ টেস্ট (DNA test)

খ. আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বায়োমেট্রিক পদ্ধতি
১. ভয়েস রিকগনিশন (Voice recognition)
২. সিগনেচার ভেরিফিকেশন (Signature verification)
৩. টাইপিং কীস্ট্রোক (Keystroke verification)

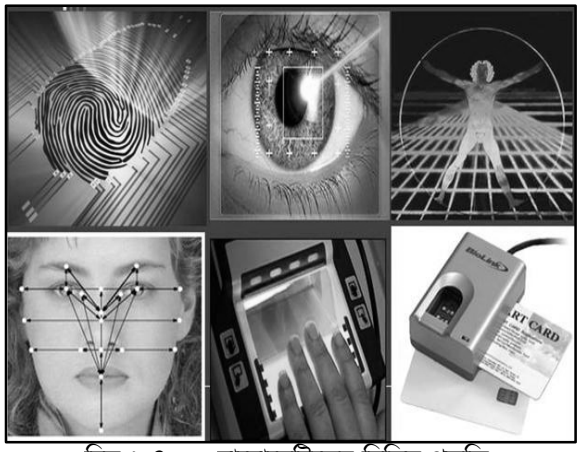

চিত্র ২.৪.৩ : বায়োমেট্রিকের বিভিন্ন পদ্ধতি

একটি বায়োমেট্রিক ডিভাইস কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ডিজিটাল কোডে রূপান্তর করে এবং এই কোডকে কম্পিউটারে সংরক্ষিত কোডের সাথে তুলনা করে। যদি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত কোড কম্পিউটারে সংরক্ষিত কোডের সাথে মিলে যায় তবে তাকে ডিভাইস ব্যবহারের অনুমতি দেয় বা তাকে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

আইন শৃঙ্খলা এবং বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে এ প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন বিভাগেও বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। আবার গাড়ি, কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বায়োমেট্রিক্স নিরাপত্তা পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে।

বর্তমানে বাংলাদেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন: জাতীয় পরিচয় পত্রে, সিম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সনাক্তকরণের জন্য আঙ্গুলের ছাপ নেয়া হয়। বায়োমেট্রিক্স নিয়ে এখন বড় বড় কম্পিউটার ও সফ্টওয়্যার কোম্পানি গবেষণা করছে। বায়োমেট্রিক প্রযুক্তিতে চোখের মণি শনাক্ত করার যন্ত্রটি তৈরি করেছে এনসিআর নামের একটি নেটওয়ার্ক কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞানের এই নতুন প্রযুক্তিটা উদ্ভাবন করেছে সেন্সর ইনকর্পোরেটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান।

২.৪.৬ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ কোষে নতুন ডিএনএ (DNA) সংযোজন কৌশল। জিন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রচেষ্টা অধিকাংশে কৃষির উপর জোরদার করা হয়েছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিকূল আবহাওয়ায় পোকা, রোগ, ছত্রাক ইত্যাদি প্রতিরোধী উদ্ভিদ জন্মাতে পারে।

বিজ্ঞানীদের মতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দ্বারা মানুষ যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমনি অনেক বিজ্ঞানীর মতে এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে অনেক নতুন রোগ জীবাণুর জন্ম হতে পারে। বিজ্ঞান চর্চার প্রাথমিক যুগের সূচনা ঘটেছিল গণিত চর্চার

মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগে তা পদার্থবিদ্যার বিকাশে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখে। ধীরে ধীরে নিউটন, গ্যালিলিও, আইনস্টাইন, বোরের তত্ত্ব একে আধুনিক যুগে নিয়ে আসে। কিন্তু ১৯২০-এর আবিষ্কারের ধারা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। তখন বিজ্ঞানীরা ঝুঁকতে থাকে পরিবেশ, পৃথিবী, মানুষ, জীবজগৎ নিয়ে গবেষণার দিকে। বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীকে তাই নিঃসন্দেহে বলা হচ্ছে The Century of Biological Science। এর কারণ ১৮৭২ সালে পল বার্গের রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর আবিষ্কার।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত ট্রান্সজেটিক (উন্নত বৈশিষ্টধারী) উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টিতে কাজ করে। নামের শেষে ইঞ্জিনিয়ারিং যোগ করার কারণ হচ্ছে জীববিজ্ঞানের কেবলমাত্র এ শাখাটিতেই নিজের ইচ্ছামত ডিজাইন করে এক একটি প্রাণী সৃষ্টি করা যায় ও ডিজাইন করা যায়। একবার এক বিজ্ঞানী ঠিক করলেন ছাগলের দুধের মধ্যে তিনি মাকড়সার জালের মত সুতা তৈরি করবেন যা হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী সুতা। তিনি সফল হয়েছিলেন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে এবং সৃষ্টি করেছিলেন বায়োস্টীল।

শিক্ষার্থীর কাজ	উন্নত বীজ তৈরিতে কোন প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কিভাবে এই প্রযুক্তিটি মানুষকে সহায়তা দিচ্ছে- সে সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত মতামত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতার বিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার এত বেশি যে আধুনিক সভ্যতা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আলাদাভাবে চিন্তা করা যায় না। বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতার ছোঁয়া লাগেনি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলো হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, ক্রায়োসার্জারি, আইসিটি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, বায়োমেট্রিক্স, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কম্পিউটার কোন ধরনের ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে?

ক. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা খ. অফিস ব্যবস্থাপনা
গ. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ঘ. কোনটিই নয়

২। কম্পিউটারে বুদ্ধির প্রচলন করতে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়?

ক. আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স খ. আর্টিফিসিয়াল ইনস্ট্রাকশন
গ. ন্যাচারাল ইন্টিলিজেন্স ঘ. ন্যাচারাল ইনস্ট্রাকশন

পাঠ-২.৫ সমাজ জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সমাজ জীবনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবের ক্ষেত্রসমূহ ।

সমাজে আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জয়জয়কার। ব্যবসা, ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং শিল্প সংস্কৃতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। কলকারখানায় অধিকতর দক্ষতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে যেসব মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো হলো টেলিফোন, টেলিটেক্সট, ফ্যাক্স, টেলিভিশন এবং সর্বোপরি কম্পিউটার। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো–

- **ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ঃ** তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকান্ড প্রায় অচল, বিশেষত উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অসম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার বুলেটিন বোর্ড, ইলেক্ট্রনিক মেইল, ওয়েবসাইট এবং ইন্টারনেটে বাণিজ্যিক যোগাযোগসহ সব রকম যোগাযোগে রয়েছে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ব্যতীত আধুনিক ব্যবসা ও আমদানি রপ্তানিতে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

- **যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঃ** আজকাল যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ এবং আকাশপথের যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করেছে সহজতর, দ্রুত এবং লাভজনক। ফলে সময় এবং অপচয় রোধ হচ্ছে এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা হচ্ছে সংরক্ষিত। টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার, ইলেকট্রনিক মেইল ইত্যাদি যোগাযোগ মাধ্যমে বিপ্লব এনে দিয়েছে।

- **শিক্ষা ক্ষেত্রে ঃ** শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার শিক্ষাকে সবার দ্বার গোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এখন ইচ্ছা করলে কেউ বাংলাদেশে বসে আমেরিকার কোনো লাইব্রেরী থেকে বই পড়তে পারছে। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী কিংবা গবেষণা কর্ম সাথে সাথে ইন্টারনেটে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। তাছাড়া টেলিভিশন, টেলিফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেট সর্বোপরি কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার যাবতীয় তথ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে।

- **বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঃ** বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিপুল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা কর্ম নতুনভাবে প্রাকাশিত হওয়ার ফলে টেলিফোন, টেলিভিশন, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং গবেষণা কর্ম উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে।

  চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ ঘরে বসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে চিকিৎসা সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে । নতুন নতুন ঔষধের উদ্ভাবন এবং রোগ নিরাময়ের সর্বশেষ পদ্ধতি আজ সবাই জেনে যাচ্ছেন।

- **শিল্প-সাহিত্যে এবং বিনোদনে ঃ** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে আজ শিল্প সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার হচ্ছে এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। সাহিত্য ও শিল্প কর্মের ফলাফল আজ মুহূর্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিনোদনের কথাতো বলাই বাহুল্য। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে সারা বিশ্ব আজ অমাদের হাতের মুঠোয়। সারা বিশ্বের টিভি চ্যনেলের অনুষ্ঠান আজ ঘরে বসে উপভোগ করা যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের ফলেই শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব"- উক্তিটির স্বপক্ষে আপনার মতামত দিন।

সারসংক্ষেপ

সমাজে আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জয়জয়কার। ব্যবসা, ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং শিল্প সংস্কৃতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে, যোগাযোগের ব্যবস্থায়, শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে, শিল্প-সাহিত্যে এবং বিনোদন ইত্যাদিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সারা বিশ্ব আজ অমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে ?

ক) মাল্টিমিডিয়া খ) তথ্য প্রযুক্তি
গ) বই-পুস্তক ঘ) চারুকলা

২। বিশ্ব আজ এক তথ্যের মহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছে কিসের ফলে ?

ক) মোবাইল ফোন খ) টেলিভিশন
গ) ইন্টারনেট ঘ) মাল্টিমিডিয়া

পাঠ-২.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	আউটসোর্সিং, ই-কমার্স ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব ব্যাপক ভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিকে। মানুষের এমন কোনো কর্মক্ষেত্র নেই যেখানে প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। বর্তমানে অফিস অটোমেশন ও ইন্টারনেট সংযোগের সহজলভ্যতা আর দ্রুততার কারণে প্রতিদিনই হচ্ছে কোটি কোটি বাণিজ্যিক লেনদেন, শেয়ার করা হয় কোটি কোটি ম্যাসেজ ও ই-মেইল। বর্তমানে ইন্টারনেট অর্থনীতির ক্রমোন্নতির চালক এবং কর্মক্ষেত্র তৈরির নিয়ামক।

কর্মসংস্থানের উপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাব নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কর্মক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়তা আনায়নে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরিতে অগ্রণি ভূমিকা পালন করছে। অর্থাৎ আইসিটির ধারণা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। প্রচলিত নিয়মে একটি দেশের একজন মানুষ কেবলমাত্র সেই দেশের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে পারে কিন্তু আইসিটি সেই সীমানাকে দূরীভূত করে দিয়েছে। আইসিটি ব্যবহারের ফলেই কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের আর নিজ দেশের সীমানার মধ্যে পড়ে থাকতে হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলেই যে কেউ বিশ্বের যে কোন প্রান্তে চাকুরির জন্য আবেদন করতে পারছে।

তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে মোবাইল ফোন, ওয়েব সাইট বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক অর্ডারের মাধ্যমে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্বে এড়িয়ে পণ্য উৎপাদন ও সরবারহকে নিজের নিয়ন্ত্রণ এনে ব্যবসায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে সম্প্রসারণ করতে পারছে। আমাদের দেশের বৃহৎ এ জনগোষ্ঠীর আয়কে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে আউটসোর্সিং এর মত কাজ। জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্যে করতে পারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সফল ব্যবহার । সুতরাং বলা যায়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কিছু ক্ষেত্র নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

২.৬.১ আউটসোর্সিং

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বব্যাপি কর্মসংস্থানের বাজার হয়েছে উন্মুক্ত। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই যে কোন দেশের লোকজন বিশ্বের যে কোন দেশের কাজকর্ম করতে পারছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপি এ ধরনের কাজ করে অর্থ অর্জন করার প্রক্রিয়াই হল আউটসোর্সিং। ওয়েবসাইট উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, মাসিক বেতন-ভাতার বিল প্রস্তুতকরণ, ওয়েবসাইটে তথ্য যোগ করা, সফ্টওয়্যার তৈরি, বিভিন্ন কাজের জন্য ডিজাইন তৈরি, লোগো ডিজাইন, আর্টিকেল লেখা, অনুবাদ, ডাটা এন্ট্রি ইত্যাদি কাজ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে করা যায়।

আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে এখন অনেকেই ঘরে বসে তার মেধা দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজে অর্থ উপার্জন করছে এবং অন্যদের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এ সকল কাজ ইন্টারনেটে অনেক সাইটে পাওয়া যায়। এর মধ্যে জনপ্রিয় কয়েকটি হলো ওডেস্ক (www.odesk.com), ফ্রিল্যান্সার (www.freelancer.com), ইল্যান্স (www.elance.com) ইত্যাদি। যারা আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে তাদেরকে বলা হয় ফ্রি-ল্যান্সার।

২.৬.২ ই-কমার্স

ই-কমার্স এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ইলেকট্রনিক কমার্স। ইন্টারনেট প্রযুক্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পণ্য, সেবা ও তথ্য ক্রয়-বিক্রয়, হস্তান্তর বা বিনিময় কার্যকেই বলা হয় ই-কমার্স (E-commerce)। ই-কমার্স একটি বাণিজ্য ক্ষেত্র যেখানে কোন ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার লেনদেন সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। আধুনিক ই-কমার্স সাধারণত ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক কাজ পরিচালনা করে। এছাড়াও মোবাইল কমার্স, ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ও অন্যান্য আরো কিছু মাধ্যম ব্যবহৃত হয়। ই-কমার্সের সুবিধাসমূহ হলো-

১. ব্যবসার মান বিশেষভাবে উন্নয়ন করা যায়।
২. ই-কমার্স কোন প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক বাজারে প্রবেশ করতে সাহায্য করে।
৩. ই-কমার্সের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন খরচাদি যেমন- তালিকা তৈরী, বিতরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের খরচ ব্যাপকভাবে কমায়।
৪. ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সহজে সুসম্পর্ক তৈরী করে।
৫. ই-কমার্স সময় বাঁচায় এবং অতি দ্রুত ভোক্তার কাছে পণ্য পৌঁছায়।
৬. যোগাযোগ খরচ কমায়।
৭. পণ্য ও সেবার মান উন্নয়ন করা সহজ হয়।

সারা বিশ্বে অনলাইন লেনদেন বাড়ার কারণে ই-কমার্সের গতি ও আকার বড় হচ্ছে। ২০১১-১২ সাল থেকে বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে ই-কমার্সের প্রসার শুরু হয়। বর্তমানে বই থেকে শুরু করে জামা, কাপড়, খাবার, সৌখিন সামগ্রী ইত্যাদি অনলাইনে বেচাকেনা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এক সময় হয়তো পৃথিবীর সব ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য ই-কমার্সের মাধ্যমেই পরিচালিত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে ই-কমার্সের সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

কর্মক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারের ফলে কর্মীদের দক্ষতা, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বেড়েছে। অন্যদিকে এর ফলে সেবার মানও উন্নত হচ্ছে। সারা বিশ্বে অনলাইন লেনদেন বাড়ার কারণে ই-কমার্স এর গতি ও আকার বড় হচ্ছে। ই-কমার্স একটি বাণিজ্য ক্ষেত্র যেখানে কোন ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে পণ্য বা সেবার লেনদেন হয়ে থাকে। আবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে বসেই যে কোন দেশের লোকজন বিশ্বের যে কোন দেশের কাজকর্ম করতে পারছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপি এ ধরনের কাজ করে অর্থ অর্জন করার প্রক্রিয়াই হল আউটসোর্সিং।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

২. বর্তমানে চাকুরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহারে দক্ষতা একটি প্রাথমিক যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়?

ক. ফেসবুক খ. মোবাইল
গ. আইসিটি ঘ. টুইটার

৩. দেশের অর্থনীতির চাকাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে?

ক. ফেইসবুক খ. গুগল
গ. আউটসোর্সিং ঘ. ই-মেইল

পাঠ-২.৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে নৈতিকতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কম্পিউটার ইথিকস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কম্পিউটার ভাইরাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সফ্টওয়্যার পাইরেসি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কপিরাইট আইন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কম্পিউটার ইথিকস, কম্পিউটার ভাইরাস, সফ্টওয়্যার পাইরেসি, কপিরাইট আইন।

২.৭.১ নৈতিকতা

যে কোন জিনিসের ভাল মন্দ দুটি দিকই থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কুফলের চেয়ে সুফলই বেশি। নৈতিকতা হলো এক ধরনের মানদন্ড যা আচরণ, কাজ এবং পছন্দের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। অর্থাৎ নৈতিকতা হলো মানুষের কাজ-কর্ম, আচার ব্যবহারের সেই মূলনীতি যার উপর ভিত্তি করে মানুষ একটি কাজের ভাল বা মন্দ দিক বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে।

২.৭.২ কম্পিউটার ইথিকস

কম্পিউটার ইথিকস বা কম্পিউটার নীতিশাস্ত্র হলো ব্যবহারিক দর্শনশাস্ত্রের একটি শাখা যা পেশা বা সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কম্পিউটিং প্রফেশনালদের বা ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগকে কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে। বোলিং গ্রিন স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. ওয়াল্টার ম্যানার সর্বপ্রথম কম্পিউটার ইথিকস টার্মটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

১৯৯২ সালে 'কম্পিউটার ইথিকস ইন্সটিটিউট' কম্পিউটার ইথিকস এর বিষয়ে দশটি নির্দেশনা তৈরি করেছিলেন। নির্দেশনাগুলো র‍্যামন সি. বারকুইন তাঁর গবেষণাপত্রে উপস্থাপন করেছিলেন। এই নির্দেশনা হলো-

১. অন্যের ক্ষতি করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার না করা।
২. অন্য কোন ব্যক্তির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কাজের উপর হস্তক্ষেপ না করা।
৩. অন্য ব্যক্তির ফাইলসমূহ হতে গোপনে তথ্য সংগ্রহ না করা।
৪. চুরির উদ্দেশ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার না করা।
৫. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ বহনের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার না করা।
৬. নিজের নয় এরূপ অন্যের যে কোন ধরনের সফ্টওয়্যার কপি না করা।
৭. অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির রিসোর্স ব্যবহার না করা।
৮. অন্যের বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত ফলাফলকে আত্মসাৎ না করা।
৯. এমন কোন প্রোগ্রাম বা সফ্টওয়্যার তৈরি না করা যাতে সমাজের ক্ষতি হয়।
১০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ওই সব উপায়ে ব্যবহার করা উচিত নয় যা বিচার বিবেচনা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

পরবর্তীতে কম্পিউটার নিরাপত্তা সম্পর্কিত পেশাজীবী সংগঠন CISSP (Certre for Computing and Social Responsibility) এই ধারাসমূহকে তাদের নিজস্ব নৈতিকতা আইনের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। প্রধানত কম্পিউটার ইথিকস বা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিবেচ্যবিষয়সমূহ হলো কম্পিউটার অপরাধ (যেমন-সাইবার ক্রাইম, কম্পিউটার ভাইরাস, সফ্টওয়্যার পাইরেসি), প্লেজিয়ারিজম ও কপিরাইট আইন।

২.৭.৩ সাইবার ক্রাইম

কম্পিউটার এবং কমিউনিকেশন টেকনোলজির বিকাশের সাথে সাথে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরণের ক্রাইম সংগঠিত হচ্ছে। এসব ক্রাইমকে বলা হয় সাইবার ক্রাইম। নিম্নে প্রচলিত কিছু সাইবার ক্রাইম বা কম্পিউটারে ইন্টারনেট ভিত্তিক ক্রাইমের নাম দেওয়া হলো -

১. হ্যাকিং এর মাধ্যমে অন্যের তথ্য হস্তগত করা।
২. অবৈধভাবে কোন সিস্টেমের সকল রিসোর্স ব্যবহার বা ধ্বংসের জন্য বাইরে থেকে সিস্টেমে প্রবেশ করা ।
৩. কোন সিস্টেমকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যাতে ঐ সিস্টেম তার নির্ধারিত সার্ভিস প্রদান না করে।
৪. আপত্তিকর ই-মেইল বার্তা প্রেরণ।
৫. কম্পিউটার ভাইরাস তৈরি ও বিতরণ করা, ইত্যাদি।

২.৭.৪ কম্পিউটার ভাইরাস

কম্পিউটার ভাইরাস হলো এক ধরনের প্রোগ্রাম যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক্সিকিউট বা নির্বাহ হয়, তথ্য ও উপাত্তকে আক্রমণ করে এগুলোর ক্ষতি করে। ভাইরাস বা VIRUS শব্দের অর্থ হল "Vital Information Resources Under Seize." যার অর্থ হল গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দখলে নেয়া বা ক্ষতিসাধন করা। ভাইরাস কম্পিউটার এর ডাটা ফাইল নষ্ট করে ফেলে বা কম্পিউটার বুট হতে বাঁধা দেয় অথবা হার্ডডিস্ক নষ্ট করে ফেলতে পারে।

১৯৮০ সালে ভাইরাসের এ নামকরণ করেছেন প্রখ্যাত গবেষক ও অধ্যাপক ফ্রেড কোহেন। ভাইরাস নামক সফ্টওয়্যার কম্পিউটার এর তথ্য ও উপাত্তকে আক্রমণ করে এবং নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা রয়েছে এবং এক পর্যায়ে কম্পিউটারকে অচল করে দিতে পারে।

ভাইরাস সাধারণত যা যা ক্ষতি করতে পারে-

কোন কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্র ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে নিম্নলিখিত ক্ষতি হতে পারে-

১। কম্পিউটারে সংরক্ষিত কোন ফাইল মুছে দিতে পারে।
২। ফাইল বা ডাটা করাপ্ট বা নষ্ট করে দিতে পারে।
৩। মনিটরের রেজুলেশন চেঞ্জ বা পরিবর্তন হতে পারে।
৪। সিস্টেম এর সেটিং চেঞ্জ বা পরিবর্তন করতে পারে।

ভাইরাস প্রতিকারের উপায়

কম্পিউটার বা আইসিটি যন্ত্রের প্রতিষেধক হল এন্টিভাইরাস। সাধারণত একটি ভাল মানের এন্টিভাইরাস কয়েকশ ভাইরাস নির্মূল করতে পারে। বর্তমান সময়ের এন্টিভাইরাসগুলো ভাইরাস আক্রমণ করার পূর্বেই তা ধ্বংস করে কিংবা ব্যবহারকারীকে সতর্ক করে দেয়। ভাইরাসের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজকাল বিনামুল্যে ইন্টারনেট থেকে কিছু কিছু এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার ডাউনলোড এবং ইন্সটল কারা যায়। নিচে এ ধরনের কিছু প্রোগ্রাম এর নাম দেয়া হলো-

১। এভিজি এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার
২। এভিরা এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার
৩। অ্যাভাস্ট এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার
৪। নরটন এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার; ইত্যাদি।

২.৭.৫ সফ্টওয়্যার পাইরেসি

পাইরেসি সৃজনশীল কাজের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। পাইরেসি থেকে বাঁচার জন্য যথাযথ আইন তৈরি করা উচিত। একটি মুদ্রিত পুস্তকের কপিরাইট ভঙ্গ করে সেটি পুর্নমুদ্রণ করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু কম্পিউটারের বেলায় যে কোনো কিছুর কপি বা অবিকল প্রতিলিপি করা খুবই সহজ কাজ। এজন্য বিশেষজ্ঞ হওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণে কম্পিউটার সফ্টওয়্যার, কম্পিউটারে করা সৃজনশীল কর্ম যেমন ছবি, এনিমেশন ইত্যাদির বেলায় কপিরাইট সংরক্ষণ করার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা নিতে হবে। যখনই এরুপ কপিরাইট আইনের আওতায় কোনো কপিরাইট হোল্ডারের অধিকার

ক্ষুন্ন হয় তখনই কপিরাইট বিঘ্নিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এই ধরনের ঘটনাকে সাধারণভাবে পাইরেসি বা সফ্টওয়্যার পাইরেসি নামে অভিহিত করা হয়। আরও সহজভাবে বলা যায়, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তৈরিকৃত সফ্টওয়্যার অনুমতি ব্যতিত নকল করাকে সফ্টওয়্যার পাইরেসি বলে।

২.৭.৬ প্লেজিয়ারিজম

অন্যের লেখা চুরি করে নিজের নামে উপস্থাপন বা প্রকাশ করাকেই বলা হয় প্লেজিয়ারিজম। অর্থাৎ তথ্যসূত্র উল্লেখ ব্যতিত কোন ছবি, অডিও, ভিডিও এবং তথ্য ব্যবহার করা অন্যায় কাজ ও অপরাধ হলো প্লেজিয়ারিজম । তাই প্লেজিয়ারিজম একটি বেআইনী কাজ।

২.৭.৭ কপিরাইট আইন

কপিরাইট (Copyright) একটি ইংরেজী শব্দ। কপিরাইট শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গ্রন্থস্বত্ব। একজন লেখকের রচিত পুস্তক বা গ্রন্থের ওপর তার মুদ্রণ, পুন:মুদ্রণ ও প্রকাশের অধিকারকেই বলা হয় কপিরাইট। কপিরাইট আইন একটি একচেটিয়া, বৈধ ও নিশ্চিত অধিকার, যা একজনের বুদ্ধিবৃত্তিক বা মস্তিস্কজাত সৃষ্টিকে নকল বা পাইরেসি (Piracy) বা অন্যায় অনুসরণ হতে অন্য কাউকে বিরত রাখে। কপিরাইটের মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্পকর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলা সৃষ্টিকারীকে তার সৃষ্ট মেধাসম্পদ ব্যবহারের একচ্ছত্র অধিকার প্রদান করা হয়। গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা, জাতীয় সাহিত্যকর্ম, চিত্রকর্ম, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকলা, কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয়। কম্পিউটার সফ্টওয়্যারও কপিরাইট দ্বারা সংরক্ষিত হয়। কপিরাইট আইনের কারণেই কোন নির্মাতা, শিল্পী, প্রোগ্রামার কিংবা লেখক তাদের মেধার সঠিক মূল্যায়ন পেয়ে থাকেন। আর কপিরাইট আইনের কার্যকারিতা সৃজনশীল কর্মীদের নিরুৎসাহিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সফ্টওয়্যার পাইরেসি কি অপরাধ? আপনার মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

যে কোন জিনিসের ভাল মন্দ দুটি দিকই থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যদিও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কুফলের চেয়ে সুফলই বেশি। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিকতা বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নৈতিকতা হলো একটি ধারণা যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহারে নৈতিকতার বিষয়, সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিরোধকে বুঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কম্পিউটার ভাইরাস এর উদাহরণ কোনটি?

ক. বুট সেক্টর ভাইরাস খ. ওভার রাইটিং ভাইরাস
গ. ম্যাক্রো ভাইরাস ঘ. সবগুলোই

২। এন্টিভাইরাস সফ্টওয়্যার কোনটি?

ক. এভিজি খ. অ্যাভাস্ট
গ. এভিরা ঘ. সবগুলোই

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন DNA এবং প্রোটিন ধারার মধ্যে সম্পর্ক বের করা হয়?

ক. বায়োমেট্রিক্স খ. বায়োইনকফরমেটিক্স
গ. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ঘ. ন্যানো টেকনোলজি

২। বায়োমেট্রিক্স-এ পাসওয়ার্ড কোনটি?

ক. মানুষের বৈশিষ্ট্য খ. নির্দিষ্ট সংখ্যা
গ. নির্দিষ্ট শব্দ ঘ. শব্দ ও সংখ্যা

৩। ইলেকট্রনিক বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বাণিজ্য করাকে কী বলা হয়?

ক. ই-সার্ভিস খ. ই-কমার্স
গ. ই-গভর্ন্যান্স ঘ. ই-লার্নিং

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ই-কমার্স বলতে বোঝায়-

i. ইন্টারনেটে যোগাযোগ
ii. ইন্টারনেটে ব্যবসা বাণিজ্য
iii. মুক্ত বাজার ব্যবসা বাণিজ্য
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো –

i. DNA
ii. আঙুলের ছাপ
iii. চোখের মণি
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:

নিলয় অন-লাইনের মাধ্যমে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেছে। তার কিছু বন্ধু কানাডাতে পড়াশুনা করে। সে তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। পড়াশুনা শেষ করে প্রযুক্তির কল্যাণে নিলয় ঘরে বসেই অর্থ উপার্জন করছে। অন্যদিকে তার বন্ধু মাহমুদও প্রযুক্তির কল্যাণে যে কোন স্থান হতেই তার ব্যবসায়িক কাজ সম্পন্ন করতে পারছে।

১. নিলয়ের অর্থ উপার্জনের সিস্টেমটি হল-

ক. ই-কমার্স খ. আউটসোর্সিং
গ. ভিডিও কনফারেন্সিং ঘ. হ্যাকিং

২. মাহমুদের ব্যবহৃত সিস্টেমটির সাথে সম্পর্কিত শব্দ হলো-

i. ডেভিড কার্ড

ii. ক্রেডিট কার্ড
iii. আইডেন্টিটি কার্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকগুলো পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

১। আসিফ আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ পায়। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে আমেরিকাতে যাওয়া সম্ভব হয়নি। অতঃপর বাংলাদেশে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করল। আসিফ পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে অনলাইনে কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। ফলে তার পারিবারিক অবস্থার উন্নতি হয়।তার বন্ধু মনির নতুন জাতের টমেটো চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

ক. ই-মেইল কী? ১
খ. নিম্ন তাপমাত্রার চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. আসিফের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন কিভাবে সম্ভব হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ.উদ্দীপকের আলোকে আসিফ ও মনির এর আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণ বিশ্লেষণপূর্বক আপনার মতামত দিন। ৪

২। আবদুর রহমান গ্রাম থেকে ঢাকা আসে। সেখানে তার বন্ধু করিম তাকে নিয়ে "ক" স্থানে যায়। সেখানে প্রবেশের জন্য হাতের আঙ্গুল ব্যবহৃত হয়। এর পর তারা "খ" স্থানে গিয়ে দেখলো, সেখানে প্রবেশের জন্য চোখ ব্যবহৃত হয়। অত:পর তারা "গ" স্থানে গিয়ে বিশেষ ধারণের হেলমেট ও চশমা পরে অনেকক্ষণ মজা করে ড্রাইভিং করে।

ক. তথ্য প্রযুক্তি কী? ১
খ. তথ্য প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতায় ডায়াবেটিস রোগিরা উপকৃত হচ্ছে -ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে 'গ' স্থানে ব্যবহৃত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে কোন প্রযুক্তি অধিকতর ব্যবহৃত হচ্ছে- বিশ্লেষণপূর্বক আপনার মতামত দিন? ৪

উত্তরমালা : পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠ - ২.১ ১ খ ২ ক
পাঠ - ২.২ ১ গ ২ ঘ
পাঠ - ২.৩ ১ গ ২ খ
পাঠ - ২.৪ ১ গ ২ ক
পাঠ - ২.৫ ১ খ ২ গ
পাঠ - ২.৬ ১ গ ২ গ
পাঠ - ২.৭ ১ ঘ ২ ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ গ ২ ক ৩ খ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ গ ২ ঘ

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ খ ২ ক

কমিউনিকেশন সিস্টেম

ইউনিট ৩

ভূমিকা

তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়াকে কমিউনিকেশন বলে। প্রাচীন কাল থেকে মানুষ একজন আরেকজনের সাথে ভাবনা, ধারণা, প্রয়োজন ইত্যাদি আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে আসছে। দূরবর্তী অবস্থানের সাথে কিভাবে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়, কিভাবে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়, এ সকল বিষয় গবেষণার ফলে উদ্ভাবন হয়েছে কমিউনিকেশন সিস্টেম। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে কমিউনিকেশন সিস্টেমের পরিবর্তন হয়েছে। মূহুর্তের মধ্যে আমরা অনেক কিছু যেমন-ছবি, কথা, মেসেজ আদান-প্রদান করতে পারি।

ইলেক্ট্রনিক কমিউনিকেশনের উদ্ভাবন মানুষের কমিউনিকেশনকে করেছে অনেক উন্নত। রেডিও, টেলিভিশন, ফ্যাক্স, স্যাটেলাইটের ব্যবহার কমিউনিকেশন সিস্টেমের উৎকর্ষতা বাড়িয়েছে বহুগুণ। তারযুক্ত ও তারহীন মাধ্যমে অতিদ্রুত ডাটা আদান-প্রদান করা যায়। এ ইউনিটে আপনারা কমিউনিকেশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে পারবেন। ডাটা ট্রান্সমিশনের বিভিন্ন পদ্ধতি, মেথড কি ও কিভাবে কাজ করে সেগুলোর বর্ণনা জানতে পারবেন। আধুনিক কমিউনিকেশন সিস্টেমের বিভিন্ন মাধ্যম, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তি যেমন- ব্লু-টুথ, ওয়াইফাই, ওয়াই ম্যাক্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৩.১ : কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা ও বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম

পাঠ - ৩.২ : ডাটা কমিউনিকেশনের ধারণা, ডাটা কমিউনিকেশন এর উপাদান ও ব্যান্ডউইডথ

পাঠ - ৩.৩ : ডাটা ট্রান্সমিশনের মেথড এবং মোড

পাঠ - ৩.৪ : ডাটা কমিউনিকেশন এর মাধ্যম এবং প্রকারভেদ

পাঠ - ৩.৫ : তার মাধ্যম

পাঠ - ৩.৬ : তারহীন মাধ্যম

পাঠ - ৩.৭ : ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম

পাঠ - ৩.৮ : ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তির উদাহরণ : ব্লু-টুথ, ওয়াইফাই ও ওয়াই ম্যাক্স

পাঠ - ৩.৯ : সেলুলার বা মোবাইল ফোন প্রযুক্তি

পাঠ - ৩.১০ : বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোন

পাঠ - ৩.১১ : মোবাইল ইন্টারনেট

পাঠ-৩.১ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা ও বিভিন্ন ধরণের কমিউনিকেশন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কমিউনিকেশন সিস্টেম এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- কমিউনিকেশন সিস্টেম সম্পর্কে সার্বিক ধারণা পাবেন।
- বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কমিউনিকেশন সিস্টেম, টেলিকমিউনিকেশন, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন।

৩.১.০ কমিউনিকেশন সিস্টেম

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে কমিউনিকেশন সিস্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিকেশন সিস্টেমের ফলে গোটা বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে গেছে। মানুষ আজ নিজের অবস্থান থেকে কমিউনিকেশন সিস্টেমের ফলে প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর সকল স্থানে তথ্য আদান প্রদান করতে পারছে। বর্তমান কমিউনিকেশন সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে একাধারে যেমন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে তেমনি কার্য সম্পাদনের গতিও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

৩.১.১ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ধারণা

প্রাচীন কাল থেকে মানুষ একজন আরেকজনের সাথে ভাবনা, ধারণা, প্রয়োজন ইত্যাদি আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে আসছে। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত উন্নত কমিউনিকেশন সিস্টেম সহজ করেছে দূরবর্তী অবস্থানের সাথে দ্রুত ও নির্ভুল তথ্যের আদান-প্রদান।

ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সরকার, উপাসনালয় ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে যোগাযোগ অতি গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ ব্যতিরেকে কোনভাবেই কেউ নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যোগাযোগ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ হলো দুই বা বহু পক্ষের মধ্যে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান যা পক্ষসমূহের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বোধগম্যতার সৃষ্টি করে। যোগাযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রয়োজনীয় তথ্য ও মনের ভাব একজন থেকে অন্য জনে; এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে; প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিতে; ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে; সরকার থেকে ব্যক্তিতে এবং প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থাই অতীতকে বর্তমানের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদেরকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি আমাদের গতিকে করেছে সমৃদ্ধ।

দুইটি পক্ষের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয় তাকে কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে। কমিউনিকেশন সিস্টেমে তথ্য আদান প্রদানের জন্য নিচের কাজ গুলো করতে হয়-

১. তথ্য আদান প্রদান ব্যবস্থাপনা করা।
২. তথ্যের উৎস , গন্তব্য নির্ধারণ করা।
৩. ডাটার নিরাপত্তা প্রদান।
৪. হারানো তথ্য পুনরুদ্ধার।
৫. সম্পূর্ন সিস্টেমের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাপনা করা।

৩.১.২ বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম

পৃথিবীতে অনেক ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেম রয়েছে। যেমন-

- **বায়োলজিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম ঃ** শরীরের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বায়োলজিক্যাল

কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে। যেমন- মস্তিষ্ক, স্বরযন্ত্র, কান, হাত ইত্যাদি অঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ করা হয়।

- **গ্রাফিক কমিউনিকেশন সিস্টেমঃ** গ্রাফিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে সকল ধরনের যোগাযোগ ছবি ও চিহ্নের মাধ্যমে ভিজুয়ালী প্রেরণ ও গ্রহণ করা হয়।
- **টেলিকমিউনিকেশনঃ** দূরবর্তী স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা। দূরবর্তী যোগাযোগের জন্য টেলিফোন ব্যবহার করার মাধ্যমে যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে টেলিকমিউনিকেশন বলে। যেমন- মোবাইল ফোনে দুই জনের মধ্যে কথোপকথোন।
- **ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনঃ** বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হয় বা যে যোগাযোগ গড়ে উঠে তাকে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন বলে। ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের জন্য অনেক মিডিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন- রেডিও, টেলিভিশন, ফাইবার অপটিকস, ফ্যাক্স, স্যাটেলাইট ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তার ওপর আপনার মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

দুইটি পক্ষের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করে তাকে কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে কমিউনিকেশন সিস্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন কাল থেকে মানুষ একজন আরেকজনের সাথে ভাবনা, ধারনা, প্রয়োজন ইত্যাদি আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে আসছে। দূরবর্তী অবস্থানের সাথে কিভাবে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়, কিভাবে দ্রুত ও নির্ভুলভাবে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়, এ সকল বিষয় গবেষণার ফলে উদ্ভাবন হয়েছে কমিউনিকেশন সিস্টেম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গ্রাফিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে সকল ধরনের কমিউনিকেশন কিসের মাধ্যমে হয়ে থাকে?

ক) ছবি খ) রেডিও
গ) মস্তিষ্ক ঘ) কোনটিই নয়

২। ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনের মিডিয়া কোনটি?

ক) রেডিও খ) টেলিভিশন
গ) ফাইবার অপটিকস ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৩.২ ডাটা কমিউনিকেশন এর ধারণা, ডাটা কমিউনিকেশন এর উপাদান ও ব্যান্ডউইডথ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ডাটা কমিউনিকেশন সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- ডাটা কমিউনিকেশনের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- ব্যান্ডউইডথ এবং এর শ্রেণী বিন্যাস করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডাটা কমিউনিকেশন, মাধ্যম, ব্যান্ডউইডথ।

৩.২.১ ডাটা কমিউনিকেশনের ধারণা

এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে অথবা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ডাটার আদান প্রদান বা তথ্যবিনিময়কে ডাটা কমিউনিকেশন বা ডাটা স্থানান্তর বলা হয়। ১৯৬০ সালে সর্বপ্রথম একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার ও দূরবর্তী টার্মিনালের মধ্যে ডাটা স্থানান্তর প্রক্রিয়ার প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীতে টার্মিনালের পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার করার মাধ্যমেই শুরু হয় ডাটা স্থানান্তরের প্রচলন।

ডাটা কমিউনিকেশনের উপাদান

ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে মূলত ৬ টি উপাদান থাকে। যথা-

১। ডাটা বা তথ্য (Information) ২। ডাটার উৎস (Source) ৩। প্রেরক (Sender)
৪। মাধ্যম (Medium) ৫। প্রাপক (Receiver) ও ৬। গন্তব্য (Destination)

ডাটা ঃ ডাটা কমিউনিকেশনের প্রথম উপাদান হচ্ছে ডাটা বা তথ্য। কমিউনিকেশনের জন্য ডাটা হতে পারে শব্দ, অক্ষর, সংখ্যা, ছবি ইত্যাদি।

ডাটার উৎস ঃ যে ডিভাইস থেকে ডাটা সংগ্রহ করা হয় তাকে উৎস বলা হয়। উৎস ডাটা বা তথ্য তৈরি করে। ডাটার উৎসের উদাহরণ হলো কম্পিউটার, টেলিফোন।

প্রেরক ঃ প্রেরক 'উৎস' হতে ডাটা নিয়ে কমিউনিকেশনের বাহককে বা মাধ্যমকে পাঠায়। প্রেরক নির্দিষ্ট একটি যন্ত্র ব্যবহার করে ডাটাকে ট্রান্সফরম এবং এনকোড করে প্রেরণ উপযোগী সিগন্যাল তৈরী করে। যেমন-মডেম।

মাধ্যম ঃ যার মাধ্যমে ডাটাসমূহ একস্থান থেকে অন্যস্থানে অথবা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে স্থানান্তর করা হয় তাকে ডাটা প্রবাহের বাহক বা মাধ্যম বলা হয়। যেমন– ক্যাবল, মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইট, অপটিক্যাল ফাইবার, টেলিফোন লাইন, মডেম ইত্যাদি।

প্রাপক ঃ যে ডিভাইস ডাটা কমিউনিকেশন মাধ্যম থেকে ডাটা গ্রহণ করে তাকে প্রাপক বলে।

গন্তব্য ঃ উপাত্তের উৎস বা প্রেরক ডাটা কমিউনিকেশন মাধ্যম ব্যবহার করে যার নিকট বা যে ডিভাইস ডাটা গ্রহণ করে তাকে উপাত্তের গন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন- কম্পিউটার, সার্ভার।

৩.২.২ ব্যান্ডউইডথ

এক স্থান হতে অন্য স্থানে অথবা এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারে ডাটা স্থানাান্তরের হারকে ডাটা ট্রান্সমিশন স্পীড বলে। এই ট্রান্সমিশন স্পীডকে অনেক সময় ব্যান্ডউইডথও বলা হয়। এই ব্যান্ডউইডথ সাধারণত Bit Per Second (bps) এ হিসাব করা হয়। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিট ট্রান্সমিট করা হয় তাকে bps বা ব্যান্ডউইডথ বলে। এই ডাটা ট্রান্সফার গতির উপর ভিত্তি করে ব্যান্ডউইডথকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১। ন্যারো ব্যান্ড (Narrow Band)
২। ভয়েস ব্যান্ড (Voice Band) ও
৩। ব্রড ব্যান্ড (Broad Band)

ন্যারো ব্যান্ড: ন্যারো ব্যান্ড সাধারণত 45 থেকে 300 bps পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ ডাটা স্থানান্তর গতিকে ন্যারো ব্যান্ড বা Sub Voice Band বলে। ধীর গতি ডাটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এই ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়। যেমন- টেলিগ্রাফিতে উক্ত ব্যান্ডকে ব্যবহার করা হয়।

ভয়েস ব্যান্ড: এই ব্যান্ডের ডাটা গতি 9600 bps পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি সাধারণত টেলিফোনে বেশি ব্যবহার করা হয়। তবে কম্পিউটার ডাটা কমিউনিকেশনে কম্পিউটার থেকে প্রিন্টারে ডাটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কিংবা কার্ড রিডার থেকে কম্পিউটারে ডাটা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে এই ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করা হয়।

ব্রড ব্যান্ড: ব্রড ব্যান্ড উচ্চগতি সম্পন্ন ডাটা স্থানান্তর ব্যান্ডউইড্থ যার গতি কমপক্ষে এক মেগা বিট পার সেকেন্ড Mbps হতে অত্যন্ত উচ্চ গতি পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণত কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ও অপটিক্যাল ফাইবারে ডাটা স্থানান্তরে ব্রড ব্যান্ড ডাটা ট্রান্সমিশন ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এবং মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশনেও এই ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিলয় সাইবার ক্যাফে ব্যবসার জন্য একটি বহুতল ভবনে স্থাপিত অফিসের কম্পিউটারসমূহ ক্যাবলের মাধ্যমে সংযুক্ত করেন যার গতি 1200 bps । এখানে কোন ধরনের ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার করা হয়েছে? আপনার বিস্তারিত মতামত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ডাটাকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে অথবা এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে স্থানান্তর প্রক্রিয়াই হলো ডাটা কমিউনিকেশন। এই ডাটা কমিউনিকেশনের স্পীডকেই বলা হয় ব্যান্ডউইডথ যা সাধারণত bps এ হিসাব করা হয়। ব্যান্ডউইডথ ন্যারো ব্যান্ড, ভয়েস ব্যান্ড ও ব্রড ব্যান্ড এই তিন ধরনের হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেমে মূলত কতটি উপাদান থাকে?

ক) ৪ টি খ) ৫ টি
গ) ৬ টি ঘ) ৭ টি

২। কমিউনিকেশনের জন্য ডাটা কোনটি?

ক) শব্দ খ) সংখ্যা
গ) অক্ষর ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৩.৩ ডাটা ট্রান্সমিশন মেথড এবং মোড

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ডাটা ট্রান্সমিশনের মেথড কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার ডাটা ট্রান্সমিশন মেথডের তুলনা করতে পারবেন।
- ডাটা ট্রান্সমিশন মোড কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার ডাটা ট্রান্সমিশন মোডের বর্ণনা ও তুলনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন, সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন, ডাটা ট্রান্সমিশন মোড।

৩.৩.১ ডাটা ট্রান্সমিশন মেথড

প্রেরক কম্পিউটার থেকে গ্রাহক কম্পিউটারে লাইন ইন্টারফেসের উপর ভিত্তি করে সিরিয়াল ও প্যারালাল এই দুই পদ্ধতিতে ডাটা ট্রান্সমিশন হয়ে থাকে। এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডাটা ট্রান্সমিশন হওয়ার সময় অবশ্যই দুই কম্পিউটারের মধ্যে এমন একটি সমঝোতা থাকা দরকার যাতে সিগন্যাল বিটের শুরু ও শেষ বুঝতে পারে। বিটের শুরু ও শেষ বুঝতে না পারলে গ্রহণকারী কম্পিউটার সেই সিগন্যাল থেকে ডাটা পুনরুদ্ধার করতে পারে না। এই সিগন্যাল পাঠানোর সময় বিভিন্ন বিটের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিকে বলা হয় বিট সিনক্রোনাইজেশন। সিনক্রোনাইজেশনের উপর ভিত্তি করে ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Asynchronous Transmission) ও
২। সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন (Synchronous Transmission)

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন

এ পদ্ধতিতে প্রেরক হতে গ্রাহকে একটি একটি করে ক্যারেক্টার পাঠানো হয়। এ ধরনের ট্রান্সমিশনে যে কোন সময় ডাটা প্রেরণ ও গ্রহণ সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রতিটি ক্যারেক্টারের সাথে একটি স্টার্ট বিট ও একটি স্টপ বিট পাঠানো হয়। প্রতিটি ক্যারেক্টার পাঠানোর মাঝখানে সময়ের ব্যবধান সমান হয় না।

সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন

এ পদ্ধতিতে প্রথমে ডাটাকে একটি প্রাইমারী স্টোরেজ ডিভাইসে সংরক্ষণ করে অনেকগুলো ব্লক বা গ্রুপ করে পাঠানো হয়। প্রেরক হতে গ্রাহকে অনেকগুলো বর্ণ দ্বারা গঠিত ব্লক আকারে ডাটা পাঠানো হয়। সাধারণত একটি ব্লকে 80 হতে 132 টি বর্ণ থাকে। দু'টি ব্লকের মাঝখানে সময় বিরতি সমান হয়ে থাকে এবং প্রতিটি ব্লক ডাটার শুরুতে একটি হেডার (Header) ইনফরমেশন এবং শেষে একটি টেইলার (Tailer) ইনফরমেশন পাঠানো হয়।

অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন	সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন
১। যে ট্রান্সমিশন সিস্টেম ক্যারেক্টার বাই-ক্যারেক্টার-ডাটা ট্রান্সমিট করে তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন সিস্টেম বলে।	১। যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে ডাটা প্যাকেট বা ব্লক আকারে ট্রান্সমিট করে তাকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন সিস্টেম বলে।
২। প্রেরক স্টেশনের প্রাইমারি স্টোরেজের প্রয়োজন হয় না।	২। প্রেরক স্টেশনে একটি প্রাইমারি স্টোরেজ ডিভাইসের প্রয়োজন হয়।
৩। এখানে ক্যারেক্টারের মাঝে টাইম ইন্টারভেল বা বিরতি সমান হয় না।	৩। এখানে ক্যারেক্টারের মাঝে টাইম ইন্টারভেল বা বিরতি সমান হয়ে থাকে।

৪। ট্রান্সমিশনের দক্ষতা তুলনামূলক কম।	৪। ট্রান্সমিশনের দক্ষতা তুলনামূলক বেশি।
৫। ট্রান্সমিশনের গতি কম।	৫। ট্রান্সমিশনের গতি অনেক বেশি।
৬। এই ট্রান্সমিশনে স্টার্ট বিট বা স্টপ বিট এর প্রয়োজন হয়।	৬। স্টার্ট বিট এবং স্টপ বিট এর প্রয়োজন হয় না।

৩.৩.২ ডাটা ট্রান্সমিশন মোড

ডাটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থায় উৎস থেকে গন্তব্যে ডাটা পাঠানো হয়। উৎস থেকে গন্তব্যে ডাটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডাটা প্রবাহের দিককে বিবেচনা করে ডাটা পাঠানোর পদ্ধতিকে ডাটা ট্রান্সমিশন মোড বলা হয়। ডাটা প্রবাহের দিকের উপর ভিত্তি করে ডাটা ট্রান্সমিশন মোডকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-

১। সিমপ্লেক্স (Simplex)
২। হাফ-ডুপ্লেক্স (Half-Duplex) ও
৩। ফুল-ডুপ্লেক্স (Full-Duplex)

সিমপ্লেক্স: শুধুমাত্র একদিকে ডাটা প্রেরণের মোড বা পদ্ধতিকে বলা হয় সিমপ্লেক্স। এক্ষেত্রে গ্রাহক যন্ত্রটি কখনোই প্রেরক যন্ত্রটিতে ডাটা পাঠাতে পারে না। যেমন- চিত্রে কেবলমাত্র A হতে B এর দিকে ডাটা প্রেরণ করা যাবে। কিন্তু B হতে A এর দিক ডাটা প্রেরণ সম্ভব নয়। উদাহরণ- রেডিও, টিভি।

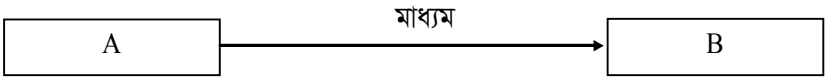

চিত্র ৩.৩.১ : সিমপ্লেক্স

হাফ-ডুপ্লেক্স: হাফ-ডুপ্লেক্স পদ্ধতিতে যে কোন প্রান্ত ডাটা গ্রহণ অথবা প্রেরণ করতে পারে কিন্তু গ্রহণ এবং প্রেরণ একই সাথে করতে পারে না। নিম্নের চিত্রে হাফ-ডুপ্লেক্স ব্যবস্থায় A যখন ডাটা প্রেরণ করবে B তখন ডাটা গ্রহণ করতে পারবে, প্রেরণ করতে পারবে না। A এর প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে B ডাটা প্রেরণ করতে পারবে। অনুরূপভাবে B এর প্রেরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন A শুরু ডাটা গ্রহণ করতে পারবে। উদাহরণ-ওয়াকিটকি।

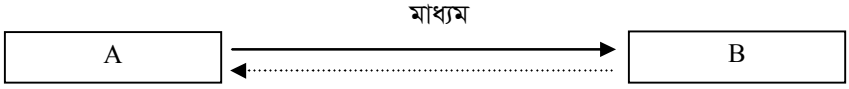

চিত্র ৩.৩.২ : হাফ-ডুপ্লেক্স

ফুল-ডুপ্লেক্স: এক্ষেত্রে একই সময়ে উভয় দিক হতে ডাটা প্ররণের ব্যবস্থা থাকে। যে কোন প্রান্ত প্রয়োজনে ডাটা প্রেরণ করার সময় ডাটা গ্রহণ অথবা ডাটা গ্রহণের সময় প্রেরণও করতে পারবে। চিত্রে ফুল-ডুপ্লেক্সের ক্ষেত্রে, A যখন B এর দিকে ডাটা প্রেরণ করবে B ও তখন A এর দিকে ডাটা প্রেরণ কতে পারবে। উদাহরণ- টেলিফোন, মোবাইল।

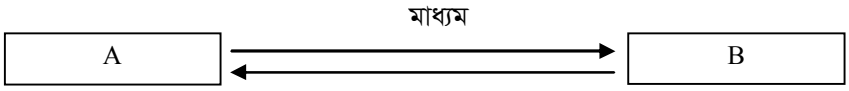

চিত্র ৩.৩.৩ : ফুল-ডুপ্লেক্স

ডাটা কমিউনিকেশন ব্যবস্থায় প্রেরক থেকে প্রাপকের কাছে ডাটা পাঠানো হয়। প্রাপকের সংখ্যা ও ডাটা গ্রহণের অধিকারের উপর ভিত্তি করে ডাটা ট্রান্সমিশন মোডকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-

১। ইউনিকাস্ট (Unicast)
২। ব্রডকাস্ট (Broadcast) ও
৩। মাল্টিকাস্ট (Multicast)

ইউনিকাস্ট: এ পদ্ধতিতে একটি প্রেরক থেকে শুধুমাত্র একটি প্রাপকই ডাটা গ্রহণ করতে পারে। অনেক প্রাপক একসাথে ডাটা গ্রহণ করতে পারে না। এজন্য সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স ও ফুল-ডুপ্লেক্স মোডকে ইউনিকাস্ট মোডও বলা হয়।

ব্রডকাস্ট: ব্রডকাস্ট মোডে কোন একটি যন্ত্র (কম্পিউটার, বা অন্য কোন যন্ত্রপাতি) থেকে ডাটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনস্থ সকল যন্ত্র গ্রহণ করতে পারে। যেমন টিভি সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে কোন মুভি সম্প্রচার করলে তা সকলেই গ্রহণ করে উপভোগ কতে পারে। পাশের চিত্রে A নোড থেকে কোন ডাটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনস্থ সকল নোডই (B, C, D ও E কম্পিউটার) গ্রহণ করবে।

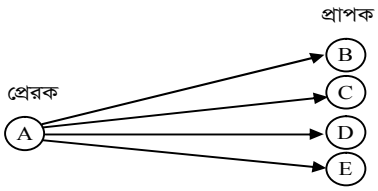

চিত্র ৩.৩.৪ : ব্রডকাস্ট

মাল্টিকাস্ট (Multicast) : মাল্টিকাস্ট মোড ব্রডকাস্ট মোডের মতই তবে পার্থক্য হলো মাল্টিকাস্ট মোডে নেটওয়ার্কের একটি নোড থেকে ডাটা প্রেরণ করলে তা নেওয়ার্কের অধীনস্ত সকল নোডই গ্রহণ করতে পারে না। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একটি গ্রুপের সকল সদস্য গ্রহণ করতে পারে। যেমন– ভিডিও কনফারেসিংয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যাদের অনুমতি থাকবে তারাই অংশগ্রহণ করতে পারবে।

পাশের চিত্রে A প্রেরক নোড থেকে কোন ডাটা প্রেরণ করলে তা নেটওয়ার্কের অধীনস্থ B, D ও E নোড গ্রহণ করবে। C নোড ডাটা গ্রহণ করতে পারবে না কারণ C নোড আলোচ্য ভিডিও কনফারেন্সি গ্রুপের সদস্য নয়।

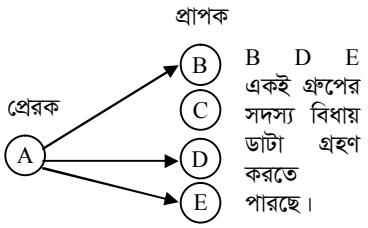

চিত্র ৩.৩.৫ : মাল্টিকাস্ট মোড

শিক্ষার্থীর কাজ	অহনার অফিসের অভ্যন্তরে কোন রকম স্টোরেজ ব্যবহার না করেই ডাটা ট্রান্সমিট করে। অহনার ব্যবহৃত ট্রান্সমিশন সিস্টেম কোন ধরনের হতে পারে? আপনার মতামত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে ক্যারেক্টার-বাই-ক্যারেক্টার ডাটা ট্রান্সমিট করে তাকে অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন সিস্টেম বলে। অ্যাসিনক্রোনাস ট্রান্সমিশনে ইনস্টলেশন খরচ অত্যন্ত কম। আর যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে ডাটা প্যাকেট বা ব্লক আকারে ট্রান্সমিট করে তাকে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন সিস্টেম বলে। এক স্থান থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানে ডেটা স্থানান্তরে সিনক্রোনাস ট্রান্সমিশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। অবশ্য উৎস থেকে গন্তব্যে ডাটা ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ডাটা প্রবাহের দিককে বিবেচনা করে ডাটা পাঠানোর পদ্ধতিকে ডাটা ট্রান্সমিশন মোড বলা হয়। সিমপ্লেক্স, হাফ-ডুপ্লেক্স ও ফুল-ডুপ্লেক্স এই তিনটি ভাগই হলো ডাটা ট্রান্সমিশন মোড।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সিনক্রোনাইজেশনের উপর ভিত্তি করে ডাটা ট্রান্সমিশন পদ্ধতি কয় ধরনের?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

২। একই সময়ে উভয় দিক হতে ডাটা প্ররণের ব্যবস্থা থাকে কোন পদ্ধতিতে?

ক) সিমপ্লেক্স খ) হাফ-ডুপ্লেক্স
গ) ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৩.৪ ডাটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম এবং প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ডাটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- তারযুক্ত ও তারহীন মাধ্যম সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ট্রান্সমিশন মিডিয়া , তার মাধ্যম, তারহীন মাধ্যম।

৩.৪.১ ডাটা কমিউনিকেশন মাধ্যম

কম্পিউটার এবং অন্যান্য আইসিটি ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডাটা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সিগন্যাল ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সিগন্যাল ডাটাকে উপস্থাপন করে থাকে। এই সিগন্যালকে এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে পাঠানোর জন্য ট্রান্সমিশন মিডিয়া দরকার হয়।

প্রেরক এবং দূরবর্তী প্রাপকের মধ্যে ডাটা আদান-প্রদানের জন্য প্রয়োজন উভয় প্রান্তের মধ্যে সংযোগ। এই সংযোগ ব্যবস্থাকে বলা হয় মাধ্যম। অন্যকথায়, যে মাধ্যমে কোন একটি নেটওয়ার্কের সকল ডিভাইস পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে তাকে ডাটা ট্রান্সমিশন মিডিয়া বা মাধ্যম বলে। ট্রান্সমিশন মিডিয়া দুই ধরনের। যথা-

১। তার মাধ্যম (Guided/Wired Media) ও

২। তারবিহীন মাধ্যম (Unguided/Wireless Media)

তার মাধ্যম

ডাটা কমিউনিকেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল তার মাধ্যম। ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরী এই মাধ্যম ডাটাকে গাইড করে প্রেরক যন্ত্র থেকে গ্রাহক যন্ত্রে নিয়ে যায় বলে এ মাধ্যমকে গাইডেড মাধ্যম বলা হয়। তার মাধ্যম মিডিয়াকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-

১। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল

২। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ও

৩। অপটিকাল ফাইবার

তারহীন মাধ্যম

ওয়্যারলেস কথাটির অর্থ তার বিহীন বা তারহীন। তার বিহীন যোগাযোগ বা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন হলো এমন ধরণের যোগাযোগ যেখানে কোন তার বা ক্যাবলের প্রয়োজন হয় না। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে সাধারণত রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করা হয়। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের মিডিয়াকে কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। রেডিও ওয়েভ (Radio wave)

২। মাইক্রো ওয়েভ (Micro wave) ও

৩। ইনফ্রারেড (Infrared)

	শিক্ষার্থীর কাজ	তার মাধ্যম ও তারহীন মাধ্যমের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

প্রেরণ প্রান্ত এবং দূরবর্তী গ্রহণ প্রান্তের মধ্যে ডাটা আদান প্রদানের জন্য প্রয়োজন উভয় প্রান্তের মধ্যে সংযোগ। এই সংযোগকে সাধারণত চ্যানেল বলা হয়। চ্যানেল বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি বা মাধ্যম ব্যবহার করা হয় তাকে ডাটা কমিউনিকেশন মাধ্যম বা মিডিয়া বলা হয়। যেমন- ক্যাবল বা তার, সাধারণ টেলিফোন লাইন, বেতার তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। তার মাধ্যম কোনটি?

ক) রেডিও ওয়েভ
খ) মাইক্রো ওয়েভ
গ) অপটিকাল ফাইবার
ঘ) কোনটিই নয়

২। ট্রান্সমিশন মিডিয়া কয় ধরনের?

ক) ২
খ) ৩
গ) ৪
ঘ) ৫

পাঠ-৩.৫ তার মাধ্যম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- টুইস্টেড পেয়ার কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কো-এক্সিয়াল ক্যাবল কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কো-এক্সিয়াল ক্যাবল এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফাইবার অপটিক ক্যাবল কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	তার মাধ্যম, টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, ফাইবার অপটিক।

৩.৫.১ তার মাধ্যম

ডাটা কমিউনিকেশনে ক্যাবল বা তার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তার মাধ্যমকে গাইডেড মিডিয়াও বলা হয়। ডাটা কমিউনিকেশনে তিন ধরনের ক্যাবল ব্যবহৃত হয়:

১। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল (Twisted pair cable)
২। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল (Coaxial cable) ও
৩। ফাইবার অপটিক ক্যাবল (Fiber optic cable)

৩.৫.২ টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল

দুটি পরিবাহী তামার তারকে পরস্পর সুষমভাবে পেঁচিয়ে টুইস্টেড পেয়ার তৈরি করা হয়। পেঁচানো পরিবাহী তার দুটিকে পৃথক রাখার জন্য অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ ধরনের ক্যাবলে সাধারণত ৪ জোড়া তার ব্যবহৃত হয়। প্রতি জোড়া তারের মধ্যে একটি কমন রংয়ের (সাদা) তার থাকে। অপর তারগুলো হয় ভিন্ন রংয়ের। তার সমূহ সংযোজনের সময় 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 নম্বরের ভিত্তিতে সংযোগ দিতে হয়। জোড়ার তার দুটির এক একটির পুরুত্ব হয় 0.4 মিঃ মিঃ থেকে 0.9 মিঃ মিঃ।

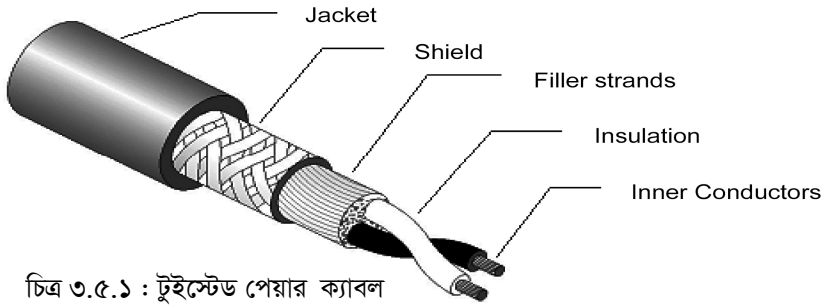

চিত্র ৩.৫.১ : টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল

টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল দুই প্রকার। যথা-

১। **ইউটিপি (UTP-Unshielded Twisted pair) ঃ** ইউটিপি ক্যাবল মূলত একাধিক জোড়া টুইস্টেড পেয়ার সমষ্টি যা প্লাস্টিক আবরনে মোড়ানো থাকে। তারের মধ্য দিয়ে যখন সিগন্যাল অতিক্রম করতে থাকে তখন এর শক্তি বা মান ক্রমান্বয়ে লোপ পেতে থাকে।

২। **এসটিপি (STP-Shield Twisted pair) ঃ** এসটিপি ক্যাবলের বাইরে জ্যাকেট বা ফেসিং থাকে এবং তারের মধ্যে একটি শিল্ড (Shield) বা শক্ত আবরণ থাকে।

৩.৫.৩ কো-এক্সিয়াল ক্যাবল

কো-এক্সিয়াল ক্যাবল দুটি সুপরিবাহী বা কন্ডাক্টর (Conductor) ও অপরিবাহী বা পরাবৈদ্যুতিক পদার্থের সাহায্যে তৈরি করা হয়। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল সাধারণত কোএক্স (Co-ax) নামে পরিচিত। কো-এক্স ক্যাবলের কেন্দ্র দিয়ে অতিক্রম করে একটি সলিড (Solid) কপার তার। কেন্দ্রের পরিবাহী তার আচ্ছাদিত করার জন্য ও বাইরের পরিবাহী থেকে পৃথক রাখার জন্য এদের মাঝখানে অপরিবাহী পদার্থ থাকে। বাইরের পরিবাহককে প্লাস্টিক জ্যাকেট দ্বারা ঢেকে রাখা হয়।



চিত্র ৩.৫.২ : কো-এক্সিয়াল ক্যাবল

এ ধরনের ক্যাবলের ডাটা স্থানান্তরের গতি বেশি হয়। তবে ডাটা ট্রান্সফার রেট নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের উপর। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ব্যবহার করে এক কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বে ডিজিটাল ডাটা প্রেরণ করা যায়।

৩.৫.৪ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল বা ফাইবার অপটিক ক্যাবল

অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ফাইবার আলোক পরিবাহী। অপটিক ক্যাবল হচ্ছে ড্রাই-ইলেকট্রিক (Dry Electronic) অন্তরক পদার্থ দিয়ে তৈরি এক ধরনের আঁশ যা আলো নিবন্ধিকরণ ও পরিবহনে সক্ষম। এই ধরনের ক্যাবলের মধ্যে দিয়ে ডাটা আদান-প্রদান করা হয় আলোর গতিতে এবং আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের গঠন

অপটিক্যাল ফাইবার তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত । যথা–

১। **কোর (Core) :** সবচেয়ে ভিতরের অংশ হচ্ছে কোর যা কাঁচ বা প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি যা 100 মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আলোক সিগন্যাল সঞ্চালনের প্রধান কাজটি করে কোর।

২। **ক্ল্যাডিং (Cladding) :** কোরের ঠিক বাইরের অংশটি হচ্ছে ক্ল্যাডিং। ক্ল্যাডিং হচ্ছে কাঁচ বা প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি এক বিশেষ ধরণের আবরণ যা কোর থেকে নির্গত আলোক রশ্মি প্রতিফলিত করে তা পুনরায় কোরে ফেরত পাঠায়।

৩। **জ্যাকেট (Jacket) :** ক্ল্যাডিং-এর প্লাস্টিক এবং বিভিন্ন ধাতব পদার্থ দ্বারা তৈরি বাইরের অংশটি হচ্ছে জ্যাকেট। জ্যাকেট ফাইবারকে জলীয়বাষ্প, আর্দ্রতা, ঘর্ষণ, মচকানো এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে।

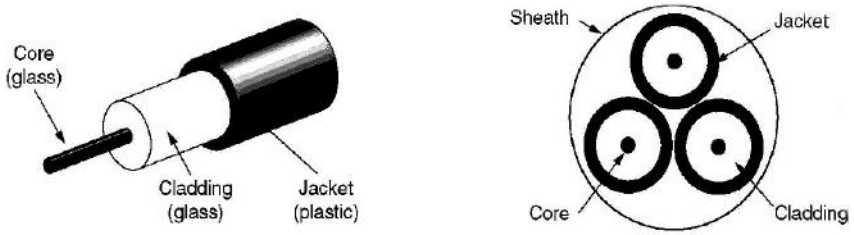

চিত্র ৩.৫.৩ : অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের গঠন

বর্তমানে যে সকল অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তার ডাটা ট্রান্সমিশন হার 100 mbps থেকে 2 Gega bps। আজকাল বিপুল পরিমাণ উপাত্ত পরিবহনে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আন্ত:মহাদেশীয় অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল ও কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

ডাটা কমিউনিকেশনে ক্যাবল বা তার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সাধারণত স্বল্প পরিসরের নেটওয়ার্কিং যেমন LAN (Local Area Network) এর মাধ্যমে ডাটা স্থানান্তরে তার মাধ্যম ব্যবহার করা হয়। তবে বৃহত্তর পরিসরে যেমন– WAN (Wide Area Network)- এর হাইস্পিড ডাটা কমিউনেকশনেও তার মাধ্যমের ব্যবহার আছে। তার মাধ্যম সাধারণত টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল, কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ও ফাইবার অপটিক ক্যাবল এই তিন ধরনের হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল কয় ধরনের?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

২। সাধারণত কো-এক্সিয়াল ক্যাবলের ডাটা ট্রান্সফারের দূরত্ব কত?

ক) ১ কি.মি খ) ২ কি.মি
গ) ৩ কি.মি ঘ) ৪ কি.মি

পাঠ-৩.৬ তারহীন মাধ্যম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রেডিও ওয়েভ এর বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাইক্রো ওয়েভ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- মাইক্রো ওয়েভ এর ধরণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	তারহীন মাধ্যম, রেডিও ওয়েভ, মাইক্রো ওয়েভ।

৩.৬.১ তারহীন মাধ্যম

ওয়্যারলেস কথাটির অর্থ তার বিহীন বা তারহীন। এই ধরনের মাধ্যম হল বায়ুমন্ডল, পানি এবং বায়ুমন্ডলের উপরের আরো অন্যান্য স্তর।তার বিহীন যোগাযোগ বা ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন হলো এমন ধরণের যোগাযোগ যেখানে কোন তার বা ক্যাবলের প্রয়োজন হয় না। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে সাধারণত রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করা হয়। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন মাধ্যমেকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। রেডিও ওয়েভ (Radio wave)
২। মাইক্রো ওয়েভ (Micro wave) ও
৩। ইনফ্রারেড (Infrared)

৩.৬.২ রেডিও ওয়েভ বা বেতার তরঙ্গ

10 কিলোহার্টজ থেকে 1 গিগাহার্টজের মধ্যে সীমিত ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে বলা হয় রেডিও ওয়েভ। রেডিও ওয়েভ সহজে তৈরি করা যায় যা অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে এবং বিল্ডিংকেও ভেদ করতে পারে। এ কারণে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘরে ও বাইরে ব্যাপকভাবে রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করা হয়। এই যোগযোগ ব্যবস্থায় সংকেত প্রেরণের গতিবেগ প্রায় 24 kbps।

রেডিওতে যেমন বেতার তরঙ্গ দ্বারা সংকেত পাঠানো হয়, দু'টি কম্পিউটারের মধ্যেও তেমন বেতার তরঙ্গ দ্বারা যোগাযোগ সম্ভব। রেডিও ওয়েভ দুই ধরণের হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত এবং অপরটি হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রিত রেডিও ওয়েভ সরকারের অনুমতি ব্যতিত কেউ ব্যবহার করতে পারে না। অপরদিকে অনিয়ন্ত্রিত রেডিও ওয়েভ সরকারের অনুমতি ছাড়াই যে কেই ব্যবহার করতে পারে।

বৈশিষ্ট্য

১। অনেক দূরুত্বে সহজে ডাটা প্রেরণ করা যায়।
২। রেডিও ওয়েভ ফ্রিকুয়েন্সির উপর নির্ভর করে।
৩। রেডিও ওয়েভ স্থাপনা ও ম্যানেজমেন্ট অনেক ব্যয়বহুল।

৩.৬.৩ মাইক্রোওয়েভ

মাইক্রোওয়েভ এক ধরনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যা সেকেন্ডে প্রায় 1 গিগা বা তার চেয়ে বেশিবার কম্পন বিশিষ্ট। মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে ডাটা স্থানান্তর অর্থাৎ কম্পিউটার প্রদত্ত ডাটা, কথা এবং ছবি ইত্যাদি অনেক দ্রুত স্থানান্তর করা সম্ভব। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেমে মূলত দুটো ট্রান্সসিভার (Transceiver) থাকে। এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট (Transmit) করে এবং অন্যটি রিসিভ (Receive) করে। মাইক্রোওয়েভ এর ফ্রিকুয়েন্সী রেঞ্জ হচ্ছে 300MHz থেকে 30GHz ।

মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলাচল করতে পারে না। প্রেরক ও গ্রাহক কম্পিউটারের মধ্যে কোন বাধা থাকলে ডাটা প্রেরণ বাধাগ্রস্থ হয়। তাই মাইক্রোওয়েভ এ্যান্টিনা বড় কোন ভবন বা টাওয়ারের ওপর বসানো হয়।


চিত্র ৩.৬.১ : মাইক্রোওয়েভ এ্যান্টিনা

মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ দু' ধরনের হতে পারে। যথা :

১। টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ (Terrestrial Microwave) ও
২। স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ (Satellite Microwave)

টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ

এ ধরনের প্রযুক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠেই ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয়। এতে মেগাহার্টজ ফ্রিকোয়েন্সী সীমার নিচের দিকে ফ্রিকোয়েন্সী ব্যবহার করা হয়। ট্রান্সমিটার ও রিসিভার মুখোমুখি বা LOS-Line of sight যোগাযোগ করে থাকে এবং সিগন্যাল কোন ক্রমেই মধ্যবর্তী কোন বাধা (যেমন উচ্চ ভবন, পাহাড় ইত্যাদি) অতিক্রম করতে পারে না বা বক্রপথে যেতে পারে না। অল্প পরিসরে ডাটা পাঠানোর ক্ষেত্রে এই টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করা হয়।

স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ

স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনকে সংক্ষেপে ''Cosmate'' বলে। স্যাটেলাইট হল মহাকাশে একটি উপগ্রহ যার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ করা যায়। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল বা রিলে স্টেশনের মধ্য দিয়ে টিভি সম্প্রসারণ সম্ভব হলেও দূরবর্তী কোন স্থানের খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। প্রথম দিকের স্যাটেলাইটগুলো low orbit (Echo satellite, Telster communication satellite)- এ স্থাপন করা হত। এই সব পৃথিবী পরিভ্রমণে যেমন অধিক সময় নিত তেমনি পৃথিবীর কম অংশই অধিগ্রহণ করতে পারতো। এই সমস্যা দূরীকরণের জন্য ১৯৬০ এর দশকে জিওসিনক্রোনাস স্যাটেলাইট ভূপৃষ্ঠ হতে 2200 মাইল দূরে জিওসিনক্রোনাস অরবিটে স্থাপন করা হয়। এটি পৃথিবীর গতির সমান গতিতে পরিভ্রমণ করতে থাকে। প্রতিটি স্যাটেলাইটের বেসিক উপাদানগুলো হলো- প্রাপক (receiver) ও রিসিভার এ্যান্টিনা, প্রেরক (transmitter) ও ট্রান্সমিটার এ্যান্টিনা এবং এই ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রগুলো চালানোর জন্য প্রয়োজন পাওয়ার, যা সোলার (Solar) প্যানেলের মাধ্যমে জেনারেশন করা হয়ে থাকে।

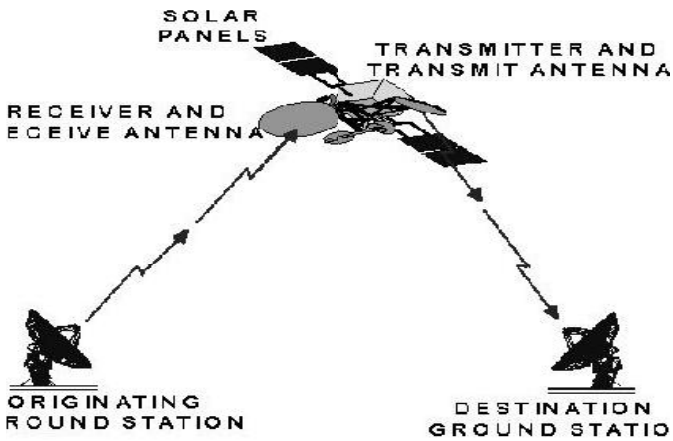

চিত্র ৩.৬.২ : Basic components of a communications satellite

মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হলো ট্রান্সমিটার ও রিসিভারের মধ্যে কোন বাধা থাকতে পারবে না। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে এই অসুবিধা দূর করা সম্ভব। কৃত্রিম উপগ্রহগুলি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 36000 কিলোমিটার উর্ধ্বে Geostationary কক্ষে থেকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে।

স্যাটেলাইটের ব্যবহার

১. টেলিভিশন সিগন্যাল পাঠানোর কাজে।
২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে।
৩. প্রতিরক্ষা বিভাগে খবরা-খবর আদান-প্রদানে।
৪. আবহাওয়ার অবস্থা পর্যবেক্ষণে।

স্যাটেলাইটের সুবিধা :

১. বিপুল পরিমান ডাটা পাঠানো যায়।
২. অনেক ধরনের সেবা যেমন- ভয়েস কল, ভিডিও কল ইত্যাদি সেবা প্রদান করা যায়।
৩. প্রতিরক্ষা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে যোগাযোগ করা যায়।

৩.৬.৪ ইনফ্রারেড

এটি এক ধরনের ওয়েভ যার ফ্রিকুয়েন্সী সীমা 300 GHz থেকে 400THz হয়ে থাকে। খুব কাছাকাছি অবস্থিত দুইটি ডিভাইসের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইনফ্রারেড ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের যোগাযোগে দুই প্রান্তে ট্রান্সমিটার ও রিসিভার থাকে। টেলিভিশন, ভিসিআর এ ব্যবহৃত রিমোট কন্ট্রোলে, বিভিন্ন ডিভাইস যেমন- কী-বোর্ড, মাউস, প্রিন্টার ইত্যাদির ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ ও টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ এর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

তারবিহীন মাধ্যম ইলেক্ট্রিক্যাল বা অপটিক্যাল কন্ডাক্টর বা তার ব্যবহার করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পৃথিবীর বায়ু মন্ডলই ডাটা সঞ্চালনের ফিজিক্যাল পথ হিসেবে কাজ করে। যখন ডাটা সঞ্চালনের পথে প্রতিবন্ধকতা থাকে এবং তারযুক্ত মাধ্যম স্থাপনে সমস্যার সৃষ্টি হয় তখন ওয়্যারলেস সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের মাধ্যম হলো বায়ুমন্ডল, পানি এবং মহাশূন্যে বায়ুমন্ডলের উপরের আরও অন্যান্য স্তর। তবে তারবিহীন মাধ্যমে এ্যান্টিনা ডাটা আদান প্রদানে বিশেষ ভূমিকা রাখে। তারবিহীন মাধ্যম রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ ও ইনফ্রারেড এই তিন ধরনের হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

২। মাইক্রোওয়েভ সিস্টেমে মূলত কতটি ট্রান্সসিভার থাকে?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

৩। Line of sight যোগাযোগ করে থাকে -

ক) টেরেস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ খ) স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ
গ) রেডিও ওয়েভ ঘ) ইনফ্রারেড

পাঠ-৩.৭ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম কি তা জানতে পারবেন।
- ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের ধরনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম।

৩.৭.১ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম (Wireless Communicatiom System)

দুই বা ততোধিক ডিভাইসের মধ্যে কোনরূপ ফিজিক্যাল কানেকশন বা ক্যাবল সংযোগ ছাড়াই ডাটা ট্রান্সফার করার পদ্ধতিকে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বলা হয়। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সংযোগকারী ডিভাইসগুলোর মধ্যকার দূরত্ব টেলিভিশন রিমোট কন্ট্রোলের ন্যায় কয়েক মিটার হতে পারে। আবার দীর্ঘ ও শক্তিশালী রেডিও কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে এই দূরত্ব কয়েক হাজার মিলিয়ন কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৩.৭.২ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের বৈশিষ্ট্য

- যে কোন স্থানের কম্পিউটার বা মোবাইল ব্যবহারকারী এবং নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়া যায়।
- যে কোন স্থান থেকে কিংবা ভ্রমণ বা চলমান অবস্থায় ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করা যায়।
- নেটওয়ার্কের মধ্যে যে কোন স্থানে ওয়ারলেস ডিভাইস সহজে বহন করা যায়।
- ক্যাবলিং করার ঝামেলা ও অতিরিক্ত খরচ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- GPS এর মাধ্যমে গাড়ি, বিমান, জাহাজ কিংবা ব্যবহারকারীর অবস্থান জানা যায়।
- পোর্টেবল বা অস্থায়ী ওয়ার্কস্টেশনের সাথে যুক্ত হওয়া যায়।
- একটি ডিভাইস অনেক ব্যবহারকারী একইসাথে শেয়ার করতে পারে।

৩.৭.৩ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের প্রয়োজনীয়তা

যে সমস্ত ক্ষেত্রে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বেশি প্রয়োজন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম নিচে দেয়া হলো-

- টিভি, ডিভিডি, এয়ারকন্ডিশনার প্রভৃতি যন্ত্রপাতির রিমোট কন্ট্রোল।
- ট্রাফিক কন্ট্রোল, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল।
- কর্ডলেস টেলিফোন, সেলুলার টেলিফোন।
- পেজার (Pager) বা বীপার (beeper), ওয়াকিটকি (Walkie-talkie)।
- স্যাটেলাইট টেলিভিশন।
- ইনফ্রারেড (Infrared-IR) ও আলট্রাসনিক রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস।
- কর্ডলেস কম্পিউটার পেরিফেরাল ডিভাইস। যেমন- ব্লুটুথ, ওয়ারলেস USB
- মেরিন VHF রেডিও।
- Global Positioning System GPS এর মাধ্যমে গাড়ি, বিমান, জাহাজ কিংবা ব্যবহারকারীর অবস্থান চিহ্নিতকরণ।

৩.৭.৪ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের ধরন

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন মূলত ৪ ধরণের। যথা-

১. ওয়্যারলেস প্যান
২. ওয়্যারলেস ল্যান
৩. ওয়্যারলেস ম্যান ও
৪. ওয়্যারলেস ওয়ান

ওয়্যারলেস প্যান (Wireless Personal Area Network-WPAN)

অপেক্ষাকৃত কম দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন আইসিটি ডিভাইসের মধ্যে তারবিহীন যোগাযোগ স্থাপন করা হলে তাকে ওয়্যারলেস পার্সোনাল এরিয়া বা **WPAN** বলে। মোবাইল ফোন, পিডিএ, ল্যাপটপ, মাউস, প্রজেক্টর ইত্যাদি ডিভাইস নিয়ে গঠিত কমিউনিকেশন ব্যবস্থাই হল ওয়্যারলেস প্যান।

ওয়্যারলেস ল্যান (Wireless Local Area Network-WLAN)

একটি নির্দিষ্ট বিল্ডিং বা স্কুলের মধ্যে অবস্থিত দুই বা ততোধিক ডিভাইসের মধ্যে স্থাপিত নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাকে ওয়্যারলেস লোকাল এরিয়া বা **WLAN** বলে। **WLAN** সংযোগের জন্য সংযোগকারী ডিভাইসের মধ্যে ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়।

ওয়্যারলেস প্যান (Wireless Metropoliton Area Network-WMAN)

সাধারণত একটি শহর এলাকার বিভিন্ন আইসিটি ডিভাইসের মধ্যে তারবিহীন যোগাযোগ স্থাপন করা হলে তাকে ওয়্যারলেস মেট্রোপলিটন এরিয়া বা **WMAN** বলে।

ওয়্যারলেস ওয়ান (Wireless Wide Area Network-WWAN)

সাধারণত অনেকগুলো শহর এলাকার বিভিন্ন আইসিটি ডিভাইসের মধ্যে তারবিহীন যোগাযোগ স্থাপন করা হলে তাকে ওয়্যারলেস ওয়াইড এরিয়া বা **WMAN** বলে। যেমন- ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

শিক্ষার্থীর কাজ	খাগড়াছড়িতে উচু-নিচু পাহাড়ের মধ্যে কোন ধরনের কমিউনিকেশন মাধ্যম ব্যবহার করা উচিত বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিত মতামত দিন?

সারসংক্ষেপ

দুই বা ততোধিক ডিভাইসের মধ্যে কোন রূপ ফিজিক্যাল কানেকশন বা ক্যাবল ছাড়াই ডাটা আদান প্রদান করার পদ্ধতিকে ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন বলা হয়। এই ধরনের সিস্টেমের সাহায্যে বিশ্বের যে কোন প্রান্তে অবস্থান করে একে অন্যের সাথে বিভিন্ন প্রকার যোগাযোগ খুব সহজেই দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। যেমন- কথা বলা,টেক্সট ম্যাসেজিং, চ্যাটিং ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন কয় ধরনের?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

২। ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন কোথায় ব্যবহার করা হয়?

ক) ট্রাফিক কন্ট্রোল, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল খ) স্যাটেলাইট টেলিভিশন
গ) ব্লুটুথ ঘ) সবগুলো

পাঠ-৩.৮ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তির উদাহরণ : ব্লু-টুথ, ওয়াই-ফাই ও ওয়াইম্যাক্স

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ব্লু-টুথ এর ধারণা এবং এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়াই-ফাই কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়াইম্যাক্স কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ব্লু-টুথ, ওয়াই-ফাই, ওয়াইম্যাক্স।

৩.৮.১ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন প্রযুক্তি

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে অনেক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। যেমন- রেডিও কমিউনিকেশন, সেলুলার নেটওয়ার্ক, ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই ইত্যাদি।

৩.৮.২ ব্লুটুথ

স্বল্প দূরত্বের ভেতর ফিক্সড ও মোবাইল ডিভাইসসমূহ থেকে তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি প্রোপ্রায়েটারি ওপেন ওয়্যারলেস প্রযুক্তি স্ট্যান্ডার্ড হলো ব্লুটুথ। এর মাধ্যমে একটি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN) সৃষ্টি হয় যেখানে উঁচু মানের নিরাপত্তা বজায় থাকে। দশম শতাব্দীর ডেনমার্কের রাজা হারাল্ড ব্লুটুথ এর নাম অনুসারে এই প্রযুক্তিটির নাম ব্লুটুথ রাখা হয়েছে। বর্তমানে মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে, কম্পিউটার, মেডিক্যাল ডিভাইস এবং বাসাবাড়ির বিনোদন ক্ষেত্রের অনেক ডিভাইসে ব্লুটুথ প্রযুক্তিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর মাধ্যমে ডিভাইসগুলোকে সংযুক্ত করতে এখন আর ক্যাবল সংযোগের প্রয়োজন পড়ছে না।

ব্লুটুথের বৈশিষ্ট্য

- কাছাকাছি দুইটি ডিভাইসের মধ্যে ডাটা স্থানান্তরে ব্লুটুথ রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে।
- ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের কোন লাইসেন্স ছাড়াই 2.4 গিগাহার্টস ফ্রিকুয়েন্সি ব্যান্ডে চলতে পারে।
- 10-100 মিটারের মধ্যে অবস্থানকারী ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে।
- ইনফ্রারেড ডাটা কমিউনিকেশনের ন্যায় দেয়াল বা অন্যকোন বাধা ডাটা ট্রান্সমিশনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না।
- কোনো পিকোনেটে (Piconet) একটি মাস্টার সর্বোচ্চ ৭টি স্লেভের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।

৩.৮.৩ ওয়াই-ফাই

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলোকে তারবিহীন উপায়ে সংযুক্ত করার একটি কৌশল হলো ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)। অন্য কথায়, ওয়াই-ফাই হলো জনপ্রিয় একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যা তারবিহীন উচ্চ গতির ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক সংযোগসমূহ সরবরাহের জন্য বেতার তরঙ্গকে ব্যবহার করে থাকে।

অনেকেই ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) কে ''wireless fidelity'' এর সংক্ষিপ্তরূপ মনে করে থাকেন যা আসলে ভুল। এটি 'ওয়াই-ফাই অ্যালায়েন্স (Wi-Fi Alliance)' এর একটি ট্রেডমার্ক এবং IEEE 802.11 স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহারকারী পণ্যসমূহের একটি ব্র্যান্ড নাম। 70 কোটিরও বেশি লোক ওয়াই–ফাই ব্যবহার করে থাকে।

ওয়াই-ফাই এর বৈশিষ্ট্য

- ওয়াই-ফাই এর কভারেজ সীমিত পরিসর থেকে নিয়ে বিস্তৃত পরিসরেও পাওয়া সম্ভব।
- ওয়াই-ফাই আওতার মধ্যে সকল ডিভাইসগুলোতে তারবিহীন উপায়ে কিংবা তারের মাধ্যমে ইন্টারনেট অ্যাকসেস ও ইন্টারনেটওয়ার্কিং সরবরাহ করে।

- আইফোন, অ্যানড্রয়েড, বাদা এবং সিম্বিয়ান অপারেটিং সিস্টেম চালিত ফোনগুলো ওয়্যারলেস সংযোগ তৈরি করতে পারে।
- ক্লায়েন্ট-টু-ক্লায়েন্ট সংযোগগুলোর জন্য রাউটার ছাড়াও এড-হক মোডে ওয়াই-ফাই ডিভাইসগুলোকে সংযুক্ত করা যায়।

৩.৮.৪ ওয়াইম্যাক্স

ওয়াইম্যাক্স এর পুরো অর্থ হলো ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টারঅপেরিবিলিটি ফর মাইক্রোওয়েভ অ্যাকসেস (WiMAX-Worldwide Interoperability for Microwave Access) এবং এর IEEE নাম হলো 802.16। ওয়াইম্যাক্স নামটি দিয়েছে ওয়াইম্যাক্স ফোরাম যা গঠিত হয়েছিল ২০০১ সালের জুনে। ওয়াইম্যাক্স এর মাধ্যমে আপনি উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সেবা, তারবিহীন ব্যবস্থা বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করার সুযোগ পাবেন।

ওয়াইম্যাক্স এর সুবিধা

- ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে ওয়াইফাই হটস্পটে ইন্টারনেট সেবা দেয়া যায়।
- ক্যাবল ও ডিএসএল এর পরিবর্তে তারবিহীন উপায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট অ্যাকসেস করা যায়।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলেরও সেবা পাওয়া যায় এমনকি যেখানে ফোনের সংযোগ পৌঁছেনি সেখানেও।
- তথ্য ও টেলিযোগাযোগ সেবাগুলো প্রদান করা যায়।
- নিরাপদ ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধা প্রদান করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াই-ফাই এর তুলনায় ওয়াইম্যাক্সের ব্যবহার উত্তম? বিশ্লেষণপূর্বক আপনার মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে অনেক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। যেমন- রেডিও কমিউনিকেশন, সেলুলার নেটওয়ার্ক, ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই ইত্যাদি। স্বল্প দূরত্বের ভেতর ফিক্সড ও মোবাইল ডিভাইসসমূহ থেকে তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি প্রোপ্রায়েটারি ওপেন ওয়্যারলেস প্রযুক্তি স্ট্যান্ডার্ড হলো ব্লুটুথ। আর ওয়াই-ফাই হলো জনপ্রিয় একটি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং প্রযুক্তি যা তারবিহীন উচ্চ গতির ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক সংযোগসমূহ সরবরাহের জন্য বেতার তরঙ্গকে ব্যবহার করে থাকে। অন্যদিকে ওয়াইম্যাক্স এর মাধ্যমে আপনি উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড সেবা, তারবিহীন ব্যবস্থা বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করার সুযোগ পাবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ওয়াইম্যাক্স এর পুরো অর্থ হলো-

ক) Worldwide Interoperability for Microwave Access
খ) Wireless Interoperability for Microwave Access
গ) Wifi Interoperability for Microwave Access
ঘ) কোনটিই নয়

২। কোনটি ফোনের সাথে হ্যান্ডস ফ্রি হেডসেটের সংযোগ ঘটিয়ে সাউন্ড বা ভয়েস ডাটা স্থানান্তরে ব্যবহৃত হয়?

ক) ওয়াই-ফাই খ) ব্লুটুথ
গ) ওয়াইম্যাক্স ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৩.৯ সেলুলার বা মোবাইল ফোন প্রযুক্তি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সেলুলার বা মোবাইল ফোন প্রযুক্তির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- জিএসএম প্রযুক্তি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিডিএমএ প্রযুক্তি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জিএসএম ও জিএসএম প্রযুক্তির তুলনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জিএসএম, সিডিএমএ।

৩.৯.১ সেলুলার বা মোবাইল ফোন প্রযুক্তি

মোবাইল ফোন বর্তমান বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। ১৯৪০ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে সর্ব প্রথম মোবাইল ফোন চালু হয়। তার বিহীন দুটি ডিভাইসের মধ্যে ডাটা ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্য যে সিস্টেম ব্যবহৃত হয় তাকে মোবাইল যোগাযোগ বলে। বর্তমানে প্রচলিত মোবাইল ফোন প্রযুক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১। জিএসএম (GSM) ও

২। সিডিএমএ (CDMA)

৩.৯.২ জিএসএম

জিএসএম বা গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল কমিউনিকেশন (Global System for Mobile Communication-GSM) হলো মোবাইল টেলিফোনি সিস্টেমের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্ট্যান্ডার্ড। একে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন সিস্টেম হিসেব বিবেচনা করা হয়। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের মধ্যে রোমিং চুক্তি থাকার ফলে বিশ্বের যে কোন স্থান থেকে যেকোন ব্যক্তি জিএসএম এর আওতায় থাকা অবস্থায় নিজের মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করতে পারছে। স্বল্প মূল্যের শর্ট মেসেজ সার্ভিস (এসএমএস) এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও জিএমএস পথিকৃত। GSM,TDMA (Time division multiple access) ব্যবহার করে যেসব মোবাইল ফোন সার্ভিস দেয়া হয় সেগুলো হল- এসএমএম, কল ফরওয়ার্ডিং, আউটগোয়িং কলকে নিয়ন্ত্রণ করা, ইনকামিং কলকে নিয়ন্ত্রণ করা, কল হোডিং, কলার আইডি, কলার ওয়েটিং, মাল্টিপার্টি সার্ভিস ইত্যাদি।

জিএসএম এর বৈশিষ্ট্য

- স্বল্প মূল্যের এসএমএস এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জিএসএম পথিকৃত।
- সেলুলার নেটওয়ার্ক বিধায় নির্দিষ্ট এলাকাতে মোবাইল ফোনগুলো জিএসএম এর সাথে সংযুক্ত হয়।
- সর্বোচ্চ দূরত্ব হলো ৩৫ কিলোমিটার ।
- অধিকাংশ টুজি জিএসএম নেটওয়ার্কগুলো 900 MHz বা 1800MHz ব্যান্ডে পরিচালিত হয়।
- হ্যান্ডসেটের ট্রান্সমিশন ক্ষমতা ২ বা ১ ওয়াট।

৩.৯.৩ সিডিএমএ

সিডিএমএ এর পুরো অর্থ হলো-কোড ডিভিশন মাল্টিপল অ্যাকসেস (CDMA-Code Division Multiple Access)। এটি একটি চ্যানেল অ্যাকসেস মেথড যা কিনা বিভিন্ন ধরনের রেডিও কমিউনিকেশন প্রযুক্তির দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। সিডিএমএ প্রযুক্তিতে ভয়েস এবং ডেটা এ্যাপ্লিকেশনে অনেক ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়। সিডিএমএ তে এখন ২জি এবং থ্রিজি উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হচ্ছে। সিডিএমএ পদ্ধতিতে বেতার তরঙ্গ ব্যান্ডকে কতগুলো কেরিয়ারে বিভক্ত করা হয় যা ১.২৫

মেগাহার্টজ প্রশস্ত। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য আলাদা কোড দেয়া হয় এবং এই কোড পুরো ক্যারিয়ারের মধ্যে বিস্তৃত করা হয়।

সিডিএমএ এর বৈশিষ্ট্য

- বিভিন্ন ধরনের রেডিও কমিউনিকেশন প্রযুক্তির দ্বারা বাস্তবায়িত হয়।
- এই প্রযুক্তিতে ভয়েস এবং ডেটা এ্যাপ্লিকেশনে অনেক ব্যান্ডউইথ পাওয়া যায়।
- এতে ২জি এবং থ্রিজি উভয় প্রযুক্তিই ব্যবহৃত হচ্ছে।
- বেতার তরঙ্গ ব্যান্ডকে কতগুলো কেরিয়ারে বিভক্ত করা হয় যা ১.২৫ মেগাহার্টজ প্রশস্ত।
- প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য আলাদা কোড দেয়া হয়।

৩.৯.৪ জিএসএম ও সিডিএমএ এর মধ্যে তুলনা

জিএসএম	সিডিএমএ
১. ব্যান্ড উইডথকে টাইম স্লটে ভাগ করে।	১. আলদা কোড সহ ব্যান্ড উইডথ বরাদ্দ করে।
২. কলের খরচ বেশী	২. কলের খরচ কম
৩. রোমিং সুবিধা পাওয়া যায়।	৩. রোমিং সুবিধা পাওয়া যায় না।
৪. জিএসএম হ্যান্ডসেটগুলোর ব্যাটারীর আয়ু কম।	৪. সিডিএমএ হ্যান্ডসেটগুলোর ব্যাটারীর আয়ু বেশী।

শিক্ষার্থীর কাজ	জিএসএম-কি পরিপূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত নেটওয়ার্ক? যুক্তিসহকারে মতামত দিন।

সারসংক্ষেপ

জিএমএস ও সিডিএমএ বর্তমান বিশ্বে বহুল পরিচিত সেলুলার ফোন প্রযুক্তি। আশির দশকে GSM এর পদ যাত্রা শুরু হয়। GSM প্রথমে Group Speacial Mobile নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে GSM কনর্সোটিয়ামের মাধ্যমে Global System for Moble Communication নতুন সংজ্ঞায় আবির্ভূত হয় যা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। অন্যদিকে CDMA প্রযুক্তিটি একটি Advance Digital Technology যা আমেরিকান ওয়্যারলেস্ কমিউনিকেশন গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান Qualcom আবিষ্কার করে। এটা ইউনিক কোডিং সিস্টেম ব্যবহার করে ডাটা আদান-প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জিএসএম এর সার্ভিস কোনগুলো?

ক) এসএমএম খ) কল ফরওয়ার্ডিং
গ) ইনকামিং কল বেরিং ঘ) সবগুলোই

২। CDMA- এর পূর্ণরূপ-

ক) Code Division Multiple Access খ) Core Division Multiple Access
গ) Code Divided Multiple Access ঘ) Copy Division Multiple Access

পাঠ-৩.১০ বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোবাইল ফোনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	১জি, ২জি, ৩জি, ৪জি।

৩.১০.১ বিভিন্ন প্রজন্মের মোবাইল ফোন

মোবাইল ফোন প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে মোবাইল ফোনের আবিষ্কারের শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্তকে চারটি প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে। যথা–

১। প্রথম প্রজন্ম (First Generation –1G.)
২। দ্বিতীয় প্রজন্ম (Second Generation-2G)
৩। তৃতীয় প্রজন্ম (Third Generation -3G) এবং
৪। চতুর্থ প্রজন্ম (Forth Generation -4G)।

প্রথম প্রজন্ম (১৯৫০ -১৯৮৯)

প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোন ১৯৭৩ সালে অ্যানালগ সিস্টেম ও পোর্টেবল ডিভাইসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এ ফোন তৈরির পর থেকে মোবাইল কমিউনিকেশনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭৯ সালে এশিয়ার সর্ববৃহৎ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী জাপানের NTTC (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) সেলুলার টেলিফোন উৎপাদন শুরু করে। ১৯৮০ সালের শুরুর দিকে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকোতে সেলুলার টেলিফোনের কিছু কিছু ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৮১ সালে NMT (Nordic Mobile Telephone) কর্তৃক ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে ও সুইডেনে আন্তর্জাতিক রোমিং সুবিধাসহ ১ম প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্কের দ্বিতীয় যাত্রা শুরু করে।

প্রথম প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো–

১। নেটওয়ার্কে রেডিও সিগন্যাল হিসেবে অ্যানালগ সিস্টেমের ব্যবহার।
২। সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির ব্যবহার।
৩। অপেক্ষাকৃত কম ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডের ব্যবহার।
৪। মাইক্রোপ্রসেসর এর ব্যবহার।
৫। ছোট ও হালকা মোবাইল ফোনের ব্যবহার।



চিত্র ৩.১০.১ : প্রথম প্রজন্মের মোবাইল ফোন

দ্বিতীয় প্রজন্ম (১৯৯০-২০০০)

১৯৯০ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। ট্রান্সমিশন কোয়ালিটি, সিস্টেম ক্যাপাসিটি এবং বিশাল এলাকা জুড়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেম চালু করা হয়।

দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো–

১। দ্বিতীয় প্রজন্মে ডিজিটাল মোবাইল নেটওয়ার্ক সিস্টেম চালু হয়।
২। GSM প্রযুক্তিতে ভয়েস ও ডাটা প্রেরণ করা সম্ভব।
৩। সিগনাল উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।
৪। পেজিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ৩.১০.২ : দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন

৫। SMS (Short Message Service) ও MMS (Multimedia Message Service) সার্ভিস শুরু হয়।
৬। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্ভিস চালু হয়।

তৃতীয় প্রজন্ম (২০০১-২০০৮)

২০০১ সালে জাপানের টোকিওতে NTT DoCoMo সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন অ-বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার শুরু হয়। দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকে তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের প্রধান প্রযুক্তিগত পার্থক্য হচ্ছে সার্কিট সুইচিং ডাটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে প্যাকেট সুইচিং ডাটা ট্রান্সমিশনের ব্যবহার। 3G বা Third Generation হচ্ছে এমন একটি মোবাইল প্রযুক্তি (আন্তর্জাতিক টেলিফোন সংস্থা : ITU এর মতে) যাতে GSM EDGE UTMS এবং CDMA 2000 প্রযুক্তি অন্তর্ভূক্ত। 3G প্রযুক্তি ব্যবহার করে DECT, WiMAX, Voice Call, Video Call সার্ভিস প্রদান করা সম্ভব।



চিত্র ৩.১০.৩ : তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন

তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো–

- উচ্চগতি সম্পন্ন ডাটা পারাপার।
- GPRS (General Packet Radio System) স্ট্যান্ডার্ডের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।
- সর্বাধিক ডাটা ট্রান্সফারের মোবাইল টেকনোলজি EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) সিস্টেম চালু হয়।
- ডাটা ট্রান্সফার রেট সর্বোচ্চ প্রায় 2Mbps।
- প্যাকেট স্যুইচিং এবং সার্কিট স্যুইচিং উভয় পদ্ধতি ডাটা ট্রান্সমিশনে ব্যবহার করা যায়।
- অতি দ্রুত ভয়েজ ও ছবি আদান-প্রদান করা যায়।

চতুর্থ প্রজন্ম (২০০৯-বর্তমান সময় পর্যন্ত)

২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু হয়। চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্যাকেট স্যুইচিং বা সার্কিট স্যুইচিং ডাটা ট্রান্সমিশনের পরিবর্তে ইন্টারনেট প্রটোকল (IP) ভিত্তিক নেটওর্য়াকের ব্যবহার। ইন্টারনেট প্রটোকল ব্যবহারের ফলে LAN, WAN, VOIP, Internet ইত্যাদি সিস্টেমে প্যাকেট সুইচিং পরিবর্তে প্রটোকল ভিত্তিক ভয়েস ডাটা ট্যান্সফার করা সম্ভব হচ্ছে। এটি 2G ও 3G এর চেয়ে অধিক উন্নত প্রযুক্তি। চতুর্থ প্রজন্মের (4G) উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্যে WiMax, Flash-OFDM (Orthogonal frequency Division Multiple Access), 3GPP LTE (3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution) ব্যবহৃত হচ্ছে।


চিত্র ৩.১০.৪ : চতুর্থপ্রজন্মের বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ফোন

চতুর্থ প্রজন্মের মোবাইল সিস্টেমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো–

- ডাটা ট্রান্সফার রেট হবে সর্বোচ্চ প্রায় 20Mbps।
- উচ্চ গতির ফ্রিকোয়েন্সি।
- ত্রি-মাত্রিক ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা।
- USB পোর্টের মাধ্যমে সরাসরি কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।
- ইন্টারনেট মডেম ও সিম কার্ড ব্যবহার করে সরাসরি কম্পিউটারে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করার সুযোগ তৈরি হয়।
- ওয়ারলেস ইন্টারনেট সুবিধা।

শিক্ষার্থীর কাজ	অহনার বাবার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি চলন্ত অবস্থায় কথা বললে কিছুক্ষণ পর পর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু অহনার মোবাইল ফোনটিতে এমন ঘটনা ঘটে না; বরং কথা বলার সাথে সাথে ছবিও দেখা যায়। অহনা ও তার বাবার মোবাইল ফোন প্রযুক্তিগত দিক থেকে ভিন্ন-বিশ্লেষণপূবর্ক আপনার মতামত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

মোবাইল ফোনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ও ধাপে ধাপে উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। মোবাইলের পরিবর্তন বা বিকাশের একেকটি ধাপকে বলা হয় মোবাইল প্রজন্ম। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মোবাইল প্রযুক্তিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রথম প্রজন্ম (1st Generation -1G), দ্বিতীয় প্রজন্ম (2nd Generation -2G), তৃতীয় প্রজন্ম (3rd Generation -3G) ও চতুর্থ প্রজন্ম (4th Generation -4G) ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। GSM প্রযুক্তিতে ভয়েস ও ডাটা প্রেরণ করা সম্ভব-

ক) প্রথম প্রজন্মের মোবাইল
খ) তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল
গ) দ্বিতীয় প্রজন্মের মোবাইল
ঘ) কোনটিই নয়

২। EDGE এর পূর্ণরূপ কি?

ক) Embalanced Data Rates for Global Evolution
খ) Enhanced Data Rates for Global Evolution
গ) Early Data Rates for Global Evolution
ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৩.১১ মোবাইল ইন্টারনেট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোবাইল ইন্টারনেট কি তা বলতে পারবেন।
- মোবাইল ইন্টারনেট এর সুবিধা ও অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	মোবাইল ইন্টারনেট।

৩.১১.১ মোবাইল ইন্টারনেট

GPRS, EDEG,WAP ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন মোবাইল ফোনেও ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এখন মোবাইল ফোনেই ই-মেইল আদান-প্রদান, ওয়েব ব্রাউজিং, সোসাল নেটওয়ার্কিং, টিভি দেখাসহ বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি এক নিমিষেই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে উপযুক্ত হ্যান্ডসেট ব্যবহার করতে হয়। কারণ সকল ধরনের হ্যান্ডসেট ইন্টারনেট ব্যবহারে সক্ষম হয় না। এ ক্ষেত্রে খানিকটা উচুঁ মানের হ্যান্ডসেট ও স্মার্টফোন ব্যাবহার করে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করা যায়। বর্তমানে বাজারে স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ফোন কিনতে পাওয়া যায়।

৩.১১.২ মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা

- সাশ্রয়ী বিভিন্ন ইন্টারনেট সার্ভিস নিয়ে ইচ্ছে অনুযায়ী ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়।
- কভারেজের আওতাভুক্ত যে কোন স্থান থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়।
- সার্বক্ষণিক ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত থাকা যায়।
- যে কোন স্থান থেকে ই-মেইল চেক ও প্রেরণ করা যায়।
- দূরে অবস্থানরত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে চ্যাটিং করা যায়।
- বিশ্বের যে কোন প্রান্তে মোবাইলে ভয়েস কল করা যায়।
- থ্রিজি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভিডিও কল করা যায়।
- স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করে টেলিভিশন দেখা যায়।

৩.১১.২ মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহারের অসুবিধা

- শুধুমাত্র বিশেষ পর্যায়ের হ্যান্ডসেটগুলোতেই ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়।
- লো-কনফিগারেশনের মোবাইলগুলোতে ফ্ল্যাশ ও অন্যান্য ভারী কনটেন্ট চালানো সহজ হয় না।
- মেসেজ বা ই-মেইল টাইপ করতে সময় বেশী লাগে।
- ইন্টারনেটের খরচ অনেক বেশী।
- ওয়েব সাইটে থাকা পিডিএফ, ভিডিও ফাইল পড়তে ও দেখতে সমস্যা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজনীতার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

GPRS এবং EDGE প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সিস্টেমই হলো মোবাইল ইন্টারনেট। অবশ্য মোবাইল ফোনে WAP (Wireless Application Protocol) প্রযুক্তিও ব্যবহার করা হয়। ফলে মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য কোন প্রকার ক্যাবল বা মডেমের প্রয়োজন হয় না। আর এই WAP প্রযুক্তির কারণেই মোবাইল ফোনের সাহায্যে খুব দ্রুত ইন্টারনেট ব্রাউজিং, ই-মেইল আদান-প্রদান, ই-ব্যাংকিং, ই-কমার্স ইত্যাদি কার্যাবলি সহজেই সম্পাদন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মোবাইল ইন্টারনেট এ কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়?

ক. GPRS খ. EDGE
গ. WAP ঘ. সবগুলোই

২। মোবাইলের কোন প্রজন্ম হতে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয়?

ক. ১ম খ. ২য়
গ. ৩য় ঘ. ৪র্থ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৩

ক. জ্ঞান দক্ষতা স্তর

১। ডাটা কমিউনিকেশন কী?

২। ডাটা ট্রান্সমিশন স্পীড কী?

৩। ব্লুটুথ কী ?

৪। মোবাইল প্রজন্ম কী ?

৫। মোবাইল ইন্টারনেট কী?

খ. অনুধাবন দক্ষতা স্তর

১। আলোর গতিতে ডেটা প্রেরণ সম্ভব-ব্যাখ্যা করুন।

২। "স্বল্প দূরত্বে বিনা খরচে ডাটা স্থানান্তর সম্ভব" - ব্যাখ্যা করুন।

৩। 'ডাটা আদান ও প্রদান একই সময়ে সম্ভব' - ব্যাখ্যা করুন।

৪। 9600 bps স্পিডটি ব্যাখ্যা করুন।

৫। WiMax এর তুলনায় Wi–fi বেশি জনপ্রিয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ফোন থেকে কম্পিউটারে ফাইল স্থানান্তরে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?

ক. ব্লুটুথ খ. ওয়াই-ফাই
গ. ওয়াইম্যাক্স ঘ. মোবাইল কমিউনিকেশন

২। ওয়াইম্যাক্স টাওয়ারের মাধ্যমে কভারেজ প্রদান করা যায় কত মাইল?

ক. ২০ খ. ৩০
গ. ৪০ ঘ. ৫০

৩। জিএসএম প্রথম চালু হয় কোন দেশে?

ক. ইংল্যান্ড খ. ফিনল্যান্ড
গ. আয়ারল্যান্ড ঘ. স্কটল্যান্ড

৪। পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ককে সংক্ষেপে কী বলে?

ক. প্যান খ. ল্যান
গ. ম্যান ঘ. ওয়্যান

৫। যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার ডাটা ট্রান্সমিট করে তাকে কি বলে?

ক. অ্যাসিনক্রোনাস খ. সিনক্রোনাস
গ. আইসোক্রোনাস ঘ. সবগুলো

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ডাটা ট্রান্সমিশন মোড হলো-

i. সিমপ্লেক্স
ii. হাফ-ডুপ্লেক্স
iii. ফুল-ডুপ্লেক্স
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল গঠিত হতে পারে-

i. দুটি সুপরিবাহী বা কন্ডাক্টর
ii. সলিড কপার
iii. অপরিবাহী পদার্থ
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:
কোনো কোম্পানির দুইজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করেন কিন্তু একই সময়ে তারা কথা বলতে পারেন না।

১। তারা কোন ডাটা ট্রান্সমিশন মোড ব্যবহার করেন?

ক. সিমপ্লেক্স খ. হাফ-ডুপেক্স
গ. ফুল-ডুপ্লেক্স ঘ. মাল্টিপ্লেক্স

২। একই সময়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে তাদের যে ডিভাইসের প্রয়োজন-

i. মোবাইল
ii. ওয়াকিটকি
iii. রেডিও
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকগুলো পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

১। সুমাইয়া গ্রামের বাসিন্দা হয়ে কলেজ প্রাঙ্গণে ভিডিও ফোনে কথা বলাসহ ইন্টারনেটের সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারছে। কিন্তু দিনের বিশেষ বিশেষ সময় সে চাহিদামত সুবিধা পায় না। বন্ধুদের কাছেও একই সমস্যা জানতে পেয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করলে অধ্যক্ষ মহোদয় ICT শিক্ষককে দ্রুত বিকল্প উপায়ে সমস্যাটি সমাধানের নির্দেশ দেন।

ক. ব্যান্ডউইথ কী? ১
খ. তারহীন দ্রুত গতি সম্পন্ন নেটওয়ার্ক - ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. সুমাইয়া কোন প্রজন্মের ডিভাইস ব্যবহার করছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে ICT শিক্ষক কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন? বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। সালাম ও কামাল দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে হেটে যাচেছ। তাদের পাশ দিয়ে একজন পুলিশ একটি ডিভাইসের মাধ্যমে কথা বলছে এবং কথা বলা শেষ হলে অপর পক্ষকে কথা বলার সিগন্যাল দিচ্ছে। সালাম সাথে থাকা একটি ডিভাইস দিয়ে তার মার সাথে একই সময়ে কথা বলছে ও শুনছে।

ক. ইনফ্রারেড কী? ১

খ. তারযুক্ত মাধ্যমের মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল বেশি উপযোগী-ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. পুলিশের ব্যবহৃত ডিভাইসটির ডাটা ট্রান্সমিশন মোড বর্ণনা করুন। ৩

ঘ. সালাম ও পুলিশের ব্যবহৃত ডিভাইসদ্বয়ের মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দিন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠ - ৩.১	১	ক	২	ঘ
পাঠ - ৩.২	১	গ	২	ঘ
পাঠ - ৩.৩	১	ক	২	ঘ
পাঠ - ৩.৪	১	ঘ	২	ক
পাঠ - ৩.৫	১	ক	২	ক
পাঠ - ৩.৬	১	খ	২	ঘ
পাঠ - ৩.৭	১	ক	২	ক
পাঠ - ৩.৮	১	গ	২	ঘ
পাঠ - ৩.৯	১	ক	২	খ
পাঠ - ৩.১০	১	ক	২	ঘ
পাঠ - ৩.১১	১	ঘ	২	ক
পাঠ - ৩.১২	১	ক	২	খ
পাঠ - ৩.১৩	১	ক	২	খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৩

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ ক ২ খ ৩ খ ৪ ক ৫ ক

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ ঘ ২ ঘ

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ খ ২ ক

নেটওয়ার্কিং

ইউনিট ৪

ভূমিকা

বিভিন্ন কম্পিউটার কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা একসঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সুবিধা হলো অনেক কম্পিউটার পরস্পর যুক্ত থাকায় দু-একটি খারাপ হয়ে গেলেও সব কাজ বন্ধ হয়ে যায় না, অন্য কম্পিউটার দিয়ে সে কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। কম্পিউটার প্রযুক্তির সর্বাধুনিক বিকাশ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করা। নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য নিজস্ব কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলো একটা নেটওয়ার্ক দ্বারা যুক্ত থাকলে তাদের প্রত্যেকে অন্যদের গবেষণালব্ধ ফলগুলো মুহূর্তের মধ্যে জেনে যেতে পারে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার পরিধি অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা কেন্দ্রেই নয়, এখন বিভিন্ন কোম্পানি, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গৃহসমবায়সমূহ এবং অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কম্পিউটার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে। এতে তারা সুফলও পাচ্ছে। এসব ছোট ছোট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করেই বড় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা যায়। যেমন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক লক্ষ লক্ষ হোস্ট কম্পিউটার-এর মাধ্যমে কয়েক মিলিয়ন ব্যক্তির মধ্যে সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এ ইউনিটে আপনারা নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ, বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইসের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৪.১ : নেটওয়ার্কের ধারণা

পাঠ - ৪.২ : নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ

পাঠ - ৪.৩ : নেটওয়ার্কিং ডিভাইস -মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার ও গেটওয়ে

পাঠ - ৪.৪ : ইন্টারনেট

পাঠ - ৪.৫ : নেটওয়ার্ক টপোলজি

পাঠ - ৪.৬ : ক্লাউড কম্পিউটিং

পাঠ-৪.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেটওয়ার্ক সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- নেটওয়ার্ক এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- নেটওয়ার্ক এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ।

৪.১.১ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে বুঝায় দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ। যে বিশেষ ব্যবস্থায় মডেম, ক্যাবল বা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এক কম্পিউটারের সাথে অন্য এক বা একাধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তাদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করাই হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ।



চিত্র ৪.১.১ : একটি সাধারণ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের ফলে একটি কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্য একাধিক ব্যবহারকারীর স্ব স্ব কম্পিউটারের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে যোগাযোগ, তথ্যের আদান প্রদান, ই-কমার্স, ইলেক্ট্রনিক মেইল, ইলেকট্রনিক লাইব্রেরি, বুলেটিন বোর্ড ইত্যাদির প্রচলন ও প্রসার ক্রমেই বেড়েই চলেছে।

৪.১.২ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য

কম্পিউটার নেটওর্য়াক তৈরির উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

- ফাইল বা তথ্যের আদান প্রদান করা।
- হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ার করা।
- সফটওয়্যার রিসোর্স শোয়ার করা।
- তথ্য সংরক্ষণ করা।
- ই-কমার্স ব্যবহার করা।
- তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- মেসেস বা ই-মেইল আদান প্রদান করা ইত্যাদি।

৪.১.৩ নেটওয়ার্কের সুবিধা

কম্পিউটার নেটওর্য়াকের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- কম্পিউটার নেটওর্য়াকের সাহায্যে খুব সহজে বিশ্বের একস্থান হতে অন্য স্থানে ডাটা ও সংবাদ পাঠানো যায়। এতে সময়ের অপচয় কম হয় এবং খরচও কম লাগে।
- প্রয়োজনে তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং সময়মত গ্রাহকের নিকট পাঠানো যায়।
- কম্পিউটার নেটওর্য়াকের সাহায্যে ঘরে বসে দূর দূরান্তের ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করা যায়।
- ছাত্র-ছাত্রী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়েই যে কোন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষকের কাছ থেকে যে কোন সমস্যার সমাধান নিতে পারে।
- ঘরে বসে ক্রেতা কেনা কাটা করতে পারে।
- ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বুলেটিন বোর্ড গঠন করা যায়।
- ই-মেইল প্রেরণ ও গ্রহণ কর যায়।

এক কথায় নেটওয়ার্ক ও এর অবদান আমাদের কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনন্য গতিশীলতা এনে দিয়েছে।

৪.১.৪ নেটওয়ার্কের অসুবিধা

নেটওয়ার্কের অনেক সফলতার মাঝে দু একটি অসুবিধা রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইন্টারনেটে ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অনেক সময় দক্ষ হ্যাকাররা ব্যাংকের একাউন্ট হ্যাক করছে। আবার অপ্রাপ্ত বয়স্করা অনেক অশ্লীল ওয়েব সাইট পরিদর্শন করে, ফলে তাদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়াও ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারে ভাইরাস ছড়ানোর আশাংকা থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার অধ্যয়নরত প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি করা হলে প্রতিষ্ঠানটি কি কি ধরনের সুবিধা পাবে বলে আপনি মনে করেন? তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলতে বুঝায় দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে সংযোগ। ১৯৬৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ সর্বপ্রথম নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা চালু করে। সেই থেকেই কম্পিউটার নেটওয়ার্কের জয়যাত্রা শুরু। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে যোগাযোগ, তথ্যের আদান প্রদান, ই- কমার্স , ই-মেইল, ই-লাইব্রেরি, টেলিকনফারেন্স, বুলেটিন বোর্ড ইত্যাদির প্রচলন ও প্রসার ক্রমেই বেড়েই চলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নেটওয়ার্কের সুবিধা কোনটি?

ক) ঘরে বসে ক্রেতা কেনা কাটা করতে পারে খ) ই-মেইল প্রেরণ ও গ্রহণ করা যায়

গ) প্রয়োজনে তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করে রাখা যায় ঘ) সবগুলোই

২। কম্পিউটার নেটওর্য়াক তৈরির উদ্দেশ্য-

ক) ফাইল বা তথ্যের আদান প্রদান করা খ) হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ার করা

গ) তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৪.২ নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মালিকানা অনুসারে নেটওয়ার্ক এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুসারে নেটওয়ার্ক এর শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে নেটওয়ার্ক এর শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক,লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক,ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ।

৪.২.১ নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। এজন্য বিশ্বে ব্যবহৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিমোক্ত ভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা ঃ

১। মালিকানা অনুসারে নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ
২। সার্ভিস প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো অনুসারে নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ ও
৩। ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ

৪.২.২ মালিকানা অনুসারে নেটওয়ার্কের শ্রেণিবিভাগ

মালিকানা অনুযায়ী কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দুই ধরনের:

ক. প্রাইভেট নেটওয়ার্ক ও
খ. পাবলিক নেটওয়ার্ক।

প্রাইভেট নেটওয়ার্ক : এই ধরনের নেটওয়ার্ক সাধারণত কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির মালিকানাধীন হয়। অন্য যে কেউ চাইলেই এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে না। এই ধরনের নেটওয়ার্কের সিকিউরিটি অনেক ভালো হয়। সাধারণত এ ধরনের নেটওয়ার্কে ডাটা ট্রান্সমিশনের গতি অনেক ভালো হয়।

পাবলিক নেটওয়ার্ক: এই ধরনের নেটওয়ার্ক সাধারণত ব্যক্তির মালিকানাধীন হয় না। তবে এটি কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্য যে কেউ চাইলেই এই নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারে। এজন্য ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট পরিমান ফি প্রদান করতে হয়। যেমন-টেলিফোন নেটওয়ার্ক সিস্টেম।

৪.২.৩ ভৌগোলিক বিস্তৃতি অনুসারে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

ভৌগোলিক বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার নেটওয়ার্কসমূহকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১। পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা প্যান (Personal Area Network-PAN)
২। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান (Local Area Network-LAN)
৩। মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ম্যান (Metropolitan Area Network-MAN)
৪। ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ওয়্যান (Wide Area Network-WAN)

পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ঃ PAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Personal Area Network। কোন ব্যক্তির নিকটবর্তী ব্যক্তিগত ডিভাইসগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক সিস্টেমকে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা প্যান বলে। তবে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত ডিভাইসগুলো ব্যক্তিগত নাও হতে পারে। প্যান এর বিস্তৃতি সাধারণত কয়েক মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্যান USB Bus এবং Fireware Bus দ্বারা সংযুক্ত হতে পারে। প্যানে ব্যবহৃত ডিভাইসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডিভাইস হচ্ছে- ল্যাপটপ, পিডিএ, মোবাইল, প্রিন্টার ইত্যাদি।

লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ঃ LAN এর পূর্ণনাম হচ্ছে Local Area Network। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ক্যাবল এর মাধ্যমে এক কম্পিউটার এর সাথে অন্যান্য কম্পিউটার এর যে যোগাযোগ তাকে ল্যান বলে । একই ভবনের বিভিন্ন তলায়, পাশাপাশি ভবনের বিভিন্ন তলায়, স্কুল কলেজ, অফিস আদালত, ছোট বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারগুলির সংযোগের ফলে যে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে তার নামই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। ১ কিলোমিটারের মধ্যে এই নেটওয়ার্ক ভাল কাজ করে। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় কমিনিউকেশন মিডিয়া হিসাবে সাধারণত ক্যাবল ব্যবহার হয়। সাধারণত সীমিত এলাকার মধ্যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়। তবে ইন্টারনেটের সংযোগ থাকলে ভাল হয়।



চিত্র ৪.২.১ : লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক

মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক : MAN এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Metropoliton Area Network। একটি শহরে বিভিন্ন স্থানের কম্পিউটারের মধ্যে যে সংযোগ তাকে MAN বলে। এই ধরনের নেটওয়ার্কের জন্য মিডিয়া হিসাবে টেলিফোন লাইন, মডেম ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। সাধারণত কোন ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা অফিসের মধ্যে যোগাযোগ এর জন্য এই ধরনের নেটওয়ার্ক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ১০ কিলোমিটারের মধ্যে এই নেটওয়ার্ক ভাল কাজ করে।

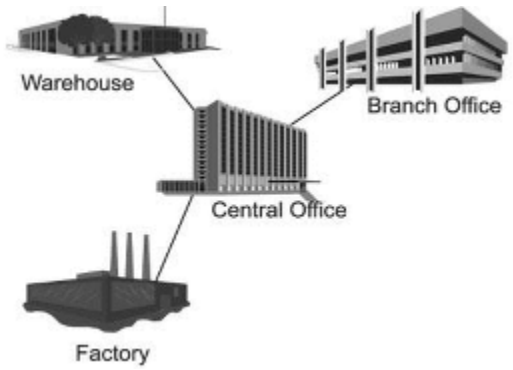

চিত্র ৪.২.২: মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক: WAN এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Wide Area Network। এই ধরনের নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলো বিশাল জায়গা জুড়ে যেমন-একই দেশের বিভিন্ন শহরের এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এ ধরনের নেটওয়ার্কে একাধিক LAN, MAN সংযুক্ত থাকতে পারে। WAN কে ইন্টারনেট বলা হয়। এই ধরনের নেটওয়ার্কে টেলিফোন, স্যাটেলাইট, মাইক্রোওয়েভ, মডেম, বেতার তরঙ্গ ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। তথ্য আদান-প্রদানের জন্যে এই ধরনের নেটওয়ার্ক বেশি ব্যবহৃত হয়।

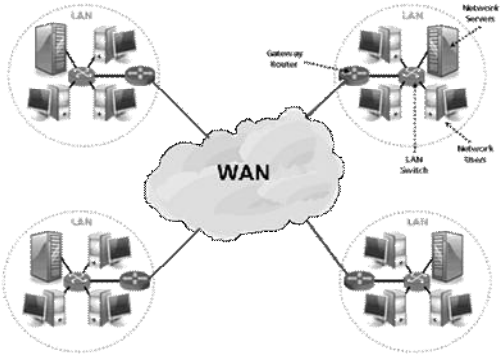

চিত্র ৪.২.৩: ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক

৪.২.৫ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সার্ভিস প্রদানের ভিত্তিতে নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ

নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সার্ভিস প্রদানের ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্কসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক (Client-Server Network)
২। পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক (Peer to Peer Network) ও
৩। হাইব্রিড নেটওয়ার্ক (Hybride Network)

ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক

কেন্দ্রীয়ভাবে ডাটা স্টোর, নিরাপত্তা দেওয়া, বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক খুবই উপযোগী। এই নেটওয়ার্কে একটি কম্পিউটারে সকল রিসোর্স থাকে এবং অন্যান্য সকল কম্পিউটারগুলো এসব রিসোর্স

ব্যবহার করে। যে কম্পিউটার রিসোর্স শেয়ার করে সেটিকে সার্ভার বলে আর যেসব কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার করে তাদেরকে ক্লায়েন্ট বলে। নেটওয়ার্কের সমস্ত রিসোর্স সার্ভারে জমা থাকায় রিসোস ম্যানেজম্যান্ট অনেক সহজ হয়।

পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক

পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কে প্রত্যেক কম্পিউটার হতে রিসোর্স শেয়ার করা যায়। এই নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটার একই সাথে সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট। এরা প্রত্যেকেই রিসোর্স শেয়ারের ক্ষেত্রে সমান ভুমিকা পালন করে। ডেডিকেটেড সার্ভার না থাকায় কম্পিউটারগুলোর কোন শ্রেণীবিন্যাস নেই।

হাইব্রিড নেটওয়ার্ক

হাইব্রিড নেটওয়ার্ক মূলত ক্লায়েন্ট সার্ভার এবং পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারনত হাইব্রিড নেটওয়ার্কে সার্ভার অংশের প্রাধান্য থাকে। তবে এর পাশাপাশি অল্প বিস্তারে পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের অংশ থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ল্যান ও ম্যানের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

নেটওয়ার্ক হলো এমন সিস্টেম যেখানে সবাই মিলে তথ্য শেয়ার করা যায় বা একসাথে কাজ করা যায়। কোন ব্যক্তির নিকটবর্তী ব্যক্তিগত ডিভাইসগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তথ্য আদান প্রদানের নেটওয়ার্ক সিস্টেম পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক নামে পরিচিত। আবার একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ক্যাবল এর মাধ্যমে এক কম্পিউটার এর সাথে অন্যান্য কম্পিউটার বা ডিভাইসসমূহের মধ্যে যে নেটওয়ার্ক গঠন করা হয় তাকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বলে। অন্যদিকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলো বা ডিভাইসগুলো বিশাল জায়গা জুড়ে যেমন- একই দেশের বিভিন্ন শহরের এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং সার্ভিস প্রদানের ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্কসমূহকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৬

২। কোন নেটওয়ার্কে প্রতিটি কম্পিউটার একই সাথে সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট?

ক) পিয়ার টু পিয়ার খ) ক্লায়েন্ট সার্ভার
গ) হাইব্রিড নেটওয়ার্ক ঘ) কোনটাই নয়

পাঠ-৪.৩ নেটওয়ার্কিং ডিভাইসঃ মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার ও গেটওয়ে

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মডেম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- হাব ও সুইচ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- রাউটার ও গেটওয়ে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার, গেটওয়ে।

৪.৩.১ নেটওয়ার্কিং ডিভাইস

নেটওয়ার্ক তৈরিতে একটি কম্পিউটার ছাড়াও আরো অনেক ডিভাইস এর প্রয়োজন হয়। যেমন-নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড , মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার, গেটওয়ে ইত্যাদি। নিম্নে এগুলো সর্ম্পকে আলোচনা করা হলো-

৪.৩.২ মডেম

মডেম একটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে মডেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মডেম এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে তথ্য আদান প্রদানে সহায়তা করে। মডেমের দুটি অংশ। যথা–

১। মডুলেটর (Modulator) ও

২। ডি-মডুলেটর (De-modulator)



চিত্র ৪.৩.১ : মডেম

মডুলেটর ডিজিটাল সংকেতকে অ্যানালগ (Analog) সংকেতে রূপান্তর করে। এই রূপান্তরের ক্রিয়াকে বলা হয় মডুলেশন। ডিমডুলেটর অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তর করে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডিমডুলেশন। বাজারে বিভিন্ন গতি সম্পন্ন মডেম পাওয়া যায়। যেমন- 600 kbps, 1200 kbps, 2400 kbps ইত্যাদি।

৪.৩.৩ হাব



চিত্র ৪.৩.২ : হাব

হাবের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে। হাবের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কম্পিউটারের সংযোগের সংখ্যা। স্টার টপোলজিতে হাব একটি কেন্দ্রিয় ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। হাবে মাল্টিপল পোর্ট থাকে। যখন একটি প্যাকেট কোন একটি পোর্টে পৌঁছায়, এটি সেই প্যাকেটকে কপি করে হাবের সকল পোর্টে পাঠায়।

কার্যকারিতার দিক থেকে হাব দুই প্রকার যথা–

১। **সক্রিয় হাব (Active HUB)** ঃ এ ধরণের হাব সংকেতের মানকে বৃদ্ধি করে। আবার কোন কোন সক্রিয় হাব সংকেতকে অল্প মাত্রায় প্রসেসও করে থাকে। এই সকল হাব মূল সংকেত থেকে অপ্রয়োজনীয় সংকেত বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংকেত প্রেরণ করে।

২। **নিষ্ক্রিয় হাব (Passive HUB)** ঃ এ ধরণের হাব সংকেতের মানকে বৃদ্ধি করে। এ সকল হাব শুধু তথ্য আদান প্রদানে সহায়তা করে মাত্র। এজন্য এই সকল হাবকে কোন সক্রিয় হাবের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।

৪.৩.৪ সুইচ



চিত্র ৪.৩.৩ : সুইচ

সুইচ একটি ডিভাইস যা নেটওয়ার্কের ডাটাকে বিভক্ত করে নেটওয়ার্কের সকল সিস্টেমে না পাঠিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়। হাব এবং সুইচ এর কাজ প্রায় একই। তবে হাব

প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর একই সাথে প্রত্যেকটি কম্পিউটারে পাঠায় কিন্তু সুইচ প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর টার্গেট কম্পিউটারে পাঠায়। স্টার টপোলজিতে সুইচ একটি কেন্দ্রিয় কানেকটিভ ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৪.৩.৫ রাউটার

রাউটার ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ করা হয়। ছোট ছোট নেটওয়ার্ক রাউটারের মাধ্যমে সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। রাউটার নেটওয়ার্কের মধ্যে একাধিক পথ সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক যেমন ইথারনেট, টোকেন, রিং কে সংযুক্ত করতে পারে। রাউটার একই প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।



চিত্র ৪.৩.৪ : রাউটার

৪.৩.৬ গেটওয়ে

গেটওয়ে ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ করা হয়। গেটওয়ে এবং রাউটার ব্যবহার করে ছোট ছোট নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়। রাউটার একই প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে কিন্তু গেটওয়ে বিভিন্ন প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।



চিত্র ৪.৩.৫ : গেটওয়ে

শিক্ষার্থীর কাজ	হাব ও সুইচের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ছাড়াও আরো অনেক ধরনের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে একটি কম্পিউটার এর সাথে অন্য এক বা একাধিক কম্পিউটারের সংযোগ করার জন্য যে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করা হয় তাদেরকে নেটওয়ার্কিং ডিভাইস বলা হয়। নেটওয়ার্কিং ডিভাইস হিসেবে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড , মডেম, হাব, সুইচ, রাউটার, গেটওয়ে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি নেটওয়ার্কিং ডিভাইস?

ক) মডেম খ) রাউটার
গ) হাব ঘ) সবগুলোই

২। কার্যকারিতার দিক থেকে হাব কত প্রকার?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

পাঠ-৪.৪ ইন্টারনেট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ইন্টারনেট কি এ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- ইন্টারনেট এর ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ইন্টারনেট।

৪.৪.১ ইন্টারনেট

টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদানের প্রযুক্তিকে ইন্টারনেট বলে। ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার ১৯৯০ সাল থেকে শুরু হলেও প্রকৃত যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৯ সালে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর ১৯৬৯ সালে Advanced Research Projects Agency Network (ARPanet) চালু করে। ১৯৯০ সালে ইন্টারনেটের কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৯৪ সালের পূর্বে তাকে এই নামে ডাকা হত না। ১৯৯৪ সালেই ইন্টারনেট শব্দটি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র ৪.৪.১ ইন্টারনেটের সাধারণ চিত্র

বর্তমান বিশ্বের কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারকারী মাধ্যমটির নাম ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের সুবাদে সমগ্র বিশ্বের সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ একই বলয়ে আবদ্ধ হতে পেরেছেন। তাই ইন্টারনেটকে অনেকেই নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক বলে।

ইন্টারনেট সংযোগ: ইন্টারনেটের সংযোগ নিতে হলে অনেক জিনিসের দরকার হয়। যথা-

- কম্পিউটার
- মডেম
- টেলিফোন বা অন্য কোন লাইন
- সফ্টওয়্যার
- আইএসপি

৪.৪.২ ইন্টারনেট এর ব্যবহার

নেটওয়ার্কের অন্যতম প্রধান ব্যবহার হলো ইন্টারনেট । মূলত নিম্নলিখিত কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়-

- দ্রুত ফাইল বা তথ্যের আদান প্রদান করা।
- তথ্য সংরক্ষণ করা।
- ই-কমার্স ব্যবহার করা।
- তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা।
- ঘরে বসে ক্রয়-বিক্রয় করা।
- ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বুলেটিন বোর্ড গঠন করা যায়।
- মেসেজ বা ই-মেইল আদান প্রদান করা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	ইন্টারনেট হতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশ এখন বেশ এগিয়ে চলছে। এই পথে এগিয়ে চলার একটি বড় নিয়ামক হলো ইন্টারনেট ব্যবস্থা। ইন্টারনেট তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ব্যবস্থা। এটি কোন দেশ বিশেষের বা অঞ্চল বিশেষের নিজস্ব ব্যবস্থা নয়। এটি একটি বিশ্ব ব্যবস্থা, অন্য কথায় গ্লোবাল সিস্টেম। ইন্টারনেট কথার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কম্পিউটারগুলোর নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইন্টারনেটের সংযোগ নিতে হলে কোনটির দরকার হয়?

ক) কম্পিউটার খ) মডেম
গ) আইএসপি ঘ) সবগুলোই

২। ইন্টারনেট এর ব্যবহার কোনটি?

ক) তথ্য সংরক্ষণ করা খ) তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা
গ) মেসেস বা ই-মেইল আদান প্রদান করা ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৪.৫ নেটওয়ার্ক টপোলজি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেটওয়ার্ক টপোলজি কি সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক টপোলজি এর সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বাস টপোলজি, রিং টপোলজি, স্টার টপোলজি, মেস টপোলজি।

৪.৫.১ নেটওয়ার্ক টপোলজি

দুই বা ততোধিক কম্পিউটারকে ক্যাবল, হাব বা সুইচ ইত্যাদি দ্বারা নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করার জন্য যুক্তি নির্ভর পথের ডিজাইন এবং ব্যবস্থাপনাকে নেটওয়ার্ক টপোলজি বলা হয়। অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় কম্পিউটারসমূহ বা নোডসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাকে নেটওয়ার্ক টপোলজি বলে। ব্যবহারের ক্ষেত্র, তথ্য আদান প্রদানের গতি ও নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণের ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলি বিভিন্ন ভাবে সংযুক্ত থাকে।

নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য টপোলজি হচ্ছে–

১। বাস টপোলজি (Bus Topology)
২। রিং টপোলজি (Ring Topoplogy)
৩। স্টার টপোলজি (Star Topology)
৪। ট্রি টপোলজি (Tree Topolopy)
৫। মেস টপোলজি (Fully Inter-connected Topology) ও
৬। হাইব্রিড টপোলজি (Hybrid Topology)

৪.৫.২ বাস টপোলজি

যে টপোলজিতে একটি মূল ক্যাবলের সাথে সব কয়েকটি ওয়ার্কস্টেশন বা কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে তাকে বাস টপোলজি বলে। একে অনেক সময় লিনিয়ার বাস টপোলজিও বলা হয়। এখানে মূল ক্যাবল বা তারটিকে বলা হয় ব্যাকবোন (Backbone)। মূল ক্যাবলের উভয় প্রান্তে টারমিনেটর ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। এখানে কোন কেন্দ্রিয় কম্পিউটার থাকে না। প্রতিটি কম্পিউটার বা ওয়ার্কস্টেশন মূল বাসের সাথে তারের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে।

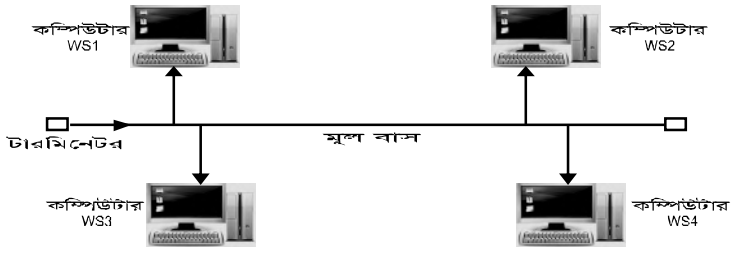

চিত্র ৪.৫.১ : বাস টপোলজি

৪.৫.৩ রিং টপোলজি

এ ধরনের সংগঠনে কম্পিউটারগুলো পরস্পর বৃত্তাকারে যুক্ত নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে (চিত্র ৪.৫.২)। প্রতিটি কম্পিউটার দুই দিকের দুইটি কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত থাকে। কম্পিউটারগুলোকে এমনভাবে সংযোগ দেয়া হয় যেন রিংয়ের সর্বশেষ কম্পিউটারটি প্রথমটির সাথে যুক্ত থাকে। এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে পাঠানো ডাটা বা সংকেত

বৃত্তাকার পথে (একমুখী প্রবাহ) কম্পিউটারগুলোর মধ্যে ঘুরতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্ট কম্পিউটার ডাটা গ্রহণ করে। রিং টপোলজিতে প্রতিটি কম্পিউটারের গুরুত্ব সমান। প্রত্যেকটি কম্পিউটার স্বাধীন।

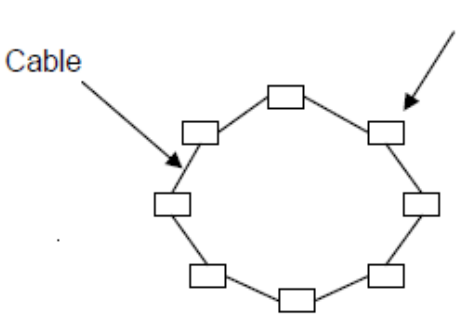

চিত্র ৪.৫.২ রিং টপোলজি

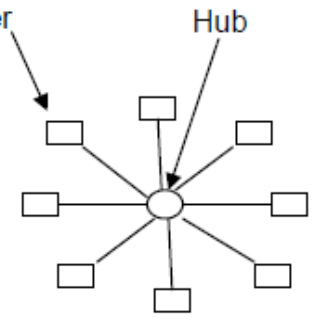

চিত্র ৪.৫.৩ স্টার টপোলজি

৪.৫.৪ স্টার টপোলজি

এ ধরনের সংগঠনে একটি কেন্দ্রিয় ডিভাইস এর সাথে অন্যান্য কম্পিউটারগুলো সংযুক্ত থাকে (চিত্র ৪.৫.৩)। কেন্দ্রিয় ডিভাইসটি হতে পারে একটি হাব বা সুইচ। হাব বা সুইচ এর মাধ্যমে কম্পিউটারগুলো পরস্পরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। ডাটা চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে হাব বা সুইচ । এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটার এ ডাটা স্থানান্তরের জন্য প্রথমে কেন্দ্রিয় ডিভাইসে প্রেরণ করতে হয়। এরপর কেন্দ্রিয় ডিভাইস ডাটা গ্রহণকারী কম্পিউটারে ডাটা পাঠিয়ে দেয়।

৪.৫.৫ ট্রি টপোলজি

ট্রি টপোলজি সংগঠনে ওয়ার্ক স্টেশন বা কম্পিউটারগুলো বিভিন্ন স্তরে সংযুক্ত থাকে। বিভিন্ন স্তরের কম্পিউটারগুলোকে হাবের মাধ্যমে একটির সঙ্গে অন্যটি সংযুক্ত থাকে। প্রথম স্তরের কম্পিউটারকে দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারের হোস্ট বলে। আবার দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারগুলোকে তৃতীয় স্তরের কম্পিউটারের হোস্ট বলে। মূল হোস্ট অবশ্যই শক্তিশালী কম্পিউটার হতে হয়।

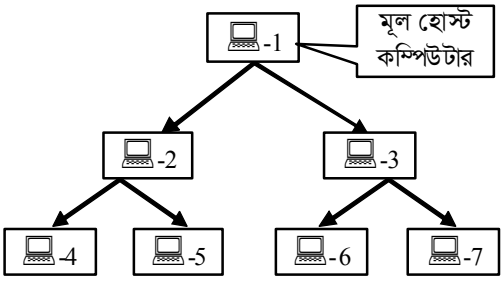

চিত্র ৪.৫.৪ : ট্রি টপোলজি

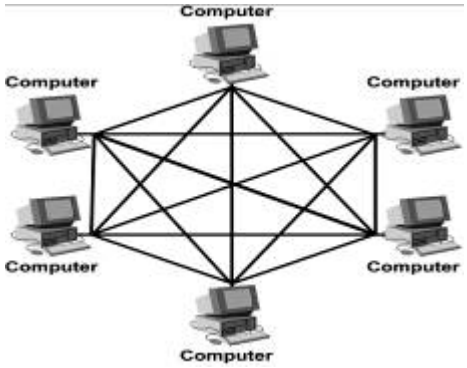

চিত্র ৪.৫.৫ : স্টার টপোলজি

৪.৫.৬ মেশ টপোলজি

মেশ টপোলজির প্রত্যেকটি ওয়ার্কস্টেশন বা কম্পিউটারের একাধিক সংযোগ ব্যবস্থা থাকে এবং প্রতিটি কম্পিউটার আলাদা লিংক ব্যবস্থাধীন থাকে (চিত্র ৪.৫.৫)। এ ব্যবস্থায় প্রতিটি কম্পিউটার সরাসরি যে কোন কম্পিউটারে ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে। এ ধরনের নেটওয়ার্কভূক্ত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট লিংক বলে।

৪.৫.৭ হাইব্রিড টপোলজি

এ ধরনের টপোলজিতে কয়েক প্রকার টপোলজির সংমিশ্রণ দেখা যায় তাই একে হাইব্রিড টপোলজি বলে। সব ধরনের সংগঠনে কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। এ জন্য হাইব্রিড টপোলজি কয়েক ধরনের টপোলজির সমন্বয়ে তৈরী হয়।

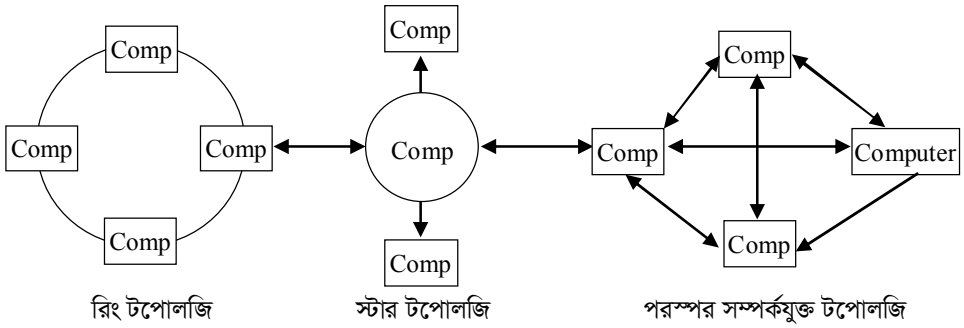

চিত্র ৪.৫.৬ : হাইব্রিড টপোলজি

শিক্ষার্থীর কাজ	ইন্টারনেটকে কোন ধরনের টপোলজির সাথে তুলনা করা যায়? আপনার বিস্তারিত মতামত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

নেটওয়ার্ক সংগঠন বা টপোলজি বলতে একটি কম্পিউটার বা নোড হতে অন্যান্য এক বা একাধিক কম্পিউটারের বা নোডের পারস্পারিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বুঝায়। তথ্য আদান প্রদানের গতি ও নেটওয়ার্ক রক্ষণাবেক্ষণের ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলো বা নোডসমূহ বাস, স্টার, রিং, মেশ, ট্রি, হাইব্রিড ইত্যাদির যে কোনটিতে সংযুক্ত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন টপোলজির কম্পিউটারগুলো পরস্পর এমনভাবে যুক্ত হয় যেন একটি বৃত্তাকার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে?

ক) রিং টপোলজি খ) বাস টপোলজি
গ) স্টার টপোলজি ঘ) সবগুলোই

২। কোন ধরনের টপোলজিতে কয়েক প্রকার টপোলজির সংমিশ্রণ দেখা যায় ?

ক) রিং টপোলজি খ) বাস টপোলজি
গ) স্টার টপোলজি ঘ) হাইব্রিড টপোলজি

পাঠ-৪.৬ ক্লাউড কম্পিউটিং

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ক্লাউড কম্পিউটিং এর মডেল সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করবেন।

	মুখ্য শব্দ	ক্লাউড কম্পিউটিং।

৪.৬.১ ক্লাউড কম্পিউটিং

ক্লাউড অর্থ হচ্ছে মেঘ। আসলে ক্লাউড শব্দটি ইন্টারনেটের রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। আকাশে সর্বত্র যেভাবে মেঘ ছড়িয়ে আছে, ইন্টারনেটও ঠিক তেমনিভাবে সর্বত্র জালের মত ছড়িয়ে আছে। ইন্টারনেটের মেঘ থেকে সর্বনিম্ন খরচে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার উপায় বের করতে গিয়েই ক্লাউড কম্পিউটিং এর জন্ম হয়। অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে কম্পিউটারের জগতে ক্লাউড কম্পিউটিং এক নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছে।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর মূল বিষয়টি হলো নিজের ব্যবহৃত কম্পিউটারের হার্ড ড্রাইভের পরিবর্তে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সার্ভিস বা হার্ডওয়্যার ভাড়া নেওয়া। যেমন- কোন প্রতিষ্ঠানের একটি ওয়েব সাইট রয়েছে এবং এই ওয়েব সাইটে একটি ব্লগ চলবে। ব্লগের অধিকাংশ ব্লগার এবং ভিজিটর বাংলাদেশের। বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা হতে রাত ১২টা পর্যন্ত এই ব্লগে ব্যবহারকারী বেশি থাকে। এর মধ্যে রাত ৮টা হতে রাত ১২টা পর্যন্ত ব্যবহারকারীর সংখ্যা খুব বেশি থাকে, ফলে ঐ সময় সার্ভারে খুব চাপ পড়ে, এই লোড কমানোর জ্য ৩/৪টি সার্ভার ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু অন্য সময়ে লোড কম থাকার ফলে ১টি সার্ভারেই কাজ হয়। তাহলে ঐ প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটটি চালানোর জন্য ২৪ ঘন্টাই ৩/৪টি সার্ভার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না, শুধুমাত্র যে সময়ে লোড বেশি থাকে সে সময়ের জন্যই অতিরিক্ত সার্ভারগুলি ভাড়া নিতে পারলেই অনেক খরচ বেঁচে যায়। এতে করে সার্ভার ভাড়া দেয়া কোম্পানিও ফ্রি সময়ে তাদের সার্ভারগুলি অন্য প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া দিতে পারছে।

ক্লাউড কম্পিউটিং এর ইতিহাস শুরু হয় ১৯৬০ এর দশকে। ২০০৬ সালে বিশ্ব বিখ্যাত অ্যামাজোন ওয়েব সার্ভিস বাণিজ্যিকভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং এর ব্যবহার শুরু করে। ২০১০ সালে The Rackspace Cloud এবং NASA মুক্ত অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস শুরু করে। এভাবেই ক্লাউড কম্পিউটিং জন সাধারণের হাতের মুঠোয় আসে।

যুক্তরাষ্ট্রের "ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং (NIST)" এর মতে ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ক্রেতার তথ্য ও বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশনকে কোন সেবাদাতার সিস্টেমে আউটসোর্স করার এমন একটি মডেল যাতে নিম্নোক্ত ৩টি বৈশিষ্ট্য থাকবে–

১. **রিসোর্স স্কেলেবিলিটি :** ছোট বা বড় যাই হোক, ক্রেতার সব ধরনের চাহিদাই মেটানো হবে, ক্রেতা যত চাইবে সেবা দাতা ততোই অধিক পরিমাণে সেবা দিতে পারবে।

২. **অন-ডিমান্ড :** ক্রেতা যখন চাইবে, তখনই সেবা দিতে পারবে। ক্রেতা তার ইচ্ছা অনুযায়ী যখন খুশি তার চাহিদা বাড়াতে বা কমাতে পারবে।

৩. **পে-অ্যাজ-ইউ-গো :** এটা একটি পেমেন্ট মডেল। ক্রেতাকে আগে থেকে কোন সার্ভিস রিজার্ভ করতে হবে না। ক্রেতা যা ব্যবহার করবে কেবলমাত্র তার জন্যই পেমেন্ট দিতে হবে।

এক কথায় বলা যায়, কম্পিউটার ও ডাটা স্টোরেজ সহজে, ক্রেতার সুবিধামত চাহিবামাত্র এবং ব্যবহার অনুযায়ী ভাড়া দেওয়ার সিস্টেমই হলো ক্লাউড কম্পিউটিং।

৪.৬.২ ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের প্রধান সার্ভিস মডেল

সেবার ধরণ অনুসারে ক্লাউড কম্পিউটিংকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **অবকাঠামোগত সেবা (Infrastructure as a services-IaaS) :** ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় অপারেটিং সিস্টেম ও সফ্টওয়্যার চালানোর জন্য ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নেটওয়ার্ক, সিপিইউ, স্টোরেজ ও অন্যান্য মৌলিক কম্পিউটিং রিসোর্স ভাড়া দেয়।

২. **প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা (Platform as a services-PaaS):** ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, ওয়েব সার্ভার, ডেটাবেজ, প্রোগ্রাম এক্সিউশন পরিবেশ ইত্যাদি থাকে। এ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারগণ তাদের তৈরি করা সফ্টওয়্যার এই প্ল্যাটফর্মে ভাড়ায় চালাতে পারেন।

৩. **সফ্টওয়্যার সেবা (Software/application as a services-SaaS) :** ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের তৈরিকৃত এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার ব্যবহারকারীগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে চালাতে পারেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুবিধা ও অসুবিধার ওপর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

ইন্টারনেট নির্ভর কম্পিউটিং হচ্ছে ক্লাউড কম্পিউটিং। এটা এমন একটি প্রযুক্তি যা অধিকতর সহজভাবে স্বল্প সময়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন অন-লাইন কম্পিউটিং সেবা প্রদান করে থাকে। এই ব্যবস্থায় গ্রাহক বা ব্যবহারকারী সুবিধামত ও চাহিদা অনুযায়ী কম্পিউটার সার্ভার, স্টোরেজ, সফ্টওয়্যার, ভার্চুয়াল মেশিন, ফায়ারওয়্যার ইত্যাদি ভাড়া নিয়ে ব্যবহার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **সার্ভারের ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজের জন্য সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয় কোনটি ?**

ক. ক্লায়েন্ট সার্ভার খ. ক্লাউড কম্পিউটিং
গ. ওয়েব সার্ভার ঘ. ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম

২। **ক্লাউড কম্পিউটিং এর সুফল কোনটি?**

ক. সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য খ. ইন্টারনেট সংযোগ লাগে না
গ. এ্যাপ্লিকেশনের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা যায় ঘ. তথ্যের গোপনীয়তা বজায় থাকে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৪

ক. জ্ঞান দক্ষতা স্তর

১। কম্পিউটার নেটওর্য়াক কী?

২। নেটওয়ার্ক টপোলজি কী?

৩। ক্লাউড কম্পিউটিং কী?

৪। পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক কী ?

৫। নেটওয়ার্ক ডিভাইস কী ?

খ. অনুধাবন দক্ষতা স্তর

১। শুধু মডুলেশন বা ডিমডুলেশন কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে না-ব্যাখ্যা করুন।

২। হাবের চেয়ে সুইচ অধিক শক্তিশালি- ব্যাখ্যা করুন।

৩। মেশ টপোলজি কোন ক্ষেত্রে বেশি উপযোগী-ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. LAN দ্বারা বোঝায়–

ক. Line Area Network
খ. Left Area Network
গ. Local Area Network
ঘ. Link Area Network

২. ঢাকা, চট্টগ্রাম ও নিউইয়র্ক-এর মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হল। এটি একটি -

ক. PAN
খ. LAN WAN
গ. MAN
ঘ. WAN

৩. কোন সংগঠনের নেটওয়ার্ক বৃত্তাকার?

ক. বাস সংগঠন
খ. রিং সংগঠন
গ. স্টার সংগঠন
ঘ. মেস সংগঠন

৪. কোন ধরনের নেটওয়ার্ক প্রতিটি কম্পিউটার তার দুই দিকের দুইটি কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে?

ক. বাস সংগঠন
খ. রিং সংগঠন
গ. স্টার সংগঠন
ঘ. শাখা-প্রশাখা সংগঠন

৫. কোন সংগঠনে হোস্ট কম্পিউটার থাকে?

ক. বাস সংগঠন
খ. পরস্পর সংযুক্ত সংগঠন
গ. স্টার সংগঠন
ঘ. রিং সংগঠন

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য হলো-

i. হার্ডওয়্যার রির্সোস শেয়ার করা
ii. সফ্টওয়্যার রির্সোস শেয়ার করা
iii. ইনফরমেশন শেয়ার করা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। ক্লাউড কম্পিউটিং হচ্ছে-
i. একটি ব্যবসায়িক মডেল
ii. অন-ডিমান্ড সেবা
iii. পে-অ্যাজ-ইউ-গো
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:
শুধুমাত্র তার দিয়ে ১০টি কম্পিউটার নিয়ে একটি ল্যাবে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হল। একদিন একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ায় সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক অচল হয়ে যায়।

১। উদ্দীপকে কোন ধরনের টপোলজির কথা বলা হয়েছে ?
ক. বাস খ. স্টার
গ. রিং ঘ. মেশ

২। উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে করণীয়-
i. ট্রান্সমিশন মাধ্যমের পরিবর্তন
ii.টপোলজির পরিবর্তন
iii. সুইচ সংযোজন
নিচের কোনটি সঠিক?

ক.i ও ii খ.i ও iii
গ.ii ও iii ঘ.i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকগুলো পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

১। সুপর্ণার অফিসে একটি নেটওয়ার্ক চালু আছে যেখানে একটি মূল ক্যাবলের সাথে ১০টি কম্পিউটার সরাসরি যুক্ত রয়েছে। সম্প্রতি তিনি বিপুল পরিমাণ ডাটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ পান। কিন্তু তার অফিসে উক্ত কাজের উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার নেই। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়্যার সংগ্রহ করতে না পারায় তিনি কাজটি যথা সময়ে সম্পন্ন করা নিয়ে চিন্তিত। তাই তিনি অনলাইভিত্তিক সেবা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ক. মডেম কী? ১
খ. WAN ও Internet সমার্থক-ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. সুর্পণার অফিসের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের টপোলজি ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. সুপর্নার গৃহীত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। একদিন আনোয়ার সাহেবের অফিসে ব্যবহৃত নেটওয়ার্কের কোনো কম্পিউটারই কাজ করছিল না। অনুসন্ধানে জানা যায় যে মাত্র একটি কম্পিউটার নষ্ট হওয়ার কারণে এমনটি ঘটে। অপরদিকে মিজান সাহেবের অফিসে ব্যবহৃত নেটওয়ার্কের দুটি কম্পিউটার নষ্ট হলেও অন্যান্য কম্পিউটারগুলো সচল ছিল। এক্ষেত্রে কম্পিউটারগুলো একটি কেন্দ্রীয় ডিভাইসের সাথে যুক্ত ছিল।

ক. রাউটার কী ? ১

খ. তথ্য আদান প্রদানে মডেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে-ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. আনোয়ার সাহেবের অফিসে ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক কোন প্রকারের-বর্ণনা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত টপোলজিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি বেশি নির্ভরযোগ্য বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দিন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠ - ৪.১ ১ ঘ ২ ঘ
পাঠ - ৪.২ ১ খ ২ ক
পাঠ - ৪.৩ ১ ঘ ২ ক
পাঠ - ৪.৪ ১ ঘ ২ ঘ
পাঠ - ৪.৫ ১ ক ২ ঘ
পাঠ - ৪.৬ ১ ঘ ২ গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৪

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ গ ২ ঘ ৩ খ ৪ খ ৫ গ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ ঘ ২ ঘ

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ গ ২ গ

সংখ্যা পদ্ধতি

ইউনিট ৫

ভূমিকা

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষ হিসাব ও গণনার কাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। কালের বিবর্তনে কিছু সংখ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিছু হারিয়ে গেছে। যেমন- দৈনন্দিন জীবনে আমরা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি। আবার কম্পিউটার কাজের জন্য বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই ইউনিটে বহুল প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৫.১ : সংখ্যা আবিস্কারের ইতিহাস, সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ
পাঠ - ৫.২ : সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর
পাঠ - ৫.৩ : দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তর
পাঠ - ৫.৪ : দশমিক থেকে অক্টালে রূপান্তর
পাঠ - ৫.৫ : দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর
পাঠ - ৫.৬ : বাইনারি থেকে দশমিকে রূপান্তর
পাঠ - ৫.৭ : অক্টাল থেকে দশমিকে রূপান্তর
পাঠ - ৫.৮ : হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিকে রূপান্তর
পাঠ - ৫.৯ : বাইনারি থেকে অক্টালে এবং অক্টাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর
পাঠ - ৫.১০ : বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেলে এবং হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর
পাঠ - ৫.১১ : অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে এবং হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টালে রূপান্তর
পাঠ - ৫.১২ : বাইনারি যোগ ও বিয়োগ
পাঠ - ৫.১৩ : চিহ্নযুক্ত সংখ্যা
পাঠ - ৫.১৪ : কোড ও কোডের ধারণা

পাঠ-৫.১ সংখ্যা আবিস্কারের ইতিহাস, সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার সংখ্যা পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সংখ্যা পদ্ধতি

৫.১.১ সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস

সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে হিসাব বা গণনা করার ধারণা সৃষ্টি হয়। শুরুতে গণনার কাজে মানুষ হাতের আঙ্গুলকে ব্যবহার করত। পরবর্তীতে আঙ্গুলে গণনার সীমাবদ্ধতা থেকে বের হয়ে পড়ে এবং শুরু হয় কাঠি, নুড়ি-পাথর, দড়ির গিট ইত্যাদি উপকরণের ব্যবহার। উন্নতির ধাপে ধাপে গণনার জগতে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করে। সাথে সাথে বিভিন্ন উপায়ে গণনার পদ্ধতিও চালু হয়।

অনুমান করা হয় খৃস্টপূর্ব ৩২০০ সালে হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics) চিহ্ন বা সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বপ্রথম গণনার কাজে লিখিত সংখ্যা বা চিহ্নের প্রচলন শুরু হয়। এরপর শুরু হয় মেয়ান (Mayan) পদ্ধতি। তারা ব্যবহার করতো ২০ ভিত্তিক সংখ্যা এবং ৫ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি। খৃস্টপূর্ব ৩৪০০ সালে রোমানরা তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে রোমান (Roman) সংখ্যা পদ্ধতি চালু করে। খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ সালের দিকে ভারতবর্ষে দশভিত্তিক সংখ্যার প্রচলন হয় এবং আরবের পণ্ডিতেরা তাদের এ পদ্ধতির উপর ব্যাপক গবেষণা করে দশভিত্তিক সংখ্যা প্রকাশের কৌশল ও গণনার প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে তা আরব থেকে ইউরোপে প্রবেশ করে। খৃষ্টপূর্ব ৪০০ সালে গ্রিসে ২৭টি গ্রিক আলফাবেট নিয়ে ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি চালু হয়।

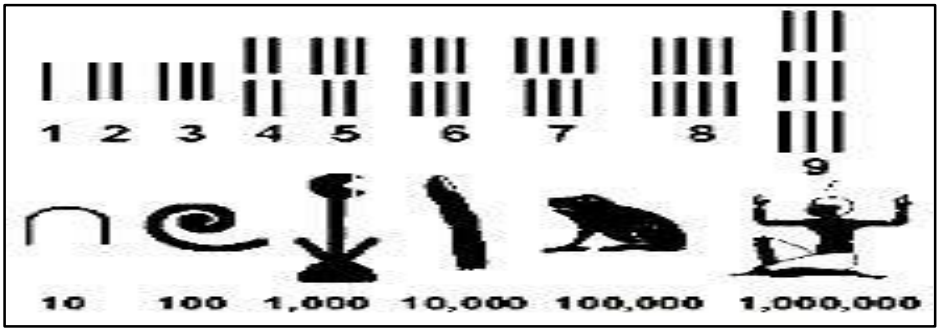

চিত্র ৫.১ : গণনার জন্য মিশরীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত হায়ারোগ্লিফিক্স (Hieroglyphics) প্রতীক

মিশরীয়রা হিসাবে ব্যালেন্স না থাকলে তাকে 'নফর' বা 'শূন্য' দিয়ে প্রকাশ করে। কোন কিছু নাই এরূপ বোঝাতে ভারতীয়রা সংস্কৃত শব্দ 'শূন্য' ব্যবহার করতো। ৬০০ সালের দিকে ঋণাত্মক সংখ্যা ব্যবহার করা হয় কারো ঋণ বোঝানোর জন্য। ভগ্নাংশ সংখ্যা প্রথম প্রবর্তন হয় মিশরে। তবে গ্রিক ও ভারতীয় গণিতবিদরা খৃষ্টপূর্ব অর্ধশতাব্দীতে ভগ্নাংশ সংখ্যার তত্ত্ব ও উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। দার্শনিক এরিস্টটল সর্বপ্রথম অসীম (∞) এর সংকেত প্রচলন করেন।

প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদ পিংগালা (Pingala) শূন্য ("০") আবিষ্কারের মাধ্যমে খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে প্রথম বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা দেন। সতের শতাব্দীতে গটফ্রেইড লিবনিজ (Gottfried Leibiz) একটি আর্টিকেলে আধুনিক

বাইনারি সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 0 এবং 1 ব্যবহার করেন। প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুল (George Boole) ১৮৫৪ সালে সত্য এবং মিথ্যা এ দুই যুক্তি বা লজিকের উপর ভিত্তি করে বুলিয়ান বীজগণিত রচনা করেন। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর সত্য এবং মিথ্যাকে যথাক্রমে বাইনারি ১ ও ০ দিয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কম্পিউটারে সমস্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়। ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির লজিক গেটে এ সংখ্যা পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। তাছাড়া সকল আধুনিক কম্পিউটারে বইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৫.১.২ সংখ্যা পদ্ধতি

কোন সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ করার পদ্ধতিকেই সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। সংখ্যা তৈরি করার বিভিন্ন প্রতীকই হচ্ছে অংক। অংক ব্যবহার করে সংখ্যা পদ্ধতির সাহায্যে যে কোন পরিমাণকে (Quantity) প্রকাশ করা যায়। যেমন- দশমিক পদ্ধতিতে ১২৩ সংখ্যাটি ১, ২ ও ৩ আলাদা তিনটি অংকের দ্বারা গঠিত হয়েছে।

সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি

কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেজ হলো ঐ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট মৌলিক চিহ্নসমূহের বা সাংকেতিক চিহ্নগুলোর মোট সংখ্যা। আমাদের অতি পরিচিত দশমিক পদ্ধতিতে মোট দশটি মৌলিক চিহ্ন বা প্রতীক রয়েছে। যথা– ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯। সে কারণে দশমিক পদ্ধতির ভিত্তি হলো ১০। আবার বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে মোট মৌলিক চিহ্ন আছে দুইটি (০ এবং ১)। সে কারণে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেজ হলো ২।

স্থানীয় মান

কোন একটি সংখ্যার যে স্থানে কোন অংক বা প্রতিকটির অবস্থান তাকে স্থানীয় মান বলে। আমাদের হিসাব-নিকাশে সবচেয়ে বেশি পরিচিত দশমিক পদ্ধতির ৪২৫ সংখ্যাটিতে ৪ অংকটি তৃতীয় অবস্থানে (অর্থাৎ শতকের ঘরে) আছে এবং এখানে বেজ বা ভিত্তি হচ্ছে ১০। সুতরাং এই তিনটি অংকের ভিত্তিতে বলা যায় এখানে ৪টি শতক আছে। গাণিতিক ভাষায় তা হলো–

$৪ \times ১০০ + ২ \times ১০ + ৫ \times ১$ বা $৪ \times ১০^{২} + ২ \times ১০^{১} + ৫ \times ১০^{০}$

উল্লেখ্য, শূন্য ছাড়া যে কোনো সংখ্যার ঘাত (Power) শূন্য হলে তার মান হয় ১।

কোনো একটি দশমিক সংখ্যা প্রকাশের জন্য একক, দশক, শতকের ঘর অর্থাৎ $১০^{০}$, $১০^{১}$, $১০^{২}$ ইত্যাদি ঘর আছে। এখানে প্রত্যেকটি স্থানকেই ১০ এর পাওয়ার (Power) হিসাবে দেখানো হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, কোনো একটি সংখ্যা পদ্ধতির পরপর ছোট থেকে বড় স্থানীয় মানের মানকে ঐ সংখ্যা পদ্ধতির বেজের ০, ১, ২, ৩,৪ ..... ইত্যাদি পাওয়ার সম্বলিত মান দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

৫.১.৩ সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তির উপর নির্ভর করে চার ধরনের সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

১. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি (Decimal Number System)
২. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Number System)
৩. অক্ট্যাল সংখ্যা পদ্ধতি (Octal Number System) ও
৪. হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি (Hexadecimal Number System)।

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি

মানুষ দৈনন্দিন জীবনে গণনা কিংবা হিসাব-নিকাশের জন্য যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে তাই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি। এ পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি হচ্ছে 10। কারণ এই পদ্ধতিতে মোট 10 টি মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যথা– 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এবং 9। $(১০১)_{১০}$, $১২৩_{১০}$, $(৯৮.৭৩)_{১০}$ ইত্যাদি হলো দশমিক সংখ্যার উদাহরণ। উল্লেখ্য, সাধারণ হিসাব-

নিকাশের জন্য দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন থাকলেও কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ প্রসেসিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যায় না।

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি

যে সংখ্যা পদ্ধতিতে 0 এবং 1 এই দু'টিমাত্র সংখ্যা বা অংক ব্যবহার করা হয় তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে। মোট দু'টি অংক ব্যবহারের কারণেই এই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি হচ্ছে 2। যেমন- $(১০১)_২$, $১০০০১_২$, $(১০০০.১১১)_২$ ইত্যাদি হলো বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ। এই পদ্ধতির 0 এবং 1 এই অংক দু'টিকে সংক্ষেপে বিট (Binary থেকে Bi এবং Digit থেকে t নিয়ে Bit) বলা হয়। 0 এবং 1-কে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে যে কোন সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে লেখা সম্ভব। যেমন– দশমিক সংখ্যা 127 বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে 10000011।

অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি

অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি হচ্ছে ৮। এই পদ্ধতিতে 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 এবং 7 এই ৮টি মৌলিক অংক ব্যবহৃত হয়। $(১০১)_৮$, $(৭৩১)_৮$, $(৬৪৫.১০৩)_৮$ ইত্যাদি হলো অক্টাল সংখ্যার উদাহরণ।

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি

এই পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 16। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে 16 টি মৌলিক অংক রয়েছে। এই সংখ্যাসমূহ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এবং অতঃপর A, B, C, D, E ও F। বর্ণ (Alphabet) এবং সংখ্যা (Number) উভয়ের ব্যবহার থাকার কারণে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির আরেক নাম আলফানিউমেরিক সংখ্যা পদ্ধতি। হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির A, B, C, D, E এবং F-এর সমতুল্য দশমিক হচ্ছে যথাক্রম 10, 11, 12, 13, 14 এবং 15। $(151)_{16}$,$(1B)_{16}$,$(ABC.\ B)_{16}$ ইত্যাদি হলো হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার উদাহরণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক, প্রতিক, বেজ উদাহরণসহ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে হিসাব বা গণনা করার ধারণা সৃষ্টি হয়। বর্তমানে গণনার জন্য মূলত বাইনারি, অক্টাল, দশমিক ও হেক্সাডেসিমেল ইত্যাদি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে সাধারণত কোন সংখ্যা লেখা বা প্রকাশ করার পদ্ধতিকেই সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়। সংখ্যা তৈরি করার বিভিন্ন প্রতীকই হচ্ছে অংক। আর কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি বা বেজ হলো ঐ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট মৌলিক চিহ্নসমূহের বা সাংকেতিক চিহ্নগুলোর মোট সংখ্যা। যেমন- দশমিক পদ্ধতিতে মোট দশটি মৌলিক চিহ্ন বা প্রতীক রয়েছে (০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯)। সে কারণে দশমিক পদ্ধতির ভিত্তি হলো ১০।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি ভিত্তি কত?

ক) ২ খ) ৪
গ) ৮ ঘ) ১৬

২। সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তির উপর নির্ভর করে কত ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি আছে?

ক) ৩ খ) ৪
গ) ৫ ঘ) ৬

পাঠ-৫.২ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির আন্ত:সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।
- সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বিষয়ে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর।

৫.২.১ বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির আন্ত:সম্পর্ক

সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তির উপর নির্ভর করে চার ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি বর্তমানে বহুল প্রচলিত। এসব সংখ্যা পদ্ধতির মোট অংকের সংখ্যা আলাদা। কিন্তু এদের পারস্পরিক রূপান্তর সম্ভব। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে দুইটি, অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে আটটি, দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে দশটি, হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে ষোলটি অংক। নিচের সারণিতে 0 থেকে 20 পর্যন্ত দশমিক সংখ্যার সমতুল্য বাইনারি, অক্টাল এবং হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা দেখানো হলো–

বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতিতে বিভিন্ন সংখ্যার মান

দশমিক সংখ্যা	বাইনারি সংখ্যা	অক্টাল সংখ্যা	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14

৫.২.২ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

আমরা দৈনন্দিন জীবনে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি কিন্তু কম্পিউটারে বাইনারি, অক্টাল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণের বিষয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরগুলো জানতে হয়। যেমন-

- দশমিক সংখ্যা থেকে অন্য যে কোন সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর
- অন্য কোন সংখ্যা পদ্ধতি থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর
- বাইনারি ও অক্ট্যাল সংখ্যার পারস্পরিক রূপান্তর
- বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর
- অক্ট্যাল থেকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর
- হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্ট্যাল রূপান্তর
- হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি রূপান্তর

৫.২.৩ দশমিক সংখ্যা থেকে অন্য যে কোন সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

দশমিক সংখ্যা থেকে অন্য যে কোন সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের জন্য পূর্ণ অংশ ও ভগ্নাংশের জন্য আলাদাভাবে রূপান্তর করতে হয়।

১। পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রেঃ

- দশমিক সংখ্যা থেকে অন্য যে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে তার বেজ বা ভিত্তি দ্বারা ভাগ করে ভাগশেষ সংরক্ষণ করে নিতে হবে।
- ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।
- প্রাপ্ত ভাগশেষ শেষ থেকে শুরুর দিকে করে সাজালেই কাঙ্খিত সংখ্যাটি পেয়ে যাবে।

২। ভগ্নাংশের ক্ষেত্রেঃ

- ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যা থেকে অন্য যে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে তার বেজ বা ভিত্তি দ্বারা গুণ করে গুণফলের পূর্ণ অংশ সংরক্ষণ করে নিতে হবে।
- গুণফলের মান শূন্য না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।
- প্রাপ্ত পূর্ণ অংশ শুরু থেকে শেষের দিকে করে সাজালেই কাঙ্খিত সংখ্যাটি পেয়ে যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি কিন্তু কম্পিউটারে বাইনারি, অক্ট্যাল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। তাই এক ধরনের সংখ্যা পদ্ধতিকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তরের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণের বিষয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরগুলো প্রয়োজন হয়। তবে কতিপয় কিছু নিয়ম অনুয়ায়ী এই রূপান্তরের কাজটি সহজেই করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দশমিক সংখ্যার ১২ এর বাইনারি মান কত?

ক. ১০০১ খ. ১০১০
গ. ১০১১ ঘ. ১১০০

২। কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ কাজ করার জন্য কোন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে ?

ক.দশমিক খ.বাইনারি
গ.অক্ট্যাল ঘ.হেক্সাডেসিমেল

পাঠ-৫.৩ দশমিক থেকে বাইনারিতে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	দশমিক সংখ্যা, বাইনারি সংখ্যা।

৫.৩.১ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য সংখ্যাটিকে ২ দ্বারা (যেহেতু বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি ২) উপর্যুপরি ভাগ করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগফল ০ (শূন্য) হয়। অত:পর ভাগশেষগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (Most Significant Bit-MSB) থেকে সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (Least Significant Bit-LSB) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয় করা যায়।

- **পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর**
  ১. দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য দশমিক সংখ্যাকে ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।
  ২. ভাগফলকে পুনরায় ২ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।
  ৩. এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে যতক্ষণ না ভাজ্য ০ হয়।
  ৪. সংরক্ষিত ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ উল্টো করে সাজিয়ে লিখলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাই দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা।

উদাহরণ ১: $(105)_{10}$ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর।
সমাধানঃ

2	105	← অবশিষ্ট
2	52 – 1	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSB)
2	26 – 0	
2	13 – 0	
2	6 – 1	
2	3 – 0	
2	1 – 1	
2	0 – 1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSB)

সুতরাং, $(105)_{10} = (1101001)_2$

উদাহরণ ২: $(7)_{10}$ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর।
সমাধানঃ

2	7	অবশিষ্ট
2	3–	1 → LSB
2	1 –	1
	0 –	1→ MSB

সুতরাং, $(7)_{10} = (111)_2$

- **ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর**
  ১. ভগ্নাংশকে উপর্যুপরি ২ দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণফলের পূর্ণ অংশটি সংরক্ষণ করতে হবে।
  ২. এভাবে ভগ্নাংশকে উপর্যুপরি ২ দিয়ে গুণ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না গুণফলের ভগ্নাংশ 0 হয়।
  ৩. অত:পর প্রাপ্ত পূর্ণ অংশ শুরু থেকে শেষের দিকে করে সাজালেই কাঙ্খিত সংখ্যাটি পেয়ে যাবে।

উদাহরণ ৩: $(0.625)_{10}$ কে বাইনারি রূপান্তর প্রক্রিয়া দেখানো হলো–

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণ সংখ্যা	
.625 ×2	1.250	.250	1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSB)
.250×2	0.50	.50	0	
.50 ×2	1.00	.00	1	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSB)

সুতরাং, $(0.625)_{10} = (0.101)_2$

উদাহরণ ৪: $(15.25)_{10}$ কে বাইনারি রূপান্তর প্রক্রিয়া দেখানো হলো–

পূর্ণ অংশঃ

2	15	← অবশিষ্ট
2	7 – 1	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক
2	3 – 1	
2	1 – 1	
	0 – 1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক

সুতরাং $(15)_{10} = (1111)_2$

ভগ্নাংশঃ

গুণ	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণ সংখ্যা	
.25 ×2	0.50	.50	0	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক
.50 ×2	1.00	.00	1	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক

সুতরাং $(0.25)_{10} = (0.01)_2$

∴ ফলাফল, $(15.25)_{10} = (1111.01)_2$

শিক্ষার্থীর কাজ	$(75.125)_{10}$ -কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করুন।

সারসংক্ষেপ

দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য সংখ্যাটিকে ২ দ্বারা (যেহেতু বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি ২) উপর্যুপরি ভাগ করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগফল ০ (শূন্য) হয়। অত:পর ভাগশেষগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (Most Significant Bit-MSB) থেকে সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (Least Significant Bit-LSB) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে সংখ্যাটির সমতুল্য বাইনারি মান নির্ণয় করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দশমিক সংখ্যার ভিত্তি কত?

ক) ২ খ) ৮
গ) ১০ ঘ) ১৬

২। দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য সংখ্যাটিকে কত দ্বারা ভাগ দিতে হয়?

ক) ২ খ) ৮
গ) ১০ ঘ) ১৬

পাঠ-৫.৪ দশমিক থেকে অক্ট্যালে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দশমিক সংখ্যাকে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অক্ট্যাল সংখ্যা।

৫.৪.১ দশমিক সংখ্যাকে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য সংখ্যাটিকে ৮ দ্বারা (যেহেতু অক্ট্যাল সংখ্যার ভিত্তি ৮) উপর্যুপরি ভাগ করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগফল ০ (শূন্য) হয়। অতঃপর ভাগশেষগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (Most Significant Digit -MSD) থেকে সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (Least Significant Digit-LSD) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে সংখ্যাটির সমতুল্য অক্ট্যাল মান নির্ণয় করা হয়।

৫.৪.২ পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর

১. দশমিক সংখ্যাকে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য দশমিক সংখ্যাকে ৮ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।
২. ভাগফলকে পুনরায় ৮ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।
৩. এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে যতক্ষণ না ভাজ্য ০ হয়।
৪. সংরক্ষিত ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ উল্টো করে সাজিয়ে লিখলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাই দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ অক্ট্যাল সংখ্যা।

উদাহরণ ১: $(175)_{10}$ সংখ্যাকে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর।
সমাধানঃ

8	175	অবশিষ্ট
8	21 –	$7 \rightarrow$ LSD
8	2 –	5
8	0 –	$2 \rightarrow$ MSD

সুতরাং, $(175)_{10} = (257)_8$

উদাহরণ ২: $(75)_{10}$ সংখ্যার সমকক্ষ বা সমতুল্য অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর।
সমাধানঃ

8	75	$\leftarrow$ অবশিষ্ট
8	9 – 3	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)
8	1 – 1	
	0 – 1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)

সুতরাং, $(75)_{10} = (113)_8$

৫.৪.২ ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য নিচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে-

১. ভগ্নাংশকে উপর্যুপরি ৮ দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণফলের পূর্ণ অংশটি সংরক্ষণ করতে হবে।

২. এভাবে ভগ্নাংশকে উপর্যুপরি ৮ দিয়ে গুণ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না গুণফলের ভগ্নাংশ 0 হয়।

৩. অতঃপর উপরে দিক থেকে নিচের দিকের পূর্ণ অংশগুলো বাম থেকে ডান দিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে লিখতে হবে।

উদাহরণ ৩: $(0.625)_{10}$- অক্টালে রূপান্তর প্রক্রিয়া দেখানো হলো–

গুণফল	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণ সংখ্যা	
.625 ×8	1.20	.20	1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)
.20 ×8	1.60	.60	1	
.60 ×8	4.80	.80	4	
.80×8	6.40	.40	6	
.40×8	3.20	.20	3	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)
.....	.....	....	.....	

সুতরাং, $(0.15)_{10} = (0.11463\ldots.)_8$

উদাহরণ ৪: $(0.3125)_{10}$- অক্টালে রূপান্তর প্রক্রিয়া দেখানো হলো–

গুণফল	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণ সংখ্যা	
.3125 ×8	2.50	.50	2	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)
.50 ×8	4.00	.00	4	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)

সুতরাং, $(0.3125)_{10} = (0.24)_8$

উদাহরণ ৪: $(15.8125)_{10}$- অক্টালে রূপান্তর প্রক্রিয়া দেখানো হলো–

পূর্ণ অংশঃ

8	15	← অবশিষ্ট
8	1 – 7	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)
	0 – 1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)

সুতরাং, $(15)_{10} = (17)_8$

গুণফল	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণ সংখ্যা	
.8125 ×8	6.50	.50	6	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)
.50 ×8	4.00	.00	4	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)

সুতরাং, $(0.8125)_{10} = (0.64)_8$

∴ ফলাফল ঃ $(15.8125)_{10} = (17.64)_8$

শিক্ষার্থীর কাজ	$(225.8125)_{10}$ কে অক্টালে রূপান্তর করুন।

সারসংক্ষেপ

দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য সংখ্যাটিকে ৮ দ্বারা (যেহেতু অক্টাল সংখ্যার ভিত্তি ২) উপর্যুপরি ভাগ করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগফল ০ (শূন্য) হয়। অত:পর ভাগশেষগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (Most Significant Digit - MSD) থেকে সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (Least Significant Digit -LSD) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে সংখ্যাটির সমতুল্য অক্টাল মান নির্ণয় করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য দশমিক সংখ্যাকে কত দ্বারা ভাগ দিতে হয়?

ক) ২ খ) ৮
গ) ১০ ঘ) ১৬

২। ভগ্নাংশকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তরিত করার উপর্যুপরি ৮ দিয়ে - করতে হবে।

ক) গুণ খ) ভাগ
গ) বিয়োগ ঘ) বিয়োগ

পাঠ-৫.৫ দশমিক থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা।

৫.৫.১ দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক পূর্ণ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য সংখ্যাটিকে 16 দ্বারা (যেহেতু হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 16) উপর্যুপরি ভাগ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ভাগফল শূন্য (0) হয়। অতঃপর ভাগশেষগুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ অংক (MSD) থেকে সর্বনিম্ন গুরুত্বপূর্ণ অংক (LSD) পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বাম থেকে ডানে সাজালে সংখ্যাটির সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

৫.৫.২ পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর

১. দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য দশমিক সংখ্যাকে ১৬ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।
২. ভাগফলকে পুনরায় ১৬ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে।
৩. এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে যতক্ষণ না ভাজ্য ০ হয়।
৪. সংরক্ষিত ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ উল্টো করে সাজিয়ে লিখলে ১ থেকে F এর সমন্বয়ে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাই দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা।
৫. ভাগশেষ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যদি ভাগশেষ ১০ থেকে ১৫ হয় তবে যথাক্রমে ১০ → A, ১১ → B, ১২→ C, ১৩→ D, ১৪ →E ও ১৫ →F সংখ্যা লিখতে হবে।

উদাহরণ ১: $(962)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর ।

		অবশিষ্ট	
16	962		
16	60	– 2 ——→ LSD	
16	3	– 12 = C ↑	[দশমিক পদ্ধতির 12 = হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতির C]
	0	– 3 ——→ MSD	

সুতরাং, $(962)_{10} = (3C2)_{16}$

উদাহরণ ২: $(4851)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর ।

16	4851	← অবশিষ্ট
16	303 – 3	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)
16	18– 15(F)	
16	1 – 2	
	0 – 1	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)

সুতরাং, $(4851)_{10} = (12F3)_{16}$

৫.৫.৩ ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর

দশমিক ভগ্নাংশকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য পুনঃ পুনঃ 16 দ্বারা গুণ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না গুণফলের ভগ্নাংশ শূন্য (0) হয়। তাই ভগ্নাংশ দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য নিচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে-

১. ভগ্নাংশকে উপর্যুপরি ১৬ দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণফলের পূর্ণ অংশটি সংরক্ষণ করতে হবে।
২. এভাবে ভগ্নাংশকে উপর্যুপরি ১৬ দিয়ে গুণ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না গুণফলের ভগ্নাংশ 0 হয়।
৩. অতঃপর উপরে দিক থেকে নিচের দিকের পূর্ণ অংশগুলো বাম থেকে ডান দিকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে লিখতে হবে।

উদাহরণ ৩: $(0.925)_{10}$- কে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর প্রক্রিয়া দেখানো হলো–

গুণফল	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণ সংখ্যা	
.925 ×16	14.80	.80	14(E)	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)
.80 ×16	12.80	.80	12(C)	
.80 ×16	12.80	.80	12(C)	
.80 ×16	12.80	.80	12(C)	
…	….	….	…..	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)

সুতরাং, $(0.925)_{10} = (0.ECCC….)_{16}$

উদাহরণ ৪: $(0.3125)_{10}$- কে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর প্রক্রিয়া দেখানো হলো–

গুণফল	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণ সংখ্যা
.8125 ×16	5.00	.0	5

সুতরাং, $(0.8125)_{10} = (0.5)_{16}$

উদাহরণ ৫: $(726.48)_{10}$- কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর ।

পূর্ণ অংশঃ

16	726	← অবশিষ্ট
16	45 – 6	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)
16	2 – 13(D)	
	0 – 2	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)

সুতরাং, $(726)_{10} = (2D6)_{16}$

ভগ্নাংশঃ

গুণফল	গুণফল	ভগ্নাংশ	পূর্ণ সংখ্যা	
.48 ×16	7.68	.68	7	সর্বোচ্চ গুরুত্বের অংক (MSD)
.68 ×16	10.88	.88	10(A)	
.88 ×16	14.08	.08	14(E)	
.08 ×16	1.28	.28	1	
.28 ×16	4.48	.48	4	সর্বনিম্ন গুরুত্বের অংক (LSD)
….	….	….	….	

সুতরাং, $(0.48)_{10} = (0.7AE14…)_{16}$

∴ ফলাফল ঃ $(726.48)_{10} = (2D6.\ 7AE14…)_{16}$

শিক্ষার্থীর কাজ	$(15.8125)_{10}$ কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করুন।

সারসংক্ষেপ

দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেলে সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য দশমিক সংখ্যাকে ১৬ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে। ভাগফলকে পুনরায় ১৬ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষকে সংরক্ষণ করতে হবে। এ পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে যতক্ষণ না ভাজ্য ০ হয়। সংরক্ষিত ভাগশেষগুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখলে দশমিক সংখ্যার সমকক্ষ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পাওয়া যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য দশমিক সংখ্যাকে কত দ্বারা ভাগ দিতে হয়?

ক) ২ খ) ৮

গ) ১০ ঘ) ১৬

২। ভগ্নাংশকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরিত করার উপর্যুপরি ১৬ দিয়ে - করতে হবে।

ক) যোগ খ) বিয়োগ

গ) গুণ ঘ) ভাগ

পাঠ-৫.৬ বাইনারি থেকে দশমিকে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাইনারি থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বাইনারি সংখ্যা ।

৫.৬.১ বাইনারি থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

কোন বাইনারি সংখ্যার প্রত্যেকটি অংককে নিজ নিজ স্থানীয় মান দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যাবে।

৫.৬.২ পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে–

বাইনারি থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার সময় প্রত্যেক অংককে ২ দ্বারা গুণ করতে হবে। গুণ করার সময় স্থানীয় মান অনুযায়ী ২ এর ঘাত ০ হতে বাড়াতে হবে। যেমন- একক স্থানীয় অংকটিকে $২^{০}$ দ্বারা , দশক স্থানীয় অংকটিকে $২^{১}$ দ্বারা, শতক স্থানীয় অংকটিকে $২^{২}$,------- দ্বারা গুণ করতে হবে। প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ১: $(1101)_2$- কে ডেসিমেল বা দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধান:

= (1×1 এর স্থানীয় মান) + (1×1 এর স্থানীয় মান) + (0×0 এর স্থানীয় মান) + (1×1 এর স্থানীয় মান)

$= 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
$= 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$
$= 8 + 4 + 0 + 1$
$= 13$
$\therefore (1101)_2 = (13)_{10}$

- বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি = 2
- ভিত্তি এবং অবস্থানের উপর নির্ভর করে স্থানীয় মান নির্ণয় করা হয়।
- কোন অংকের ঘাত বা শক্তি '0' হলে মান '1' হবে। অর্থাৎ $x^o = 1$; তদ্রুপ $100^\circ = 1$; একইভাবে $2^\circ = 1$

উদাহরণ ২: $(1011)_2$ কে ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

$1011 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
$= 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$
$= 8 + 0 + 2 + 1$
$= 11$

সুতরাং, $(1011)_2 = (11)_{10}$

৫.৬.৩ ভগ্নাংশ বাইনারি থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

বাইনারি থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার সময় প্রত্যেক অংককে ২ দ্বারা গুণ করতে হবে। গুণ করার সময় স্থানীয় মান অনুযায়ী ২ এর ঘাত -১ হতে শুরু করে ডান দিকে বাড়াতে হবে। যেমন- প্রথম অংকটিকে $২^{-১}$ দ্বারা , দ্বিতীয় অংকটিকে $২^{-২}$ দ্বারা, তৃতীয় অংকটিকে $২^{-৩}$ দ্বারা গুণ করতে হবে। প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ৩: $(.1101)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

$$(.1101)_2 = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$
$$= 1 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2^2} + 0 \times \frac{1}{2^3} + 1 \times \frac{1}{2^4}$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{16}$$
$$= .5 + .25 + .0625$$
$$= .8125$$
$$\therefore (.1101)_2 = (.8125)_{10}$$

উদাহরণ ৪: $(.111)_2$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

$$(.1101)_2 = 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4}$$
$$= 1 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2^2} + 0 \times \frac{1}{2^3} + 1 \times \frac{1}{2^4}$$
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$$
$$= .50 + .25 + 0.125$$
$$= .875$$
$$\therefore (.111)_2 = (.875)_{10}$$

শিক্ষার্থীর কাজ	$(1111.101)_2$ কে ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করুন।

সারসংক্ষেপ

কোন বাইনারি সংখ্যার প্রত্যেকটি অংককে নিজ নিজ স্থানীয় মান দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যায়। অর্থাৎ একক স্থানীয় অংকটিকে ২^{০} দ্বারা , দশক স্থানীয় অংকটিকে ২^{১} দ্বারা, শতক স্থানীয় অংকটিকে ২^{২},------- দ্বারা গুণ করতে হবে। প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাইনারি থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য বাইনারি সংখ্যাকে কত দ্বারা গুণ দিতে হয়?

ক) ২ খ) ৮

গ) ১০ ঘ) ১৬

২। পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে বাইনারি থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করার সময় ২ এর ঘাত কত হতে শুরু হয়? ।

ক) ০ খ) ১

গ) -১ ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৫.৭ অক্টাল থেকে দশমিকে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ অক্টাল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অক্টাল সংখ্যা ও দশমিক সংখ্যা।

৫.৭.১ অক্টাল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

কোন অক্টাল সংখ্যার প্রত্যেকটি অংককে নিজ নিজ স্থানীয় মান দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত অক্টাল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যাবে।

৫.৭.২ পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে–

অক্টাল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার সময় প্রত্যেক অংককে ৮ দ্বারা গুণ করতে হবে। গুণ করার সময় স্থানীয় মান অনুযায়ী ৮ এর ঘাত ০ হতে বাড়াতে হবে। যেমন- একক স্থানীয় অংকটিকে $৮^{০}$ দ্বারা , দশক স্থানীয় অংকটিকে $৮^{১}$ দ্বারা, শতক স্থানীয় অংকটিকে $৮^{২}$, ...দ্বারা গুণ করতে হবে। প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত অক্টাল সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ১: $(735)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধান ঃ

$$\begin{aligned}(735)_8 &= (7 \times 7 \text{ এর স্থানীয় মান}) + (3 \times 3 \text{ এর স্থানীয় মান}) + (5 \times 5 \text{ এর স্থানীয় মান}) \\ &= (7 \times 8^2) + (3 \times 8^1) + (5 \times 8^0) \\ &= (7 \times 64) + (3 \times 8) + (5 \times 1) \quad [\because 8^0 = 1] \\ &= 448 + 24 + 5 \\ &= 477\end{aligned}$$

$$\therefore (735)_8 = (477)_{10}$$

উদাহরণ ২: $(212)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধান ঃ

$$\begin{aligned}(212)_8 &= 2 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 2 \times 8^0 \\ &= 2 \times 64 + 1 \times 8 + 2 \times 1 \\ &= 128+8+2 \\ &= 138\end{aligned}$$

সুতরাং, $(212)_8 = (138)_{10}$

৫.৭.৩ ভগ্নাংশ অক্টাল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

অক্টাল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার সময় প্রত্যেক অংককে ৮ দ্বারা গুণ করতে হবে। গুণ করার সময় স্থানীয় মান অনুযায়ী ৮ এর ঘাত -১ হতে শুরু করে ডান দিকে বাড়াতে হবে। যেমন- প্রথম অংকটিকে $৮^{-১}$ দ্বারা , দ্বিতীয় অংকটিকে $৮^{-২}$ দ্বারা, তৃতীয় অংকটিকে $৮^{-৩}$ দ্বারা ..... গুণ করতে হবে। প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত অক্টাল সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ৩: $(.146)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধান ঃ

$$(.146)_8 = (1 \times 8^{-1}) + (4 \times 8^{-2}) + (6 \times 8^{-3})$$
$$= (1 \times \frac{1}{8}) + (4 \times \frac{1}{8^2}) + (6 \times \frac{1}{8^3})$$
$$= \frac{1}{8} + \frac{4}{64} + \frac{6}{512}$$
$$= .125 + .0625 + .01171875$$
$$= .19921875$$

$\therefore (.146)_8 = (.19921875)_{10}$

শিক্ষার্থীর কাজ	$(165.45)_8$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করুন।

সারসংক্ষেপ

অক্ট্যাল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার সময় প্রত্যেক অংককে ৮ দ্বারা গুণ করতে হবে। গুণ করার সময় স্থানীয় মান অনুযায়ী ৮ এর ঘাত ০ হতে বাড়াতে হবে। প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত অক্ট্যাল সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অক্ট্যাল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য অক্ট্যাল সংখ্যাকে কত দ্বারা গুণ দিতে হয়?

ক) ২ খ) ৮

গ) ১০ ঘ) ১৬

২। পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে অক্ট্যাল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করার সময় ৮ এর ঘাত কত হতে শুরু হয়?

ক) ০ খ) ১

গ) -১ ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৫.৮ হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিকে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা ও দশমিক সংখ্যা।

৫.৮.১ হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য সংখ্যাটির প্রত্যেক অংককে নিজ নিজ স্থানীয় মান দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলসমূহকে যোগ করতে হবে। এভাবে প্রাপ্ত যোগফলই হবে উক্ত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক সংখ্যা।

৫.৮.২ পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে–

হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার সময় প্রত্যেক অংককে ১৬ দ্বারা গুণ করতে হবে। গুণ করার সময় স্থানীয় মান অনুযায়ী ১৬ এর ঘাত ০ হতে বাড়তে থাকবে। যেমন- একক স্থানীয় অংকটিকে $১৬^{০}$ দ্বারা , দশক স্থানীয় অংকটিকে $১৬^{১}$ দ্বারা, শতক স্থানীয় অংকটিকে $১৬^{২}$ দ্বারা,.....গুণ করতে হবে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাটির কোন অংক A,B,C,D,E ও F হলে যথাক্রমে ১০, ১১, ১২, ১৩ , ১৪ ও ১৫ দিয়ে গুণ করতে হবে। প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ১: $(2D6)_{16}$ সংখ্যাটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

$$\begin{aligned}(2D\ 6)_{16} &= (2 \times 2 \text{ এর স্থানীয় মান}) + (D \times D \text{ এর স্থানীয় মান}) + (6 \times 6 \text{ এর স্থানীয় মান}) \\ &= 2 \times 16^2 + D \times 16^1 + 6 \times 16^0 \\ &= 2 \times 256 + 13 \times 16 + 6 \times 1 \\ &= 512 + 208 + 6 \\ &= 726 \\ \therefore (2D\ 6)_{16} &= (726)_{10}\end{aligned}$$

উদাহরণ ২: $(234)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

$$\begin{aligned}(234)_8 &= 2 \times 16^2 + 1 \times 16^1 + 2 \times 16^0 \\ &= 2 \times 256 + 1 \times 16 + 2 \times 1 \\ &= 512+16+2 \\ &= 530\end{aligned}$$

সুতরাং, $(234)_{16} = (530)_{10}$

৫.৮.৩ ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিম্যাল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর

হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার সময় প্রত্যেক অংককে ১৬ দ্বারা গুণ করতে হবে। গুণ করার সময় স্থানীয় মান অনুযায়ী ১৬ এর ঘাত -১ হতে শুরু করে ডান দিকে বাড়তে থাকবে। যেমন- প্রথম অংকটিকে $১৬^{-১}$ দ্বারা , দ্বিতীয় অংকটিকে $১৬^{-২}$ দ্বারা, তৃতীয় অংকটিকে $১৬^{-৩}$ দ্বারা...গুণ করতে হবে। প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে উক্ত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ৩: $(.7AE1)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর ।
সমাধানঃ

$$(.7AE1)_{16} = 7 \times 16^{-1} + A \times 16^{-2} + E \times 16^{-3} + 1 \times 16^{-4}$$
$$= 7 \times \frac{1}{16} + 10 \times \frac{1}{16^2} + 14 \times \frac{1}{16^3} + 1 \times \frac{1}{16^4}$$
$$= .4375 + .03906 + .003417 + .0000152$$
$$= .479992$$
$$\therefore (.7AE1)_{16} = (.479992)_{10}$$

শিক্ষার্থীর কাজ	$(165.45)_{16}$ কে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করুন।

সারসংক্ষেপ

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য সংখ্যাটির প্রত্যেক অংককে নিজ নিজ স্থানীয় মান দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলসমূহকে যোগ করতে হবে। এভাবে প্রাপ্ত যোগফলই হবে উক্ত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার সমতুল্য দশমিক সংখ্যা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য বাইনারি সংখ্যাকে কত দ্বারা গুণ দিতে হয়?

ক) ২ খ) ৮
গ) ১০ ঘ) ১৬

২। পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তরিত করার সময় ১৬ এর ঘাত কত হতে শুরু হয়?

ক) ০ খ) ১
গ) -১ ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৫.৯ বাইনারি থেকে অক্ট্যালে এবং অক্ট্যাল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাইনারি ও অক্ট্যাল সংখ্যার পারস্পরিক রূপান্তর করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ অক্ট্যাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা ও দশমিক সংখ্যা।

৫.৯.১ বাইনারি থেকে অক্ট্যাল রূপান্তর

একটি অক্ট্যাল সংখ্যা তিন বিট বাইনারি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। আমরা জানি, বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি ২ এবং অক্ট্যাল সংখ্যার ভিত্তি ৮। বাইনারি সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর করতে সংখ্যাটির অংকগুলোকে তিন বিট বিশিষ্ট ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়। এরপর প্রতিটি গ্রুপের সমতুল্য অক্ট্যাল মান বসালে তা বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তরিত হয়।

৫.৯.২ পূর্ণ বাইনারি থেকে অক্ট্যাল রূপান্তর

কোন বাইনারি পূর্ণ সংখ্যাকে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য সংখ্যাটির অংকগুলোকে ডান দিক থেকে ৩ বিট বিশিষ্ট এক একটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। তবে কখনো এমন হতে পারে যে, সর্ব বামের গ্রুপ তৈরির জন্য ৩ বিট নেই। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে বাম দিকে একটি বা দু'টি, শূন্য (0) বসিয়ে ৩ বিটের গ্রুপ সম্পন্ন করতে হবে। এভাবে গ্রুপ সম্পন্ন হওয়ার পরে প্রতিটি গ্রুপকে এর সমতুল্য অক্ট্যাল সংখ্যার মান বসালে বাইনারি সংখ্যাটি সমতুল্য অক্ট্যাল মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ১ঃ $(1101101)_2$ কে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

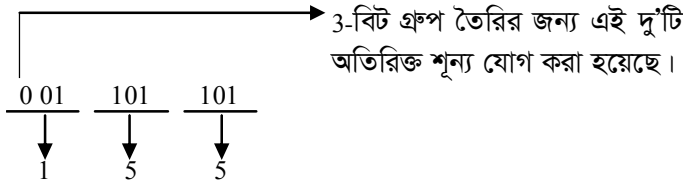

$\therefore (1101101)_2 = (155)_8$

উদাহরণ ২ঃ $(1111011)_2$ কে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

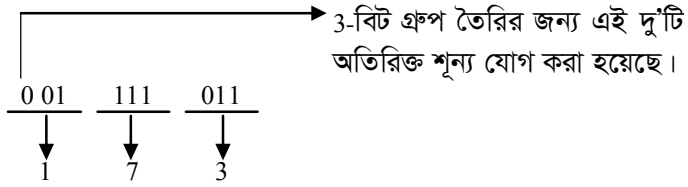

$\therefore (1111011)_2 = (173)_8$

৫.৯.৩ ভগ্নাংশ বাইনারি থেকে অক্টাল রূপান্তর

কোন বাইনারি ভগ্নাংশকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য অংকগুলোকে বাম দিক থেকে (অর্থাৎ বাইনারি বিন্দুর ডান দিক থেকে) ৩ বিট বিশিষ্ট এক একটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্ব ডানে একটি বা দু'টি শূন্য (0) বসিয়ে ৩ বিট বিশিষ্ট গ্রুপ নিশ্চিত করা হয়।

উদাহরণ ৩ঃ $(.10011011)_2$- কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

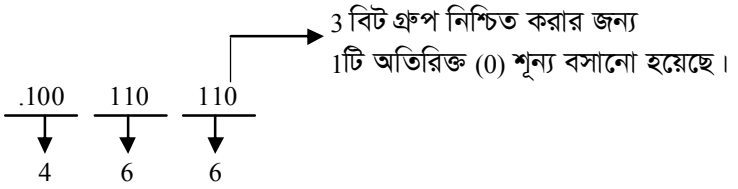

$\therefore (.10011011)_2 = (.466)_8$

উদাহরণ ৪ঃ $(11010110.0101111)_2$ কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর।

সমাধান ঃ

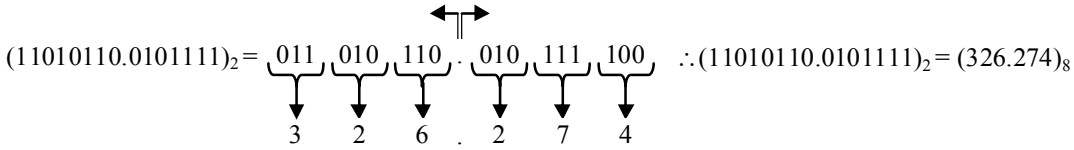

৫.৯.৪ অক্টাল থেকে বাইনারি রূপান্তর

অক্টাল থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিটি অক্টাল অংককে তিন বিট বিশিষ্ট বাইনারি রূপান্তর করলে বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যায়। নিচে ১ থেকে ৭ পর্যন্ত সকল অক্টাল সংখ্যার বাইনারি মান দেয়া হল-

অক্টাল	বাইনারি সংখ্যা
১	০০১
২	০১০
৩	১০১
৪	১০০
৫	১০১
৬	১১০
৭	১১১

উদাহরণ ৫ঃ $(525)_8$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধান ঃ

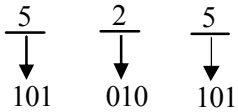

$\therefore (525)_8 = (101010101)_2$

উদাহরণ ৬ঃ $(727.6)_8$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধান ঃ

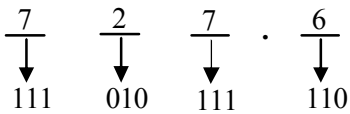

$\therefore (727.6)_8 = (111010111.110)_2$

শিক্ষার্থীর কাজ	$(165.45)_8$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করুন।

সারসংক্ষেপ

আমরা জানি, বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি ২ এবং অক্ট্যাল সংখ্যার ভিত্তি ৮। বাইনারি সংখ্যাকে অক্টালে রূপান্তর করতে সংখ্যাটির অংকগুলোকে তিন বিট বিশিষ্ট ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়। এরপর প্রতিটি গ্রুপের সমতুল্য অক্ট্যাল মান বসালে তা বাইনারি থেকে অক্টালে রূপান্তরিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অক্ট্যাল থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিটি অক্ট্যাল অংককে কত বিট বিশিষ্ট বাইনারি গ্রুপ করতে হয়?

ক) ৩ খ) ৪

গ) ৫ ঘ) ৬

২। ৭ অক্ট্যাল সংখ্যাটির বাইনারি মান কত?

ক) ১০১ খ) ০১১

গ) ১১১ ঘ) ১০০

পাঠ-৫.১০ বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেলে এবং হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাইনারি ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার পারস্পরিক রূপান্তর করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা ও দশমিক সংখ্যা।

৫.১০.১ বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর

একটি হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা চার বিট বাইনারি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে, বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি ২ এবং হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার ভিত্তি ১৬(2^8)। বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে সংখ্যাটির অংকগুলোকে চার বিট বিশিষ্ট ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়। এরপর প্রতিটি গ্রুপের মান বসালে তা বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তরিত হয়।

৫.১০.২ পূর্ণ বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর

কোন বাইনারি পূর্ণ সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য সংখ্যাটির অংকগুলোকে ডান দিক থেকে ৪ বিট বিশিষ্ট এক একটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। তবে কখনো এমন হতে পারে যে, সর্ব বামের গ্রুপ তৈরির জন্য ৪ বিট নেই। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে বাম দিকে একটি বা দু'টি, শূন্য (0) বসিয়ে ৪ বিটের গ্রুপ সম্পন্ন করতে হবে। এভাবে গ্রুপ সম্পন্ন হওয়ার পরে প্রতিটি গ্রুপকে এর সমতুল্য মান বসিয়ে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করা হয়।

উদাহরণ ১ঃ $(101101)_2$ কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

$$\underline{10} \quad \underline{1101}$$

4 বিট না থাকায় বাম পাশে দু'টি শূন্য (0) বসিয়ে 4 বিট গ্রুপ সম্পন্ন করতে হবে।

$$= \frac{0010}{2} \ \frac{1101}{D}$$

$$\therefore (101101)_2 = (2D)_{16}$$

উদাহরণ ২ঃ $(111110011)_2$ কে হেক্সাডেসিম্যাল সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

$$\underline{0001} \quad \underline{1111} \quad \underline{0011}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$1 \quad F \quad 3$$

তিনটি অতিরিক্ত শূন্য যোগ করা হয়েছে।

$$(111110011)_2 = (1F3)_{16}$$

৫.১০.৩ ভগ্নাংশ বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর

কোন বাইনারি ভগ্নাংশকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য অংকগুলোকে বাম দিক থেকে (অর্থাৎ বাইনারি বিন্দুর ডান দিক থেকে) ৪ বিট বিশিষ্ট এক একটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্ব ডানে একটি বা দু'টি শূন্য (0) বসিয়ে ৪ বিট বিশিষ্ট গ্রুপ নিশ্চিত করা হয়।

উদাহরণ ৩ঃ $(.1011001)_2$- কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ $(.1011001)_2$

$$\underbrace{.1011}_{B}\ \underbrace{0010}_{2}$$

$= (.B2)_{16}$

উদাহরণ ৪ ঃ$(10100111011.1001011)_2$- কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর।

সমাধানঃ $(10100111011.1001011)_2$

$$= \underbrace{0101}_{5}\ \underbrace{0011}_{3}\ \underbrace{1011}_{B(11)} \cdot \underbrace{1001}_{9}\ \underbrace{0110}_{6}$$

$= 53B.96$

৫.১০.৪ হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি রূপান্তর

হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিটি হেক্সাডেসিমেল অংককে ৪ বিট বিশিষ্ট বাইনারি রূপান্তর করলে বাইনারি সংখ্যা পাওয়া যায়।

উদাহরণ ৫ঃ $(525)_{16}$- কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

$$\underbrace{5}_{0101}\ \underbrace{2}_{0010}\ \underbrace{5}_{0101}$$

$\therefore (525)_{16} = (010100100101)_2$

উদাহরণ ৬ঃ $(72D.A)_{16}$- কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে।

সমাধানঃ

$$\underbrace{7}_{0111}\ \underbrace{2}_{0010}\ \underbrace{D}_{1101} \cdot \underbrace{A}_{1100}$$

$\therefore (72D.A)_{16} = (011100101101.1100)_2$

শিক্ষার্থীর কাজ	$(165.45)_{16}$ কে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করুন।

সারসংক্ষেপ

একটি হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা চার বিট বাইনারি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। বাইনারি সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তর করতে সংখ্যাটির অংকগুলোকে চার বিট বিশিষ্ট ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হয়। এরপর প্রতিটি গ্রুপের মান বসালে তা বাইনারি থেকে হেক্সাডেসিমেলে রূপান্তরিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হেক্সাডেসিমেল থেকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রতিটি হেক্সাডেসিমেল অংককে কত বিট বিশিষ্ট বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয়?

ক) ৩ খ) ৪

গ) ৫ ঘ) ৬

২। হেক্সাডেসিমেল A সংখ্যার বাইনারি মান কত?

ক) ১০০০ খ) ১০০১

গ) ১০১০ ঘ) ১০১১

পাঠ-৫.১১ অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেলে এবং হেক্সাডেসিমেল থেকে অক্টালে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অক্টাল ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার পারস্পরিক রূপান্তর করার পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।
- পূর্ণ ও ভগ্নাংশ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা ও অক্টাল সংখ্যা।

৫.১১.১ অক্টাল থেকে হেক্সাডেসিমেল রূপান্তর

অক্টাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথমে অক্টাল সংখ্যার প্রত্যেকটি অংককে ৩ বিট বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। অত:পর পুরো বাইনারি সংখ্যাটিকে ৪ বিট বাইনারি গ্রুপে সাজিয়ে সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল মান বসালে উক্ত অক্টাল সংখ্যাটির হেক্সাডেসিমেল মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ১ঃ $(472)_8$ -কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর।

সমাধানঃ

4 7 2

100 111 010

0001 0011 1010

1 3 A(10)

$\therefore (472)_8 = (13\ A)_{16}$

উদাহরণ ২ঃ $(531.24)_8$ -কে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর।

সমাধানঃ

5 3 1 . 2 4

101 011 001 . 010 100

$= 0001\ 0101\ 1001\ .\ 0101\ 0000$

1 5 9 5 0

$= 159.5$

$\therefore (531.24)_8 = (159.50)_{16}$

৫.১১.২ হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর

হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথমে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যার প্রত্যেকটি অংককে ৪ বিট বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। অত:পর পুরো বাইনারি সংখ্যাটিকে ৩ বিট করে এক একটি গ্রুপে সাজিয়ে সমতুল্য অক্টাল মান বসালে উক্ত হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাটির অক্টাল মান পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ৪ ঃ $(18\ F)_{16}$ -কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

1 8 F

0001 1000 1111

$= 000\ 110\ 001\ 111$

0 6 1 7

$= 0617$

$\therefore (18F)_{16} = (617)_8$

উদাহরণ ৫ ঃ $(13A)_{16}$ -কে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

1 3 A

0001 0011 1010

1 3 A(10)

= 000 100 111 010

0 4 7 2

= 0472

∴ $(13A)_{16} = (472)_8$

উদাহরণ ৬ঃ $(159.52)_{16}$ কে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর ।

সমাধানঃ

1 5 9 . 5 2

0001 0101 1001 . 0101 0010

= 000 101 011 001 . 010 100 100

= 0531.244

∴ $(159.52)_{16} = (531.244)_8$

শিক্ষার্থীর কাজ	$(165.45)_{16}$ কে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তর করুন।

সারসংক্ষেপ

অক্ট্যাল সংখ্যাকে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য প্রথমে অক্ট্যাল সংখ্যার প্রত্যেকটি অংককে ৩ বিট বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হবে। অত:পর পুরো বাইনারি সংখ্যাটিকে ৪ বিট বাইনারি গ্রুপে সাজিয়ে সমতুল্য হেক্সাডেসিমেল মান বসালে উক্ত অক্ট্যাল সংখ্যাটির হেক্সাডেসিমেল মান পাওয়া যাবে। অবশ্য হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাকে অক্ট্যাল সংখ্যায় রূপান্তরের জন্য উক্ত পদ্ধতির বিপরীত কাজটি করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মি. আতিক কামালকে বলল, "তোমার বয়স কত?" কামাল বলল যে তার বয়স $(101101)_2$।

১। কামালের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো–

ক. $(25)_8$ খ. $(35)_8$

গ. $(55)_8$ ঘ. $(65)_8$

২। দশ বছর পর কামালের বয়স বাইনারিতে কত হবে?

ক.$(101011)_2$ খ.$(101110)_2$

গ.$(101111)_2$ ঘ.$(110111)_2$

পাঠ-৫.১২ বাইনারি যোগ ও বিয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাইনারি সংখ্যায় যোগ করতে পারবেন।
- বাইনারি সংখ্যায় বিয়োগ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বাইনারি যোগ ও বাইনারি বিয়োগ ।

৫.১২.১ বাইনারি যোগ ও বাইনারি বিয়োগ

দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ বহুল পরিচিত। তেমনি বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে এই প্রক্রিয়া বিদ্যমান। বাইনারিতে দু'টি অংক থাকার কারণে গাণিতিক কাজ করা খুবই সহজ।

৫.১২.১ বাইনারি যোগ

দশমিক পদ্ধতির মত একই উপায়ে বাইনারি যোগ করা হয়। দুটি বাইনারি অংক যোগের জন্য চারটি নিম্নরূপ অবস্থা হয় ঃ

0+0=0
0+0=1
1+0=1
1+1=0 এবং এর সাথে হাতে 1 থাকবে। (হাতে থাকাকে ক্যারি (Carry) বলে)

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যোগ হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রক্রিয়া। কম্পিউটারসহ প্রায় সব ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রেই যোগের সাহায্যে বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা হয়। যেমন–পর্যায়ক্রমে যোগের মাধ্যমে গুণ করা যায়। আবার ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যার সাথে যোগের মাধ্যমে বিয়োগ করা হয়। আর ভাগ হলো বিয়োগেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। কাজেই শুধুমাত্র যোগের সার্কিট ব্যবহার করে অন্যান্য গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। ফলে সার্কিটের সরলতা বৃদ্ধিতে এটা খুবই সহায়ক।

উদাহরণ ১ ঃ 1100101 এর সাথে 1010101 যোগ করুন।

```
  1100101
+ 1010101
----------
 10111010
```

উদাহরণ ২ঃ 1101.1101 এর সাথে 1001.0011 যোগ করুন।

```
  1101.1101
+ 1001.0011
-----------
 10111.0000
```

৫.১২.২ বাইনারি বিয়োগ

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে বিয়োগের নিয়ম দশমিক পদ্ধতির অনুরূপ। দু'টি বাইনারি অংক বিয়োগের জন্য নিম্নোক্ত চারটি অবস্থার সৃষ্টি হয় ঃ

0–0=0 1–0=1
1–1=0 0–1=1 এবং ক্যারি 1।

এ পদ্ধতিতেও দশমিক পদ্ধতির মত ছোট সংখ্যা অর্থাৎ 1 বিয়োগ করলে ধার (Borrow) থাকে 1। এ ধার পরবর্তী স্তম্ভ থেকে নেওয়া হয়। কম্পিউটারে এই নিয়মে বিয়োগ করা হয় না। 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগের সাহায্যে বিয়োগ করা হয় যা এই অধ্যায়ের পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে।

উদাহরণ ৩ ঃ 1101 এর সাথে 0101 বিয়োগ করুন।

```
  1011
 -0101
 ----
  0110
```

উদাহরণ ৪ঃ 11010.1101 এর সাথে 01001.0011 বিয়োগ করুন।

```
  11010.1101
 -01001.0011
 -----------
  10001.0001
```

শিক্ষার্থীর কাজ	101011 এর সাথে 101111 কে যোগ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির যোগ হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রক্রিয়া। কম্পিউটারসহ প্রায় সব ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রেই যোগের সাহায্যে বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা হয়। যেমন–পর্যায়ক্রমে যোগের মাধ্যমে গুণ করা যায়। আর ভাগ হলো বিয়োগেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। কাজেই শুধুমাত্র যোগের সার্কিট ব্যবহার করে অন্যান্য গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়। ফলে সার্কিটের সরলতা বৃদ্ধিতে এটা খুবই সহায়ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১+১=০, ক্যারি=?

ক) ১ খ) ০

গ) -১ ঘ) কোনটিই নয়

২। ১-১=?

ক) ০ খ) -১

গ) ১ ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৫.১৩ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- চিহ্নযুক্ত সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন চিহ্নযুক্ত সংখ্যার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	চিহ্নযুক্ত সংখ্যা।

৫.১৩.১ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

আমাদের দৈনন্দিন গাণিতিক কাজে ধনাত্মক (Positive) ও ঋণাত্মক (Negative) সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যা বোঝানোর জন্য সংখ্যার পূর্বে চিহ্ন (Sign) অথবা + / – থাকা দরকার। চিহ্ন বা সাইনযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা বা সাইনড নম্বর (Signed number) বলা হয়।

৫.১৩.২ সাইনড নম্বর (Signed number)

দশমিক সংখ্যায় ঋণাত্মক কোন মান বোঝাতে সংখ্যাটির পার্শ্বে '-' চিহ্ন দেওয়া হয়। কম্পিউটারে ঋণাত্মক সংখ্যা বোঝানোর কোন অবকাশ নাই। বাইনারি পদ্ধতিতে সাইন বা চিহ্ন বোঝানোর জন্য সাধারণত একটি অতিরিক্ত বিট ব্যবহার করা হয়। একে চিহ্ন বিট বলে। এই চিহ্ন বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং 1 হলে সংখ্যাটিকে ঋণাত্মক ধরা হয়। নিম্নে 1 বাইট বা 8 বিট রেজিস্টারের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

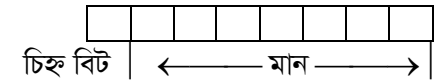

99 এর বাইনারি হলো 1100011। এখন 8 বিট রেজিস্টারে +99 এবং – 99 কীভাবে প্রকাশ করা হয় তা নিচে দেখানো হলো-



বাইনারি সংখ্যাকে কত বিটে প্রকাশ করা হবে তা নির্ভর করে রেজিস্টারের শব্দ দৈর্ঘ্যের উপর। রেজিস্টার যদি 8 বিট বা 1 বাইটের হয় তাহলে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 7 বিট ব্যবহার করা যাবে। অনুরূপভাবে, রেজিস্টার যদি 16 বিট বা 2 বাইটের হয় তাহলে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 15 বিট ব্যবহার করা যাবে। সাধারণত কম্পিউটারে 4 বিট. 8 বিট, 16 বিট, 32 বিট ইত্যাদি রেজিস্টার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উদাহরণ ঃ 1 বাইটে বা 8 বিট রেজিস্টারে যে সকল চিহ্নযুক্ত বা সাইন্ড সংখ্যা উপস্থাপন করা যায় তার ব্যাপ্তি (Range) কত?

সমাধান ঃ রেজিস্টার যদি 8 বিট বা 1 বাইটের হয় তাহলে সাইন বিটের জন্য 1 বিট এবং মানের জন্য 7 বিট ব্যবহার করা যাবে।

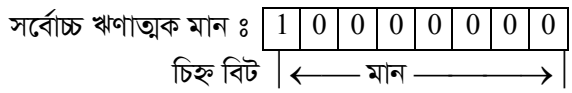

সর্বোচ্চ ধনাত্মক মান ঃ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $(01111111)_2 = 2^7 - 1 = (+127)_{10}$

চিহ্ন বিট | ←—— মান ——→

সুতরাং ব্যাপ্তি হবে – 128 থেকে +127 এর মধ্যে; মোট 256 টি বা শূন্য সহ 2^8 পৃথক মান উপস্থাপন করা যাবে।

৫.১৩.৩ আন-সাইনড নম্বর (Unsigned number)

যদি কোন রেজিস্টারে সাইন বিট ব্যবহার না করা হয় তাহলে তাকে Unsigned number বলে। ৮ বিটের মধ্যে যদি সাইন বিট ব্যবহার করা না হয় এবং সবগুলো বিট যদি মানের জন্য ব্যবহার করা হয় তার রেঞ্জ হবে ০ থেকে ২৫৫।

সর্বোচ্চ ধণাত্মক মান ঃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | $(11111111)_2 = (255)_{10}$

| ←—— মান ——→

সর্বনিম্ন ধনাত্মক মান ঃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $(00000000)_2 = (0)_{10}$

| ←—— মান ——→

শিক্ষার্থীর কাজ	৮ বিট রেজিস্টারে ১২৩ ও -১২৩ উপস্থাপন করুন।

সারসংক্ষেপ

কম্পিউটারে ধনাত্নক বা ঋণাত্মক সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য চিহ্ন বিট ব্যবহৃত হয়। এই চিহ্ন বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে ধনাত্মক এবং 1 হলে সংখ্যাটিকে ঋণাত্মক ধরা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চিহ্ন বিট 0 হলে সংখ্যাটিকে?

ক) ধনাত্মক খ) ঋণাত্মক

গ) ধনাত্মক- ঋণাত্মক ঘ) কোনটিই নয়

২। ৮ বিটের রেজিস্টারের সর্বোচ্চ ঋণাত্মক মান কত?

ক) -১২৮ খ) -২৫৬

গ) ২৫৬ ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৫.১৪ কোড ও কোডের ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন ধরনের কম্পিউটার কোডিং এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার কোডিং এর তুলনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কোডিং ,বিসিডি, আলফানিউমেরিক কোড, ইবিসিডিক কোড, ইউনিকোড।

৫.১৪.১ কোডিং এর ধারণা

গাণিতিক চিহ্ন, সংখ্যা বা অক্ষরকে চিহ্নের বিশেষ সমষ্টির সাহায্যে প্রকাশ করা হলে সেই চিহ্ন সমষ্টিকে কোড (Code) বলা হয়। আমরা জানি, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি 0 এবং 1 অংক দুটি দ্বারা গঠিত। অংক সমষ্টি দ্বারা কোন সংখ্যা কিংবা বিদ্যুতের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। এ কারণে কম্পিউটারে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য অক্ষর, চিহ্ন বা সংখ্যাকে বিভিন্ন প্রকার সংকেতে রূপান্তর করার প্রয়োজন পড়ে। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াকে এনকোডিং (Encoding) বলা হয়।

কম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রতিটি সংখ্যা, চিহ্ন, বর্ণ বা বিশেষ চিহ্ন এক একটি বিশেষ ক্যারেক্টার (Character) হিসেবে পরিচিত। কম্পিউটার কোড ব্যবহার করে প্রক্রিয়াকরণ করে এবং আউটপুট প্রকাশ করে। ফলাফল বা আউটপুট মানুষের বোধগম্য করার জন্য আবার কোডকে সংখ্যা, বর্ণ বা বিশেষ চিহ্নে রূপান্তর করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ডিকোডিং (Decoding)। কাজেই ডাটা প্রসেসিং-এর জন্য এনকোডিং এবং ডিকোডিং উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

৫.১৪.২ বিভিন্ন প্রকার কোড

ডাটা প্রক্রিয়াকরণ তথা কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য ব্যবহৃত কোডগুলো হলো:

১। বিসিডি (BCD) কোড
২। আলফানিউমেরিক (Alphanumeric) কোড
৩। অ্যাসকি কোড (ASCII code)
৪। অক্ট্যাল (Octal) কোড
৫। হেক্সাডেসিমেল (Hexadecimal) কোড
৬। ইবিসিডিক (EBCDIC) কোড
৭। ইউনিকোড (Uni Code) ইত্যাদি।

৫.১৪.৩ বিসিডি কোড

বিসিডি (BCD) শব্দের পূর্ণরূপ হলো বাইনারি কোডেড দশমিক (Binary Coded Decimal)। দশমিক (Decimal) সংখ্যার বাইনারি রূপান্তরই হলো বিসিডি কোড। এই পদ্ধতিতে দশমিক সংখ্যা 0 থেকে 9 পর্যন্ত মোট দশটি অংককে সমতুল্য 4 বিট বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করা হয়। 4 বিট দ্বারা 2^4 অর্থাৎ 16 ভিন্ন অবস্থা নির্দেশ করা যায়। তাই 16টি অবস্থা ব্যবহার করে কয়েক প্রকার BCD কোড গঠন করা সম্ভব। এর মধ্যে BCD 8421 কোড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং বহুল ব্যবহৃত। BCD 8421 কোডিং দশমিক 0 থেকে 9 পর্যন্ত অংক দশটির BCD রূপান্তর নিম্নরূপ–

দশমিক	বিসিডি (BCD)
০	০০০০
১	০০০১
২	০০১০
৩	০০১১
৪	০১০০
৫	০১০১
৬	০১১০
৭	০১১১
৮	১০০০
৯	১০০১

দেখা যাচ্ছে যে, 4 বিট BCD কোডের ক্ষেত্রে 2^4 বা 16 টি ভিন্ন অবস্থার মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম দশটি অর্থাৎ 0000 থেকে 1001 পর্যন্ত অবস্থা ব্যবহৃত হয়।

৫.১৪.৩ আলফানিউমেরিক কোড

অক্ষর (a-z, A-Z), অংক (0-9) এবং বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নসহ (+, –, ÷, × ইত্যাদি) আর কতকগুলো বিশেষ চিহ্ন (!, @, #, $, %, ^ ইত্যাদি) এর জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলা হয়। অ্যাসকি-৭ (ASCII-7) একটি আলফানিউমেরিক কোড। এ কোডের মাধ্যমে 2^7 বা 128 টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়। অনুরূপভাবে অ্যাসকি-৮ও একটি আলফানিউমেরিক কোড। এ কোডের মাধ্যমে 2^8 বা 256টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

৫.১৪.৪ অ্যাসকি কোড

ASCII একটি শব্দ সংক্ষেপ যার পূর্ণ নাম American Standard Code for Information Interchange। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত আলফানিউমেরিক কোড যা মাইক্রো কম্পিউটার, মিনি কম্পিউটারসহ অনেক মেইনফ্রেম কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়। অ্যাসকি কোড ৭টি বিট নিয়ে গঠিত। যেমন A অক্ষরটির অ্যাসকি কোড 1000001। ASCII কোড দ্বারা 2^7 অর্থাৎ 128টি বিভিন্ন অংক, অক্ষর ও চিহ্ন নির্দিষ্ট করা যায়। ASCII কোডের ডান দিকের চারটি বিটকে সংখ্যাসূচক বিট এবং বামদিকের তিনটি বিটকে জোন বলা হয়। তবে একেবারে বামে একটি প্যারিটি বিট (Parity Bit) যোগ করে অ্যাসকিকে ৮ বিট (ASCII-8)-এ রূপান্তর করা হয়।

৫.১৪.৫ ইবিসিডিক কোড

ইবিসিডিক (EBCDIC) Extended Binary Coded Information Code-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি একটি 8 বিটের কোড। সুতরাং এ কোড দ্বারা 2^8 বা 256টি অংক, অক্ষর বা চিহ্ন প্রকাশ করা যায়। এই কোডে জোন বিট হিসেবে 0 থেকে 9 পর্যন্ত, সংখ্যার জন্য 1111, A থেকে Z পর্যন্ত বর্ণের জন্য 1100, 1101, 1110 এবং বিশেষ চিহ্নের জন্য 0100, 0101, 0110 ও 0111 ব্যবহৃত হয়। দশমিক সংখ্যাগুলোকে BCD 8421 কোডের মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রত্যেক সংখ্যার সাথে 1111 যোগ করে EBCDIC কোড প্রকাশ করা হয়। যেমন– 5 কে EBCDIC-এ প্রকাশ করতে হলে 5 কে প্রথমে BCD 8421 অর্থাৎ 0101-এ প্রকাশ করে এর সাথে 1111 যোগ করতে হবে। কাজেই 5-এর EBCDIC হবে 11110101।

'A' এর জন্য EBCDIC 1100 0001

'N' এর জন্য EBCDIC 1010 1100 ইত্যাদি।

৫.১৪.৬ ইউনিকোড

ইউনিকোড হচ্ছে 16 বিট কোড। বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার এবং টেক্সটকে প্রকাশ করার জন্য ইউনিকোড ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের সকল দেশের ভাষাসমূহকে প্রকাশ করার জন্য 16 বিটের এই কোড ব্যবহার করা হয়। ইউনিকোডের সাহায্যে 2^{16}

= 65,535 কোড গ্রুপ তৈরি করা সম্ভব। ফলে যে সমস্ত দেশের ভাষাকে প্রকাশ করতে 8 বিটের বেশি কোড ব্যবহৃত হয় সে সব ক্ষেত্রে ইউনিকোড ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাইনারি সংখ্যা ও বিসিডি কোডের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কম্পিউটারে অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য অক্ষর, চিহ্ন বা সংখ্যাকে বিভিন্ন প্রকার সংকেতে রূপান্তর করার প্রয়োজন পড়ে। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াকে এনকোডিং (Encoding) বলা হয়। আর ফলাফল বা আউটপুট মানুষের বোধগম্য করার জন্য আবার কোডকে সংখ্যা, বর্ণ বা বিশেষ চিহ্নে রূপান্তর করা হয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ডিকোডিং (Decoding)।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ASCII এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক. American Standard Code for Information Interchange
খ. American Standard Code for International Interchange
গ. American Standard Code-II
ঘ. American Standard Code for Interchange

২। EBCDIC কোডিং করা হয় কোন কম্পিউটারের জন্য?

ক. IBM এর মেইনফ্রেম কম্পিউটার
খ. ENIAC কম্পিউটারের জন্য
গ. UNIVAC কম্পিউটারের জন্য
ঘ. ABC কম্পিউটারের জন্য

৩। ইউনিকোডের বৈশিষ্ট্য কোনটি

ক. 8 বিট কোড
খ. 16 বিট কোড
গ. 32 বিট কোড
ঘ. 64 বিট কোড

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৫

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। $(৫)_৮$ -কে বাইনারিতে প্রকাশ করলে কত হবে?

ক. ০০১ খ. ১১০
গ. ১০১ ঘ. ০১১

২। বাইনারি সংখ্যা ১০১১০০-এর অক্টাল মান কত?

ক. ৪৪ খ. ৫৪
গ. ৬৪ ঘ. ৭৪

৩। ১০২A৮ সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির?

ক. দশমিক খ. হেক্সাডেসিমেল
গ. বাইনারি ঘ. অক্টাল

৪। AB হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাটির বাইনারি সমকক্ষ সংখ্যা কত?

ক. ১০১০১০১১ খ. ১০০১১০০১
গ. ১০১০১০১১ ঘ. ১০০০১০০১

৫। বাইনারি সংখ্যা ১১০০১ থেকে ১০০১ এর বিয়োগফল কত?

ক. ১১০০০ খ. ১০১০০
গ. ১০০০০ ঘ. ১১০১০

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলতে বুঝায়-

i. ১০টি প্রতীক ii. ১০টি অঙ্ক iii. ভিত্তি ১০

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে C মানের সমতল্য মান হবে-

i. $(১৪)_{১০}$ ii. $(১২)_{১০}$ iii. $(১৪)_৮$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

নিলয়ের বাবার বয়স ৫৫। নিলয়ের বয়স তার বাবার বয়সের চেয়ে ৩০ বছর কম।

১। নিলয়ের বয়স বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করলে হয়-

ক.10011 খ.11001
গ.11011 ঘ. 11100

২। নিলয়ের বাবার বয়সকে সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে হয় (67)। এটি কোন সংখ্যা পদ্ধতি?

ক.দশমিক খ.বাইনারী
গ.অক্টাল ঘ.হেক্সাডেসিমেল



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. জ্ঞান দক্ষতা স্তর

১। সংখ্যা পদ্ধতি কী?
২। সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কী?
৩। অ্যাসকি (ASCII) কোড কী ?

খ. অনুধাবন দক্ষতা স্তর

১। $(২৯৮)_{৮}$ সংখ্যাটি সঠিক কি না ব্যাখ্যা করুন।
২। "বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে করা সম্ভব"-ব্যাখ্যা করুন।
৩। পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোন কোডের মাধ্যমে কোডভুক্ত করা হয়েছে-ব্যাখ্যা করুন।

গ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিলয় বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটি পরীক্ষায় যথাক্রমে 65_8, 101101_2ও 44_{16} নম্বর পেয়েছে।

ক. কোড কী? ১
খ. 7 এবং -5 যোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে নিলয়ের বাংলাতে প্রাপ্ত নম্বর ডেসিমেলে প্রকাশ করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নিলয় আইসিটি ও ইংরেজি বিষয়ের মধ্যে কোনটিতে বেশি দূর্বল? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা :

পাঠ - ৫.১	১	ঘ	২	খ			
পাঠ - ৫.২	১	ঘ	২	খ			
পাঠ - ৫.৩	১	গ	২	ক			
পাঠ - ৫.৪	১	খ	২	ক			
পাঠ - ৫.৫	১	ঘ	২	গ			
পাঠ - ৫.৬	১	ক	২	ক			
পাঠ - ৫.৭	১	খ	২	ক			
পাঠ - ৫.৮	১	ঘ	২	ক			
পাঠ - ৫.৯	১	ক	২	গ			
পাঠ - ৫.১০	১	খ	২	গ			
পাঠ - ৫.১১	১	গ	২	ঘ			
পাঠ - ৫.১২	১	ক	২	ক			
পাঠ - ৫.১৩	১	ক	২	ক			
পাঠ - ৫.১৪	১	ক	২	ক	৩	খ	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৫

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্নঃ

১ গ ২ ক ৩ খ ৪ ক ৫ গ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ ঘ ২ গ ৩ ক

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ খ ২ গ

বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস

ইউনিট ৬

ভূমিকা: আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ সমস্যা যা কম্পিউটার দিয়ে সমাধান করা হয় সেগুলো গাণিতিক ও যুক্তিমূলক অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এক্ষেত্রে কম্পিউটারের যাবতীয় গাণিতিক ও যুক্তিমুলক কাজ বিশ্লেষণের জন্য মৌলিক লজিক্যাল অপারেশন, বুলিয়ান অ্যালজেবরা, লজিক গেইট ও ডিজিটাল সার্কিট সমন্ধে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরাসহ অন্যান্য লজিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৬.১ : বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও বুলিয়ান উপপাদ্য

পাঠ - ৬.২ : সত্যক সারণি ও ডি-মরগ্যান এর উপপাদ্য

পাঠ - ৬.৩ : লজিক ফাংশন সরলীকরণ

পাঠ - ৬.৪ : লজিক গেইট ও মৌলিক গেইট

পাঠ - ৬.৫ : সার্বজনীন গেইট

পাঠ - ৬.৬ : বিশেষ গেইট

পাঠ - ৬.৭ : এডার

পাঠ - ৬.৮ : এনকোডার ও ডিকোডার

পাঠ - ৬.৯ : ফ্লিপ ফ্লপ

পাঠ - ৬.১০ : রেজিস্টার

পাঠ - ৬.১১ : কাউন্টার

পাঠ-৬.১ বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও বুলিয়ান উপপাদ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বুলিয়ান অ্যালজেবরা কি এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহের ধারণা এবং প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করতে পারবেন।
- লজিক অপারেটর কি বলতে পারবেন।
- বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাথে সম্পর্কিত ডিজিটাল ডিভাইসসমূহ সম্পর্কিত তথ্যাদি আলোকপাত করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বুলিয়ান অ্যালজেবরা , লজিক অপারেটর ।

৬.১.১ বুলিয়ান অ্যালজেবরা

বাইনারি উপাদানসমূহের গেইট দ্বারা গঠিত গাণিতিক পদ্ধতি যা '+' ও '-' এই দুই গাণিতিক চিহ্নের সাহায্যে পরিচালিত তাকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলে। ১৮৪৭ সালে ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুলি (George Boole) সর্বপ্রথম বুলিয়ান অ্যালজেবরা নিয়ে আলোচনা করেন। বুলিয়ান অ্যালজেবরা মূলত লজিকের সত্য এবং মিথ্যা এই দুই স্তরের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। বুলিয়ান অ্যালজেবরার সত্য এবং মিথ্যাকে যথাক্রমে বাইনারি 1 এবং 0 দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

৬.১.২ বুলিয়ান ধ্রুবক ও চলক

বুলিয়ান ধ্রুবক ও চলক এর মান 0 অথবা 1 হয়। ধ্রুবক-এর মান অপরিবর্তিত থাকে, তবে চলকের মান সময়-নির্ভরশীল। সংযোগ তার এবং সার্কিটের ইনপুট অথবা আউটপুটের লজিক অবস্থা নির্দিষ্টকরণের জন্য বুলিয়ান ধ্রুবক এবং চলক ব্যবহার করা হয়। ডিজিটাল সার্কিটের কোন স্থানের ভোল্টের পরিমাণের ভিত্তিতে বলা হয় যে, স্থানটি ০ স্তরে আছে না 1 স্তরে আছে।

৬.১.৩ বুলিয়ান পূরক

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় দুটি সম্ভাব্য মান 0 এবং 1 কে একটি অপরটির পূরক বলা হয়। পূরককে '–' অথবা ''' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ 1 এর পূরক 0 এবং 0 এর পূরক 1। উক্ত কথাটিকে গণিতের ভাষায় লেখা হয়, A এর পূরক হলো A' (অথবা $\overline{A}$)। অর্থাৎ

- যদি A এর মান 0 হয় তবে $A' = 1$ এবং
- যদি A এর মান 1 হয় তবে $A' = 0$ ।

৬.১.৪ বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র বুলিয়ান যোগ ও গুণ-এর সাহায্যে সমস্ত কাজ করা হয়। যোগ ও গুণের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজেবরা কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মগুলোকে বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ (Postulates) বলে। বুলিয়ান অ্যালজেবরা যোগের ক্ষেত্রে যে সব নিয়ম মেনে চলে সেগুলো নিম্নরূপ–

(১) $0 + 0 = 0$
(২) $0 + 1 = 1$
(৩) $1 + 0 = 1$
(৪) $1 + 1 = 1$

প্রথম থেকে তৃতীয় সমীকরণ আমাদের প্রচলিত যোগের নিয়মের সঙ্গে মিল আছে, কিন্তু চতুর্থ সমীকরণ অর্থাৎ $1 + 1 = 1$ এর সাথে প্রচলিত অ্যালজেবরার যোগের কোন মিল নেই। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, বুলিয়ান যোগের '+' চিহ্ন, সাধারণ অ্যালজেবরার যোগকে বুঝায় না। বুলিয়ান যোগ লজিক্যাল অ্যাডিশন (Logical Addition) বা লজিক্যাল অর (OR) অপারেশন বুঝায়।

বুলিয়ান অ্যালজেবরা গুণের ক্ষেত্রে যে সব নিয়ম মেনে চলে সেগুলো নিম্নরূপ–

(১) $0 . 0 = 0$
(২) $0 . 1 = 0$
(৩) $1 . 0 = 0$
(৪) $1 . 1 = 1$

উক্ত সমীকরণসমূহ সাধারণ অ্যালজেবরার গুণের নিয়মই মেনে চলে। বুলিয়ান গুণকে লজিক্যাল গুণ বা লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেশন (Logical AND Operation) বলা হয়।

৬.১.৪ বুলিয়ান উপপাদ্য

সাধারণত বুলিয়ান উপপাদ্যের সাহায্যে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সকল জটিল সমীকরণসমূহের সরল করা হয়। নিম্নে বুলিয়ান অ্যালজেবরার সাধারণ উপপাদ্যগুলো দেয়া হলো–

মৌলিক উপপাদ্য (Basic Theorem)	**সহায়ক উপপাদ্য (Secondary Theorem)**
• $A + 0 = A$ • $A + 1 = 1$ • $A + A = A$ • $A + \overline{A} = 1$ • $A. \overline{A} = 0$ • $A.1 = A$ • $A. 0 = 0$	• $A + A.B = A$ • $\overline{\overline{A}} = A$ বিভাজন উপাদ্য (Distributcd Thcorem) • $A(B + C) = A. B + A.C$ • $A + B.C = (A + B) (A + C)$ • $A + \overline{A} B = A + B$
বিনিময় উপপাদ্য (Commulative Theorem)	**ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য (De-Morgan's Theorem)**
• $A + B = B + A$ • $A.B = B. A$	• $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$ • $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$
অনুষঙ্গ উপপাদ্য (Associative Thorem)	
• $A + (B + C) = (A + B) + C$ • $A.(B.C) = (A.B).C$	

শিক্ষার্থীর কাজ	বুলিয়ান চলক ও ধ্রুবকের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সত্য ও মিথ্যার উপর নির্ভর করে যে অ্যালজেবরার তৈরি হয়েছে তাকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলা হয়। সাধারণত এই সত্যকে বাইনারি অংক ১ এবং মিথ্যাকে ০ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মূলত ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বুলিয়ান অ্যালজেবরা যোগের ক্ষেত্রে যে সব নিয়ম মেনে চলে-

ক) $0 + 0 = 0$ খ) $0 + 1 = 1$

গ) $1 + 0 = 1$ ঘ) সবগুলো

২। বুলিয়ান অ্যালজেবরা গুণের ক্ষেত্রে যে সব নিয়ম মেনে চলে-

ক) $0 . 0 = 0$ খ) $0 . 1 = 0$

গ) $1 . 0 = 0$ ঘ) সবগুলো

পাঠ-৬.২ সত্যক সারণি ও ডি মরগ্যান এর উপপাদ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সত্যক সারণি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন এবং সত্যক সারণির ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখাতে পারবেন।
- ডি মরগ্যান এর উপপাদ্য বিশ্লেষণ ও প্রমাণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সত্যক সারণি, ডি মরগ্যান এর উপপাদ্য।

৬.২.১ সত্যক সারণি

বুলিয়ান চলকের মানের সম্ভাব্য সব বিন্যাসের জন্য বুলিয়ান ফাংশনের যে মান হয় তা প্রকাশ করার টেবিলকে ট্রুথ টেবিল (Truth Table) বা সত্যক সারণি বলে। অর্থাৎ যে সারণিতে বুলিয়ান বীজগণিতের সূত্রে ব্যবহৃত চলকের সম্ভাব্য মান, মানের জন্য সূত্রের বামদিক এবং ডানদিকের অংশ সমান প্রমাণ করা যায়, সে সারণিকে সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিল বলা হয়। যদি সত্যক সারণিতে N সংখ্যক চলক থাকে তবে ইনপুট এর অবস্থা হবে 2^n সংখ্যক। যেমন কোন লজিক বর্তনীতে দু'টি ইনপুট চলক A ও B হলে ইনপুটের অবস্থা হবে ২^২ = ৪টি। নিম্নে $A + \overline{A}B = A+ B$ সূত্রটিকে নিচের সত্যক সারণিতে প্রকাশ করে দেখানো হলো-

A	B	$\overline{A}$	$\overline{A}B$	$A + \overline{A}B$	A+ B
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1

উপরিউক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় , $A + \overline{A}B = A+ B$

৬.২.২ ডি মরগ্যানের উপপাদ্য

ব্রিটিশ গণিতবিদ ডি-মরগ্যান (De-Morgan) দুই চলকের জন্য নিম্নলিখিত দুটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপপাদ্য আবিষ্কার করেন।

- প্রথম উপপাদ্য ঃ $\overline{A + B} = \overline{A} . \overline{B}$
- দ্বিতীয় উপপাদ্য ঃ $\overline{A . B} = \overline{A} + \overline{B}$

সত্যক সারণির সহায়তায় অতি সহজে উক্ত উপপাদ্য দুটি প্রমাণ করা যায়। বড় বড় লজিক রাশিমালা সরলীকরণের জন্য উপপাদ্য দুটি বিশেষ সহায়ক।

৬.২.৩ ডি মরগ্যানের উপপাদ্যের প্রমাণ

দুই লজিক্যাল চলকের জন্য ডি মরগ্যানের উপপাদ্য

ট্রুথ টেবিলের সহায়তায় যে কোন বুলিয়ান উপপাদ্য সহজে প্রমাণ করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে প্রমাণের জন্য সূত্রের বাম দিক ও ডান দিকের চলকসমূহের সম্ভাব্য মান ট্রুথ টেবিলে লেখা হয়। চলকসমূহের সকল মানের জন্য সূত্রের বাম দিক ও ডান দিকের মান একরূপ হলে সূত্রটি প্রমাণিত হয়। নিম্নে দু'টি চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের সূত্র প্রমাণ করা হলো-

A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	A+B	$\overline{A+B}$	$\overline{A}.\overline{B}$	AB	$\overline{A.B}$	$\overline{A}+\overline{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিল

উপরের ট্রুথ টেবিল হতে সহজে দেখা যায় যে, A ও B এর সকল মানের জন্য–

$$\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$$

$$\overline{A.B} = \overline{A}+\overline{B}$$

সুতরাং ডি মরগ্যানের সূত্র দুটি প্রমাণিত হলো।

দুইয়ের অধিক যে কোন সংখ্যক লজিক্যাল চলকের জন্য ডি মরগ্যানের উপপাদ্য

দুইয়ের অধিক যে কোন সংখ্যক লজিক্যাল চলক বা ভ্যারিয়েবলের জন্য ডি মরগ্যানের উপপাদ্য ব্যবহার করা যায়। নিম্নে তিনটি চলকের জন্য উপপাদ্য দুইটি দেয়া হলো-

$$\overline{A+B+C} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$$

$$\overline{A.B.C} = \overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$$

তিনটি চলক A, B ও C এর জন্য নিম্নে সত্যক সারণির সাহায্যে ডি মরগ্যানের উপপাদ্যের প্রমাণ ঃ

A	B	C	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{C}$	A+B+C	$\overline{A+B+C}$	$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$	ABC	$\overline{ABC}$	$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0

সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিল

উপরের ট্রুথ টেবিল হতে সহজে দেখা যায় যে, A, B ও C এর সকল মানের জন্য–

$$\overline{A+B+C} = \overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$$

$$\overline{A.B.C} = \overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$$

সুতরাং তিনটি বুলিয়ান চলকের জন্য ডি মরগ্যানের সূত্র দুটি প্রমাণিত হলো।

n সংখ্যক বুলিয়ান চলকের জন্য ডি মরগ্যানের উপপাদ্যঃ

n সংখ্যক বুলিয়ান চলকের জন্য ডি মরগ্যানের উপপাদ্য দুইটি নিম্নরূপ:

$$\overline{A_1 + A_2 + A_3 = \ldots\ldots\ldots A_n} = \overline{A_1}\cdot\overline{A_2}\cdot\overline{A_3}\ldots\ldots\ldots\overline{A_n}$$

$$\overline{A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 = \ldots\ldots\ldots A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3}\ldots\ldots\ldots + \overline{A_n}$$

শিক্ষার্থীর কাজ	$A + A\ \overline{B}$ এর সত্যক সারণি তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

ডিজিটাল লজিক সার্কিটের ইনপুটমান বা মানসমূহের উপর ভিত্তি করে আউটপুট পরিবর্তিত হয়। যে ধরনের সারণির সাহায্যে ইনপুট ও আউটপুটের মানের বিন্যাসকে প্রকাশ করা হয় তাকে সত্যক সারণি বলে। লজিক কার্যক্রমকে সহজে বোঝানোর জন্যই সত্যক সারণি ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। n-সংখ্যক চলকের জন্য সত্যক সারণিতে ইনপুটের বিন্যাস কি হবে?

ক) 2^n খ) n

গ) 2^{n2} ঘ) সবগুলো

২। কতটি চলকের জন্য ডি মরগ্যানের উপপাদ্য ব্যবহার করা যায় ?

ক) ২ খ) ৩

গ) ৪ ঘ) সবগুলো

পাঠ-৬.৩ লজিক ফাংশন সরলীকরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লজিক ফাংশন কি এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লজিক ফাংশন সরলীকরণ এর নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	লজিক ফাংশন

৬.৩.১ লজিক ফাংশন

লজিক্যাল ফাংশনগুলো লজিক গেটের মাধ্যমে তৈরী করা হয় এবং বাস্তবায়ন করা হয়। এজন্য লজিক ফাংশনগুলো সহজ সরল হলে লজিক গেটের ব্যবহার সহজতর হয়। সাধারণত লজিক ফাংশনে লজিক অপারেটরের সংখ্যা কম হলে গেটের সংখ্যাও কমে যায়। বুলিয়ান উপপাদ্যের সাহায্যে লজিক ফাংশনের সরলীকরণ করা হয়।

৬.৩.২ লজিক ফাংশন সরলীকরণের নিয়ম

বুলিয়ান রাশিমালাকে সরলীকরণের ফলে লজিক গেটের সংখ্যা কমে বলে সময় ও খরচ দুটোই কমে যায়। মূলত বুলিয়ান রাশিমালাকে সরল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ ব্যবহৃত হয়। তবে সরলীকরণের ক্ষেত্রে কতকগুলো নিয়ম মেনে সরল করতে হয়। যেমন-

- লজিক ফাংশন বাম হতে ডান দিকে সরল করতে হয়।
- প্রথম বন্ধনীর কাজ আগে করতে হয়।
- পূরক অপারেশনের কাজ শুরুতে করতে হয়।
- এরপর সকল অ্যান্ড (.) অপারেশনের কাজ করতে হয়।
- এরপর সকল অর (+) অপারেশনের কাজ করতে হয়।

৬.৩.৩ লজিক ফাংশন সরলীকরণের উদাহরণঃ

উদাহরণ ১ঃ

$$
\begin{aligned}
&X\overline{Y}Z + \overline{X}\,\overline{Y}Z + XYZ \\
&= X\overline{Y}Z + XYZ + \overline{X}\,\overline{Y}Z \\
&= XZ\left(\overline{Y} + Y\right) + \overline{X}\,\overline{Y}Z \\
&= XZ.1 + \overline{X}\,\overline{Y}Z \qquad \left[\because A + \overline{A} = 1\right] \\
&= Z\left(X + \overline{X}\,\overline{Y}\right) \\
&= Z(X + \overline{X})(X + \overline{Y}) \\
&= Z(X + \overline{Y}) \\
&= XZ + \overline{Y}Z
\end{aligned}
$$

উদাহরণ ২ঃ

$$
\begin{aligned}
&ABC + A\overline{B}C + \overline{A} \\
&= AC\left(B + \overline{B}\right) + \overline{A} \\
&= AC.1 + \overline{A} \quad \left[\because A + \overline{A} = 1\right] \\
&= AC + \overline{A} \quad \left[\because A.1 = A\right] \\
&= \overline{A} + AC \\
&= (\overline{A} + A)\left(A + C\right) \\
&= \overline{A} + C
\end{aligned}
$$

উদাহরণ ৩ঃ

$$(A+B)(A+\overline{B})(\overline{A}+C)$$
$$=(A.A+A\overline{B}+AB+B.\overline{B})(\overline{A}+C)$$
$$=(A+A\overline{B}+AB)(\overline{A}+C)\ [\because A.\overline{A}=0;\ AA=A]$$
$$=[A(1+\overline{B})+AB]\ (\overline{A}+C)$$
$$=(A+AB)(\overline{A}+C) \qquad [\because 1+\overline{A}=1]$$
$$=[A(1+B)](\overline{A}+C)$$
$$=A(\overline{A}+C)$$
$$=A.\overline{A}+AC$$
$$=0+AC$$
$$=AC$$

উদাহরণ ৪ঃ

$$\overline{(A+B+\overline{C})}+BC$$
$$=\overline{A}.\overline{B}.\overline{\overline{C}}+\overline{B}C \qquad [\because \overline{A+B}=\overline{A}.\overline{B}.]$$
$$=\overline{A}.\overline{B}.C+\overline{B}C \qquad [\because \overline{\overline{A}}=A]$$
$$=\overline{B}C(\overline{A}+1)$$
$$=\overline{B}C \qquad [\because \overline{A}+1=1]$$

শিক্ষার্থীর কাজ	$A\overline{B}\overline{C}+A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}BC+ABC+A\overline{B}C$ ফাংশনটির সরল করুন।

সারসংক্ষেপ

ডিজিটাল বা লজিক সার্কিটের ইনপুট ও আউটপুট বিশ্লেষনের মাধ্যমে যে ধরনের রাশিমালা পাওয়া যায় তা লজিক্যাল ফংশন নামে পরিচিত। এই ফাংশনগুলোকে সরলীকরণের ফলে লজিক গেটের সংখ্যা কমে বলে সময় ও খরচ দুটোই কমে যায়। মূলত বুলিয়ান রাশিমালাকে সরল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বুলিয়ান উপপাদ্যসমূহ ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। লজিক ফাংশন _____ দিকে সরল করতে হয়।

ক) বাম হতে ডান খ) ডান হতে বামে
গ) ডান হতে ডান ঘ) সবগুলোই

২। লজিক ফাংশন সরলীকরণের ক্ষেত্রে কোনটির কাজ আগে করতে হয়?

ক) পূরক খ) অ্যান্ড
গ) অর ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৬.৪ লজিক গেইট ও মৌলিক গেইট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লজিক গেইট সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মৌলিক লজিক গেইটসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	লজিক গেইট, মৌলিক লজিক গেইট।

৬.৪.১ লজিক গেইট

যে বৈদ্যুতিক সার্কিট কোন বুলিয়ান প্রক্রিয়া (যোগ, গুণ) সম্পাদন করে বা কোন বুলিয়ান অপেক্ষক রূপায়িত করে তাকে লজিক গেইট বলে। সহজ কথায় বলা যায়, যে সকল ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সার্কিট যুক্তিভিত্তিক সংকেতের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে সে সকল সার্কিটকে লজিক গেইট বলে।

৬.৪.২ মৌলিক লজিক গেইট

ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত গেইট মূলত কাজ করে তাদেরকে মৌলিক গেইট বলা হয়। কম্পিউটার বা অন্যান্য ডিজিটাল পদ্ধতির মূলে রয়েছে তিনটি মৌলিক গেইট। যথা–

১। অর গেইট (OR Gate)
২। অ্যান্ড গেইট (AND Gate) ও
৩। নট গেইট (NOT Gate)

অর গেইট

এই গেইট যৌক্তিক যোগ পদ্ধতিতে কাজ করে। অর্থাৎ যে গেইটের দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকে এবং আউটপুট ইনপুটসমূহের যৌক্তিক যোগফলের সমান তাকে অর গেইট বলে। কমপক্ষে একটি ইনপুট 1 হলে অর গেইটের আউটপুট 1 হবে, অন্যথায় আউটপুট 0 হবে। দুইটি ইনপুট সংকেত A ও B এবং আউটপুট X হলে অর গেইটের সমীকরণ, সাংকেতিক সংকেত ও সত্যক সারণি হবে নিম্নরূপ ঃ

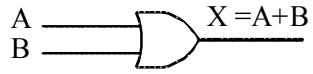

চিত্র ৬.৪.১ : অর গেইট এর প্রতীক

আউটপুট সমীকরণ ঃ X = A OR B
= A+B

A	B	X = A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

অর গেইটের সত্যক সারণি

অনুরূপভাবে, তিন ইনপুট বিশিষ্ট অর গেইটের ক্ষেত্রে-

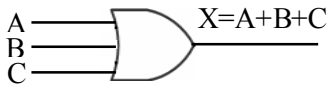

চিত্র ৬.৪.২ : তিন ইনপুট বিশিষ্ট অর গেইট

A	B	C	X = A + B +C
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

সত্যক সারণি

অ্যান্ড গেইট

এই গেইট যৌক্তিক গুণন পদ্ধতিতে কাজ করে। অর্থাৎ যে গেইটের দুই বা ততোধিক ইনপুট থাকে এবং আউটপুট ইনপুটগুলোর যৌক্তিক গুণফলের সমান হয় তাকে অ্যান্ড গেইট বলে। সবগুলো ইনপুট 1 হলে অ্যান্ড গেইটের আউটপুট 1 হবে; অন্যথায় আউটপুট 0 হবে। নিচে দুই ইনপুট বিশিষ্ট অ্যান্ড গেইটের বর্তনী এবং সত্যক সারণি দেখানো হলো:



চিত্র ৬.৪.৩ : দুই ইনপুট বিশিষ্ট অ্যান্ড গেইট

A	B	X = A.B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

অ্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

অনুরূপভাবে তিন ইনপুট বিশিষ্ট অ্যান্ড গেইটের ক্ষেত্রে–

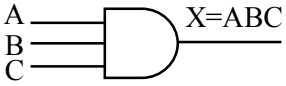

চিত্র ৬.৪.৪: তিন ইনুপট বিশিষ্ট অ্যান্ড গেইট

A	B	C	X= A.B.C
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

সত্যক সারণি

নট গেইট

এই গেইট যৌক্তিক উল্টানো পদ্ধতিতে কাজ করে। যে গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে তাকে নট গেইট বলে। এই গেইটের ইনপুট 1 হলে আউটপুট হবে 0 এবং ইনপুট 0 হলে আউটপুট হবে 1।

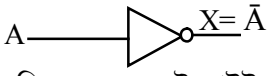

চিত্র ৬.৪.৫ : নট গেইট

A	$X = \overline{A}$
1	0
0	1

নট গেইটের সত্যক সারণি

শিক্ষার্থীর কাজ	লজিক মৌলিক গেইটসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ

যে বৈদ্যুতিক সার্কিট কোন বুলিয়ান প্রক্রিয়া (যোগ, গুণ) সম্পাদন করে বা কোন বুলিয়ান অপেক্ষক রূপায়িত করে তাকে লজিক গেইট বলে। লজিক গেইটের এক বা একাধিক ইনপুট এবং একটি মাত্র আউটপুট থাকে যেখানে ইনপুটসমূহের উপর নির্ভর করে আউটপুট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে কোন গেইটে?

ক) অ্যান্ড খ) অর

গ) নট ঘ) সবগুলোই

২। দুই বা ততোধিক ইনপুট এবং আউটপুট ইনপুটগুলোর যৌক্তিক গুণফলের সমান হয় কোন গেইটে?

ক) অ্যান্ড খ) অর

গ) নট ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৬.৫ সার্বজনীন গেইট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সার্বজনীন গেইট (Universal Gate) সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সার্বজনীন গেইট (Universal Gate) দিয়ে মৌলিক লজিক গেইটসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সার্বজনীন গেইট।

৬.৫.১ সার্বজনীন গেইট

যে সকল গেইটের মাধ্যমে অ্যান্ড, অর ও নট গেইটের ফাংশনকে প্রতিস্থাপন করা যায় তাদেরকে সার্বজনীন গেইট বলা হয়। অর, অ্যান্ড এবং নট এই তিনটি মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে সকল প্রকার লজিক সার্কিট বা যুক্তি বর্তনী তৈরি করা যায়। আবার শুধুমাত্র ন্যান্ড গেইট ব্যবহার করেই যে কোন লজিক সার্কিট বা যুক্তি বর্তনী তৈরি করা যায়। এর কারণ ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর, অ্যান্ড এবং নট গেইট বাস্তবায়ন সম্ভব। একইভাবে শুধু নর গেইট দিয়েই অর, অ্যান্ড এবং নট গেইট তথা যে কোন লজিক সার্কিট বা যুক্তি বর্তনী তৈরি করা সম্ভব। এ জন্য এই গেইট দুটিকে বলা হয় সার্বজনীন গেইট।

৬.৫.২ ন্যান্ড গেইট

ন্যান্ড (NAND) গেইট হচ্ছে অ্যান্ড গেইট ও নট গেইটের সমন্বিত রূপ। অ্যান্ড গেইটের আউটপুটকে নট গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে তখন তাকে বলা হয় ন্যান্ড গেইট। অ্যান্ড গেইট যে কাজ করে ন্যান্ড গেইট তার বিপরীত কাজ করে। নিচে ২ ইনপুট বিশিষ্ট ন্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি ও চিত্র দেখানো হলো–

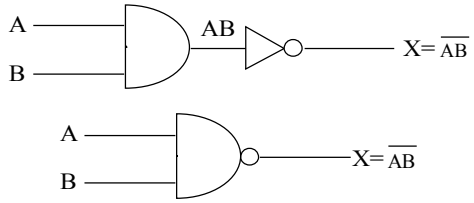

চিত্র ৬.৫.১ : ন্যান্ড গেইট

A	B	AB	$X = \overline{AB}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

ন্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

৬.৫.৩ নর গেইট

নর (NOR) গেইট হচ্ছে অর গেইট ও নট গেইটের সমষ্টি। অর গেইটের আউটপুটকে নট গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে নর গেইট তৈরি হয়। অর গেইট যে কাজ করে নর গেইট তার বিপরীত কাজ করে। নিচে ২ ইনপুট বিশিষ্ট নর গেইটের সত্যক সারণি ও চিত্র দেখানো হলো :

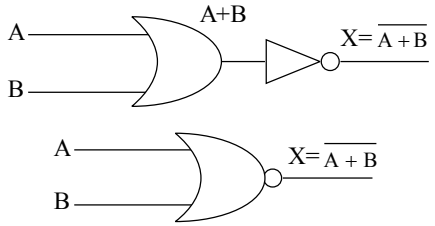

চিত্র ৬.৫.২ : নর গেইট

A	B	X = A + B	$X = \overline{A+B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

নর গেইটের সত্যক সারণি

৬.৫.৪ ন্যান্ড (NAND) গেইট দিয়ে মৌলিক গেইটসমূহের বাস্তবায়ন

- **নট গেইটের ক্ষেত্রে ঃ** যদি ন্যান্ড গেইটের ইনপুটসমূহ একই ধরনের হয় সেক্ষেত্রে ন্যান্ড গেইট নট গেইটের মত কাজ করবে। অর্থাৎ, যদি ইনপুটদ্বয় A হয় তাহলে আউটপুট $X = \overline{A.A} = \overline{A}$ হবে।

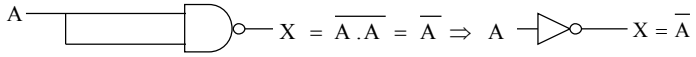

- **অ্যান্ড গেইটের ক্ষেত্রে ঃ** চিত্রে দুটি ন্যান্ড গেইটের ইনপুট A ও B এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে আউটপুট AB হয়। অর্থাৎ, ন্যান্ড গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইটের কাজ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে-

আউটপুট $X = \overline{AB}.\overline{AB} = \overline{\overline{AB}} = AB$

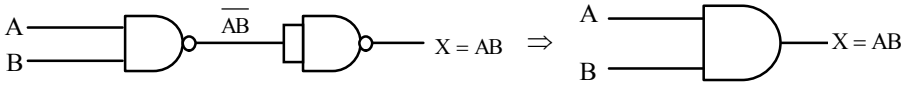

- **অর গেইট ঃ** তিনটি ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইটের বাস্তবায়ন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রথম দুইটি ন্যান্ড গেইট,নট গেইট হিসেবে কাজ করে যাতে সর্বশেষ আউটপুট $X = \overline{\overline{A}.\overline{B}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}} = A + B$ হয়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো-

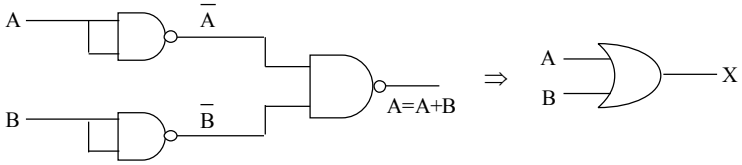

৬.৫.৫ নর গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন

- **নট গেইটের ক্ষেত্রে ঃ** যদি নর গেইটের ইনপুটসমূহ একই ধরনের হয় সেক্ষেত্রে নর গেইট নট গেইটের মত কাজ করবে। অর্থৎ যদি ইনপুটদ্বয় A হয় তাহলে আউটপুট, আউটপুট $X = \overline{A + A} = \overline{A}$ হবে।



- **অর গেইটের ক্ষেত্রে ঃ** চিত্রে দুটি নর গেইটের ইনপুট A ও B এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে আউটপুট A+ B হয়। অর্থাৎ নর গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইটের কাজ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে -

আউটপুট $X = \overline{\overline{A+B}} + \overline{\overline{A+B}} = \overline{\overline{A+B}} = A+B$

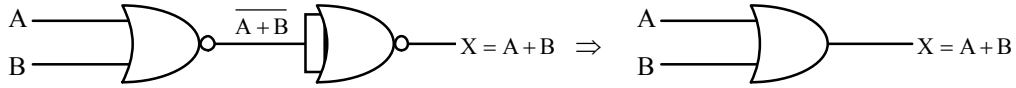

- **অ্যান্ড গেইটের ক্ষেত্রে ঃ** তিনটি নর গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইটের বাস্তবায়ন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রথম দুইটি নর গেইট নট গেইট হিসেবে কাজ করে যাতে সর্বশেষ আউটপুট $X = \overline{\overline{A+A} + \overline{B+B}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}} = \overline{\overline{A}}.\overline{\overline{B}} = AB$ হয়। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো-

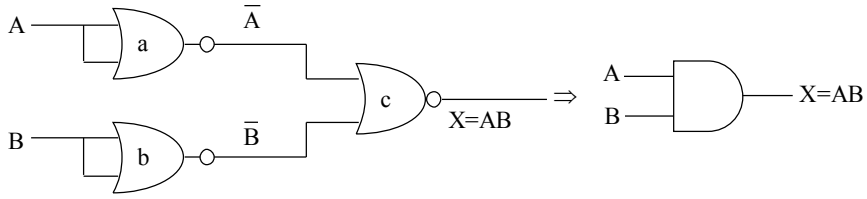

অতএব, নর ও অ্যান্ড গেইট দিয়ে সকল মৌলিক গেইটসমূহ বাস্তবায়ন করা যায় বলে এই দুটি গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	তিন ইনপুট বিশিষ্ট নর ও ন্যান্ড গেইটসমূহের সত্যক সারণী তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

যে সকল গেইটের মাধ্যমে অ্যান্ড, অর ও নট গেইটের ফাংশনকে প্রতিস্থাপন করা যায় তাদেরকে সার্বজনীন গেইট বলা হয়। নর ও অ্যান্ড গেইট দিয়ে সকল প্রকার লজিক সার্কিট তৈরি করা যায় বলে এই দুটি গেইটকে সার্বজনীন গেইট বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ন্যান্ড গেইট কোন কোন গেইটের সমন্বিত রূপ?

ক) অ্যান্ড গেইট ও নট গেইট
খ) অ্যান্ড গেইট ও অর গেইট
গ) অর গেইট ও নট গেইট
ঘ) সবগুলোই

২। NAND গেইট গঠিত হয়–

i. AND
ii. OR
iii. NOT

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক.i ও ii
খ.i ও iii
গ.ii ও iii
ঘ.i, ii ও iii

পাঠ-৬.৬ বিশেষ গেইট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিশেষ গেইট সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মৌলিক লজিক গেইট ব্যবহার করে বিশেষ গেইটগুলোর কার্যাবলী বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	এক্স অর গেইট (XOR) , এক্স নর গেইট (XNOR) ।

৬.৬.১ বিশেষ গেইট

এক্স অর গেইট (XOR) এবং এক্স নর গেইট (XNOR), এই গেইট দুটিকে বিশেষ গেইট বলা হয়। নিচে এই দুইটি গেইট নিয়ে আলোচনা করা হল-

৬.৬.২ এক্স অর গেইট (Exclusive OR (XOR) Gate)

Exclusive OR গেইটকে সংক্ষেপে এক্স অর গেইট বলে। মৌলিক গেইট দিয়ে এক্স অর গেইট তৈরি করা হয় বলে একে প্রকৃত অর গেইট বলে। এটি অ্যান্ড, অর, নট, ন্যান্ড, নর ইত্যাদি গেইটের সাহায্যেও তৈরি করা যায়। এই গেইটের দুটি ইনপুট সমান না হলে আউটপুট 1 হয়, অন্যথায় আউটপুট 0 হবে। নিচে এক্স অর গেইটের চিত্র ,সত্যক সারণি ও আউটপুট সমীকরণ দেখানো হলো:

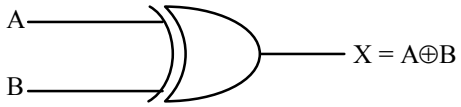

চিত্র ৬.৬.১ : এক্স অর গেইট

A	B	X = A⊕B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

এক্স অর গেইটের সত্যক সারণি

এক্স অর গেইটের আউটপুট : $X = A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}$ এখানে'$\oplus$' চিহ্ন দ্বারা এক্স অর ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে।

মৌলিক গেইট দিয়ে এক্স অর গেইট:

মৌলিক গেইট (অ্যান্ড, অর, নট) দিয়ে এক্স অর গেইট তৈরি করা যায়। নিচে তা দেখানো হল-

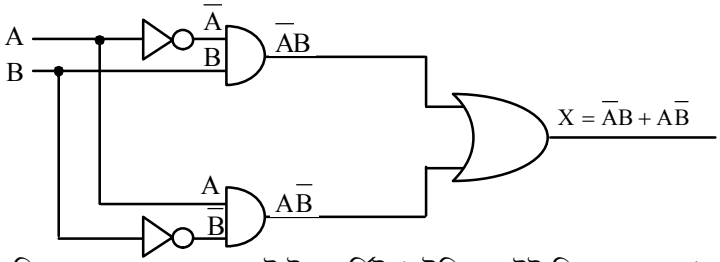

চিত্র ৬.৬.২ : এক্স অর গেইটের সার্কিট (মৌলিক গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন)

৬.৬.৩ এক্স নর গেইট বা Exclusive NOR (XNOR) Gate

Exclusive NOR গেইটকে সংক্ষেপে এক্স নর (**XNOR**) গেইট বলে। এক্স অর গেইটের আউটপুটকে নট গেইট দিয়ে প্রবাহিত করলে অর্থাৎ এক্স অর গেইট এবং নট গেইটের সমন্বয়ে এক্স নর গেইট গঠিত হয়। এক্স অর গেইট যে কাজ করে এই গেইট তার বিপরীত কাজ করে অর্থাৎ দুইটি ইনপুট সমান হলেই কেবলমাত্র আউটপুট 1 হবে, অন্যথায় আউটপুট 0 হবে। নিচে এক্স নর গেইটের চিত্র, সত্যক সারণি ও আউটপুট সমীকরণ দেখানো হলো ঃ

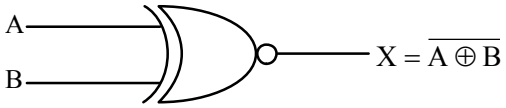

চিত্র ৬.৬.৩ : এক্স নর গেইট

এক্স নর গেইটের আউটপুট $X = \overline{A \oplus B} = \overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$

A	B	$X = \overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

এক্স নর গেইটের সত্যক সারণি

মৌলিক গেইট দিয়ে এক্স নর গেইট:

মৌলিক গেইট (অ্যান্ড, অর, নট) দিয়ে এক্স নর গেইট তৈরি করা যায়। নিচে তা দেখানো হল-

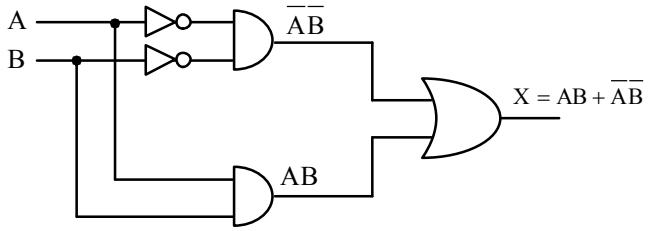

চিত্র ৬.৬.৪: এক্স নর গেইটকে মৌলিক গেইট দিয়ে বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীর কাজ	তিন ইনপুট বিশিষ্ট এক্স অর ও এক্স নর গেইটের সত্যক সারণী তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

এক্স অর ও এক্স নর এই দুইটি গেইটকে বিশেষ গেইট বলা হয়। এক্স অর গেইটের দুটি ইনপুট সমান না হলে আউটপুট 1 হয়, অন্যথায় আউটপুট 0 হবে। অন্যদিকে এক্স নর গেইটের দুটি ইনপুট সমান না হলে আউটপুট 0 হয়, অন্যথায় আউটপুট 1 হবে। তবে মৌলিক গেইট (অ্যান্ড, অর, নট) দিয়ে এক্স অর ও এক্স নর গেইট তৈরি করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ধরনের গেইটে দুটি ইনপুট একই মানের জন্য আউটপুট ০ এবং ভিন্ন মানের জন্য আউটপুট ১ হয়?

ক. AND খ. OR

গ. XOR ঘ. XNOR

২। XOR গেইটের আউটপুটের সমীকরণ কোনটি ?

ক. $Y = \overline{A}\ \overline{B} + A$ খ. $Y = A\overline{B} + A$

গ. $Y = A\overline{B} + \overline{A}B$ ঘ. $Y = \overline{A}\ \overline{B} + AB$

পাঠ-৬.৭ এডার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এডার সার্কিট সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
- হাফ এডার দিয়ে ফুল এডার এর কার্যাবলী, লজিক ফাংশন ও চিত্র উপস্থাপন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	এডার, হাফ এডার, ফুল এডার।

৬.৭.১ এডার

কম্পিউটারের যাবতীয় গাণিতিক কাজ বাইনারি যোগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। গুণ হলো বার বার যোগ করা এবং ভাগ হলো বার বার বিয়োগ করা। আবার পূরক পদ্ধতিতে বাইনারি যোগের মাধ্যমেই বিয়োগ করা যায়। কাজেই যোগের মাধ্যমে গুণ, বিয়োগ, ভাগ ইত্যাদির কাজ করা যায়। কম্পিউটার সিস্টেমে যে সমবায় সার্কিট দ্বারা যোগ করা যায় তাকে বলে এডার। ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সে দু ধরনের এডার আছে। যথা-

১। হাফ-এডার ও
২। ফুল-এডার

৬.৭.২ হাফ এডার

দুইটি বাইনারি বিট যোগ করার জন্য যে বর্তনী ব্যবহার করা হয় তাকে অর্ধযোগের বর্তনী বলা হয়। দুইটি বিট A ও B যোগ করে এই বর্তনী হতে যোগফল (S) এবং হাতের সংখ্যা বা ক্যারি (C) পাওয়া যায়। ক্যারি যোগের ব্যবস্থা থাকে না বলে এই বর্তনীকে অর্ধযোগের বর্তনী বলে। নিম্নে হাফ এ্যাডার এর সত্যক সারণী , আউটপুট সমীকরণ, লজিক সার্কিট ও ব্লক ডায়াগ্রাম দেয়া হলো ঃ

সত্যক সারণি ঃ

ইনপুট		আউটপুট	
A	B	S	**C**
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

আউটপুট সমীকরণ ঃ

যোগফল, $S = \bar{A}B + A\bar{B}$

$= A \oplus B$

এবং ক্যারি, C = AB

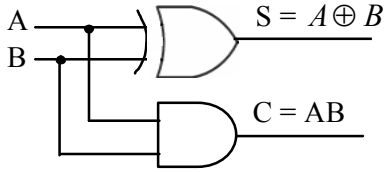

চিত্র ৬.৭.১ : হাফ অ্যাডারের লজিক সার্কিট

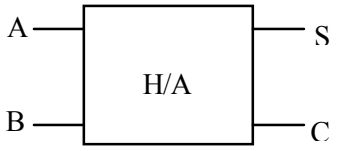

চিত্র ৬.৭.২ : হাফ অ্যাডারের সাংকেতিক চিহ্ন

৬.৭.৩ ফুল এডার বা পূর্ণযোগের বর্তনী

যে বর্তনীতে ক্যারিসহ দুইটি বিট যোগ করার মত ব্যবস্থা থাকে, তাকে পূর্ণ যোগের বর্তনী বা ফুল এডার বলে। এই বর্তনীতে দুইটি বিটের জন্য দুইটি ইনপুট সংকেত (A, B) ও একটি গ্রহণ ক্যারি C_i থাকে এবং যোগফল (S) ও ১টি আউটপুট ক্যারি C_o থাকে। নিম্নে ফুল এ্যাডার এর লজিক সার্কিট, ব্লক ডায়াগ্রাম, আউটপুট সমীকরণ ও সত্যক সারণী দেয়া হল-

সত্যক সারণী ঃ

ইনপুট সংকেত			আউটপুট	
A	B	Ci	S	Co
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

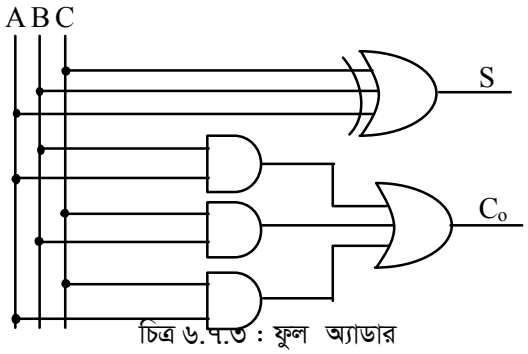

চিত্র ৬.৭.৩ : ফুল অ্যাডার

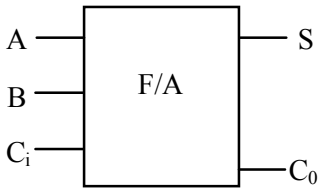

চিত্র ৬.৭.৪ : ফুল অ্যাডারের ব্লক ডায়াগ্রাম

আউটপুট সমীকরণ ঃ

যোগফল, $S = \overline{A}\overline{B}Ci + \overline{A}B\overline{C}i + A\overline{B}\overline{C}i + ABCi$

$= \overline{A}(\overline{B}Ci + B\overline{C}i) + A(\overline{B}\overline{C}i + BCi)$

$= \overline{A}(B \oplus Ci) + A(\overline{B \oplus Ci})$

$= A \oplus B \oplus Ci$

এবং ক্যারি,

$Co = \overline{A}BCi + A\overline{B}Ci + AB\overline{C}i + ABCi$

$= \overline{A}BCi + ABCi + A\overline{B}Ci + ABCi + AB\overline{C}i + ABCi$

$= BCi(\overline{A} + A) + ACi(\overline{B} + B) + AB(Ci + \overline{C}i)$

$= BCi + ACi + AB \qquad [\because \overline{C}i + Ci = 1]$

৬.৭.৪ অর্ধযোগের বর্তনী দ্বারা পূর্ণযোগের বর্তনী বাস্তবায়ন

হাফ অ্যাডারের সাহায্যে ফুল এডার তৈরীর জন্য ২টি Half-adder এবং Carry যোগের জন্য ১টি অতিরিক্ত অর গেইটের প্রয়োজন হয়। ধরি, একটি পূর্ণযোগের বর্তনীর ইনপুট সংকেত ও ক্যারি যথাক্রমে A , B ও C_i এবং আউটপুট বা যোগফল S এবং ক্যারি C_O। নিম্নে হাফ এডার দ্বারা ফুল এডার বাস্তবায়নের ব্লক ডায়াগ্রাম দেয়া হলো-

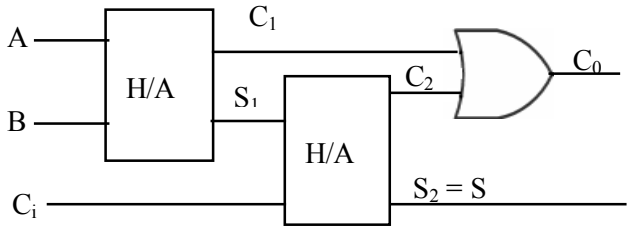

চিত্র ৬.৭.৫ : হাফ এডার দ্বারা ফুল এডার বাস্তবায়নের ব্লক ডায়াগ্রাম

প্রথম হাফ-অ্যাডারের ইনপুট A ও B থেকে যোগফল S_1 ও ক্যারি C_1 পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হাফ-অ্যাডারে ইনপুট হিসেবে ১ম অ্যাডারের যোগফল S_1 ও ক্যারি C_i দেয়া হয় , যার থেকে যোগফল S_2 ও ক্যারি C_2 পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হাফ অ্যাডারের যোগফলই হবে ফুল অ্যাডারের যোগফল। ১ম ও ২য় হাফ অ্যাডারের ক্যারি যোগ করে পাওয়া যাবে ফুল অ্যাডারের ক্যারি।

চিত্র হতে, ফুল-অ্যাডারের আউটপুট-

যোগফল, $S = A \oplus B \oplus C_i$ এবং ক্যারি, $C_0 = C_i(A \oplus B) + AB$

এখন,

প্রথম হাফ-অ্যাডারের ক্ষেত্রে- দ্বিতীয় হাফ-অ্যাডারের ক্ষেত্রে-

$S_1 = A \oplus B$ এবং

$C_1 = AB$

$S_2 = S_1 \oplus C_i$
$= A \oplus B \oplus C_i$
$= S$

এবং

$C_2 = S_1 C_i$
$= (A \oplus B) C_i$

অতএব, $C_0 = C_2 + C_1$

= ফুল-অ্যাডারের যোগফল

পরিশেষে, হাফ এডার দ্বারা ফুল এডার বাস্তবায়নের লজিক ডায়াগ্রাম নিম্নে দেয়া হলো-

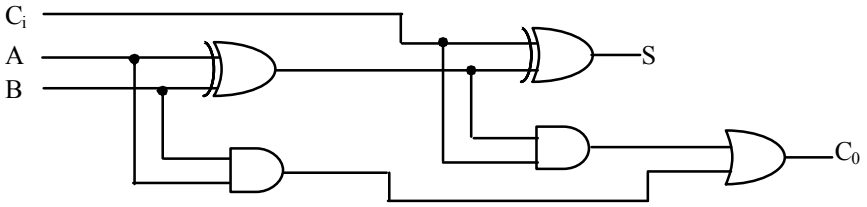

অথবা (ব্লক চিত্রের মাধ্যমে)

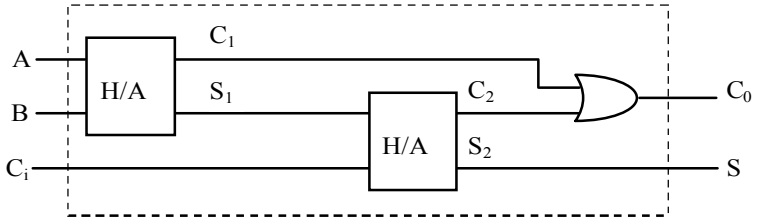

চিত্র ৬.৭.৬ : হাফ-অ্যাডারের সাহায্যে ফুল-অ্যাডারের বাস্তবায়ন

শিক্ষার্থীর কাজ	মৌলিক লজিক গেইটের সাহায্যে হাফ ও ফুল অ্যাডারের বাস্তবায়ন করুন।

সারসংক্ষেপ

কম্পিউটার সিস্টেমে যোগের মাধ্যমে গুণ, বিয়োগ, ভাগ ইত্যাদির কাজ করা যায়। আর যে সমবায় সার্কিট দ্বারা যোগ করা যায় তাকে এডার বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কম্পিউটার সিস্টেমে যে সমবায় সার্কিট দ্বারা যোগ করা যায় তাকে কি বলে?

ক) এডার খ) এনকোডার
গ) ডিকোডার ঘ) সবগুলোই

২। হাফ-অ্যাডারের সাহায্যে ফুল-অ্যাডারের বাস্তবায়ন কোনটি লাগে?

ক) অর গেট খ) অ্যান্ড গেট
গ) নর গেট ঘ) এক্স অর গেট

পাঠ-৬.৮ এনকোডার ও ডিকোডার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন ধরনের এনকোডার এর কার্যাবলী, লজিক, লজিক ফাংশন ও চিত্র উপস্থাপন করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের ডিকোডার এর কার্যাবলী, লজিক ফাংশন ও চিত্র উপস্থাপন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	এনকোডার, ডিকোডার ।

৬.৮.১ এনকোডার

এনকোডার এমন একটি সমবায় সার্কিট যার দ্বারা সর্বাধিক 2^n টি ইনপুট থেকে n টি আউটপুট লাইনে 0 বা 1 আউটপুট পাওয়া যায়। যে কোন মুহূর্তে একটি মাত্র ইনপুট 1 ও বাকি সব ইনপুট 0 থাকে। এনকোডার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- ৪ থেকে ২ এনকোডার, ৮ থেকে ৩ এনকোডার ইত্যাদি।

কাজ ঃ এনকোডারের সাহায্যে যে কোন আলফানিউমেরিক বর্ণকে অ্যাসকি, ইবিসিডিক ইত্যাদি কোডে পরিণত করা যায়। সেজন্য ইনপুট ব্যবস্থায় কী-বোর্ডের সঙ্গে এনকোডার যুক্ত থাকে।

গঠন ঃ একটি 8 থেকে 3 এনকোডারে 8 টি ইনপুট থেকে 3 টি আউটপুট লাইন পাওয়া যায়। তাহলে এর সাহায্যে অকট্যাল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করা যায়। এজন্য একে অকট্যাল থেকে বাইনারি এনকোডার বলে।

- **আউটপুট সমীকরণ :**

$X = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$

$Y = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$

$Z = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$

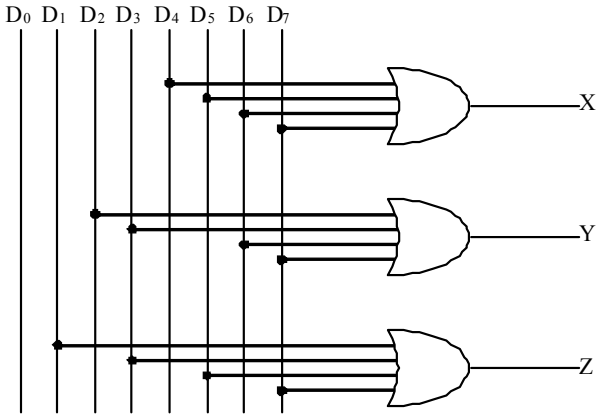

চিত্র ৬.৮.১ : ৮ থেকে ৩ লাইন এনকোডার

ইনপুট								আউটপুট		
D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	X	Y	Z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

সত্যক সারণী

৬.৮.২ ডিকোডার

ডিকোডার হলো এমন একটি সমবায় সার্কিট যার সাহায্যে n টি ইনপুট থেকে সর্বাধিক 2^n টি আউটপুট লাইনের একটিতে 1 ও বাকি সবকটিতে 0 আউটপুট পাওয়া যায়। কখন কোন আউটপুট লাইনে 1 পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে ইনপুটগুলোর মানের উপর।

কাজ ঃ n টি বিট দিয়ে 2^n টি বাইনারি সংখ্যা লেখা যায়। যেমন 3টি বিট দিয়ে 000(0) থেকে 111(7) পর্যন্ত $2^3 = 8$ টি বাইনারি সংখ্যা লেখা সম্ভব। সুতরাং আউটপুট লাইনগুলোকে 0,1,2 .... ইত্যাদি নম্বর দিলে ডিকোডারের সাহায্যে বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করা যায়।

গঠন ঃ একটি 3 থেকে 8 (3 to 8) লাইন ডিকোডারে 3 টি ইনপুট থেকে $2^3 = 8$ টি আউটপুট লাইন পাওয়া যায়। নিম্নে 3 থেকে 8 (3 to 8) লাইন ডিকোডারের সত্যক সারণি দেখানো হলো-

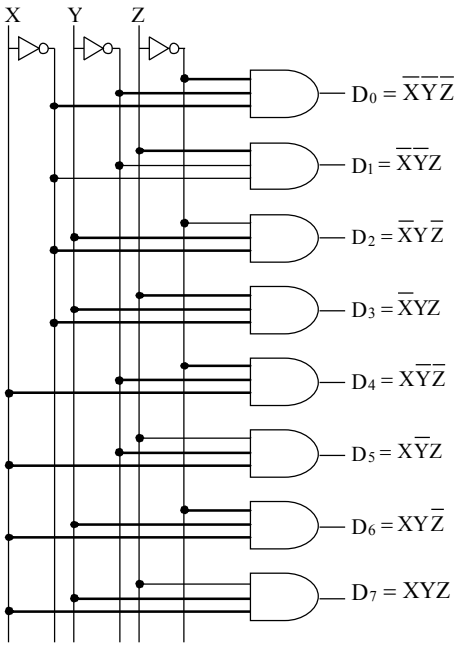

চিত্র ৬.৮.২ : 3 থেকে 8(3 to 8) লাইন ডিকোডার

ইনপুট			আউটপুট							
X	Y	Z	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

সত্যক সারণী

ডিকোডারের ব্যবহার:

- ডিকোডারের সাহায্যে বিভিন্ন কোডকে যান্ত্রিক ভাষায় প্রকাশ করা যায়।
- ইউনিকোড ভাষায় লেখা তথ্যকে সাধারণ আকারে প্রকাশ করতে ডিকোডারের প্রয়োজন হয় ।
- কন্ট্রোল ইউনিটের বিভিন্ন নির্দেশ বাইনারি সংখ্যায় ডিকোড করতে ডিকোডার সাহায্য করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	এনকোডার ও ডিকোডারের মধ্যে পার্থক্যের তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

এনকোডার হলো এমন এক ধরনের ইলেট্রনিক সার্কিট বা ডিজিটাল বর্তনী যা আলফাবেট বা মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য বা যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তর করে। অন্যদিকে ডিকোডার হলো এমন এক ধরনের ইলেট্রনিক সার্কিট বা ডিজিটাল বর্তনী যা কম্পিউটারে ব্যবহৃত ভাষাকে মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ডিকোডারের ইনপুট সংখ্যা 4 হলে আউটপুট হবে–

ক. 4 খ. 8

গ. 16 ঘ. 32

২। কোন সার্কিটের সাহায্যে ডাটাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা যায়?

ক. রেজিস্টার খ. কাউন্টার

গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার

পাঠ-৬.৯ ফ্লিপ-ফ্লপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ফ্লিপ-ফ্লপ কি ও তার ব্যবহার বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের ফ্লিপ-ফ্লপের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ফ্লিপ-ফ্লপ ।

৬.৯.১ ফ্লিপ ফ্লপ

ফ্লিপ-ফ্লপ লজিক গেইট দ্বারা তৈরি এক ধরনের মেমরি উপাদান যা একটি বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে। ফ্লিপ-ফ্লপের দুটি স্থায়ী অবস্থা (0,1) আছে এবং ফ্লিপ-ফ্লপ দুটি স্থায়ী অবস্থার যে কোন একটিতে থাকতে পারে। ধরা যাক, এটি প্রথম অবস্থায় আছে, তাহলে এটি প্রথম অবস্থাতেই থাকবে যতক্ষণ না এতে বাইরে থেকে একটি তড়িৎপ্রবাহ, (যাকে বলে ট্রিগার (Trigger)) দেওয়া হচ্ছে। ফ্লিপ-ফ্লপের একটি আউটপুট অপর আউটপুটের বিপরীত হয়। অর্থাৎ একটি আউটপুট Q হলে অন্যটি $\overline{Q}$ হবে।

ফ্লিপ-ফ্লপের ব্যবহার

১। বিভিন্ন রেজিস্টার তৈরিতে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করা হয়।
২। সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটে মেমরি উপাদান হিসেবে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করা হয়।
৩। ডিজিটাল ঘড়ি, ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ইত্যাদিতে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহৃত হয়।

৬.৯.২ ফ্লিপ-ফ্লপের প্রকারভেদ

ফ্লিপ-ফ্লপ সাধারণত ৫ প্রকার। যথা–

১. SR ফ্লিপ-ফ্লপ,
২. D ফ্লিপ-ফ্লপ,
৩. JK ফ্লিপ-ফ্লপ,
৪. T ফ্লিপ-ফ্লপ ও
৫. মাস্টার-স্লেভ ফ্লিপ-ফ্লপ

SR ফ্লিপ-ফ্লপ

সবচেয়ে সরলতম ফ্লিপ-ফ্লপ হলো SR ল্যাচ বা SET-RESET বা SR ফ্লিপ-ফ্লপ। দুটি ন্যান্ড (NAND) গেইট অথবা নর গেইট (NOR) এমনভাবে যুক্ত থাকে যে একটির ইনপুট অন্যটির আউটপুটের সাথে সংযুক্ত অর্থাৎ ক্রস কাপলড (Cross Coupled) ভাবে সংযুক্ত থাকে। ন্যান্ড (NAND) বা নর (NOR) গেইট ব্যবহার করে SR ল্যাচ তৈরি করা যেতে পারে। SR ল্যাচে আউটপুট অবস্থাকে 1 বা HIGH করাকে সেট এবং ০ বা LOW করাকে রিসেট বলে।

ন্যান্ড ল্যাচ

ন্যান্ড ল্যাচ (NAND Latch) বা ন্যান্ড গেইট ব্যবহার করে তৈরি ফ্লিপ-ফ্লপের অপারেশন নিচে বর্ণনা করা হলো-

১। SET=RESET = 1

এটা স্বাভাবিক অবস্থা যা ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুটে কোন প্রভাব ফেলে না। এক্ষেত্রে Q ও $\overline{Q}$ এ আগের অবস্থাই থাকবে যা এই ইনপুট কার্যকর হওয়ার পূর্বে ছিল।

২। SET = 0, RESET = 1

এটা সবসময় আউটপুটকে Q = 1 স্টেটে উন্নীত করবে। এই অবস্থাকে ল্যাচ বা ফ্লিপ-ফ্লপকে সেট (SET) করা বলে।

৩। SET = 1 RESET = 0
এটা সবসময় আউটপুটকে Q = 0 অবস্থায় উন্নীত করবে। এ অবস্থাকে রিসেট (RESET) করা বলে।

৪। SET = RESET = 0

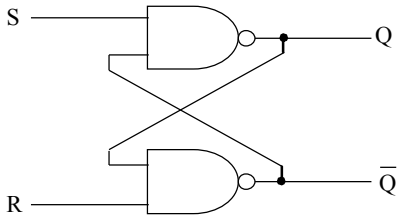

চিত্র ৬.৯.১ : ন্যান্ড ল্যাচ

এই অবস্থা ফ্লিপ-ফ্লপকে একই সময়ে SET ও RESET করতে চায় ফলে অস্বাভাবিক ফলাফল হতে পারে। আউটপুটে একই সময়ে $Q = \overline{Q} = 1$ হয় যদিও এটা কাম্য নয় কারণ ফ্লিপ-ফ্লপের দুটি আউটপুট যা একটি অপরটির বিপরীত হবে। SR ফ্লিপ-ফ্লপের এ অবস্থাকে অনিশ্চিত (Indeterminate) অবস্থা বা Race condition বলা হয়। এই অসুবিধার কারণে এ অবস্থা ব্যবহার করা হয় না।

অনুরূপভাবে NOR Latch বা নর গেইট ব্যবহার করে SR ফ্লিপ-ফ্লপ তৈরি করা যেতে পারে।

ন্যান্ড ল্যাচের বৈশিষ্ট্য সারণি		
S	R	Q
1	1	অপরিবর্তিত
0	1	1
1	0	0
0	0	অনিশ্চিত

ডি (D অর্থাৎ Data) ফ্লিপ-ফ্লপ

SR ফ্লিপ-ফ্লপের সামান্য পরিবর্তন করে D ফ্লিপ-ফ্লপ তৈরি করা হয়েছে। SR ফ্লিপ-ফ্লপের S এবং R এর মধ্যে একটি ইনভার্টার বসিয়ে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে S = R = 1 হওয়া অসম্ভব ফলে কোন অনিশ্চিত (Indetermine) অবস্থা বা Race condition তৈরি হয় না।

D ফ্লিপ-ফ্লপের বৈশিষ্ট্য সারণি		
D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1

D ফ্লিপ-ফ্লপে একটি মাত্র ইনপুট D থাকে। এটি মূলত একটি ক্লকড SR ফ্লিপ-ফ্লপ যার S = D ও R = $\overline{D}$ ফ্লিপ-ফ্লপে বর্তমান আউটপুট পূর্বের আউটপুটের উপর নির্ভর করে না। আউটপুট ও ইনপুট সমান বলে D ফ্লিপ-ফ্লপকে স্বচ্ছ (Transparent) বলা হয়। D ফ্লিপ-ফ্লপকে D ল্যাচও বলে।

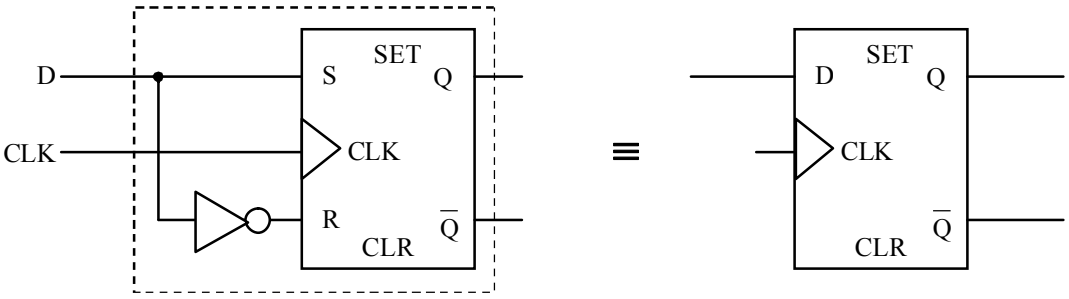

চিত্র ৬.৯.২ : D ফ্লিপ-ফ্লপ

JK ফ্লিপ-ফ্লপ

JK ফ্লিপ-ফ্লপ SR ফ্লিপ-ফ্লপের পরিশুদ্ধ রূপ। অর্থাৎ SR ফ্লিপ-ফ্লপের S = R = 1 ইনপুটে আউটপুট অনিশ্চিত থাকে। এই অসুবিধা দূর করা হয়েছে JK ফ্লিপ-ফ্লপে। JK ফ্লিপ-ফ্লপের অপারেশন নিচে বর্ণনা করা হলো :

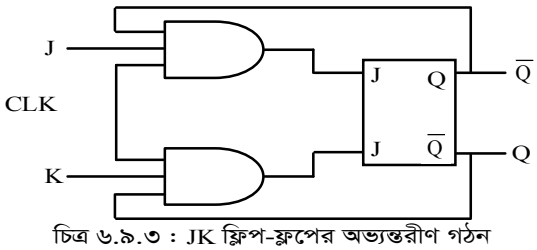

চিত্র ৬.৯.৩ : JK ফ্লিপ-ফ্লপের অভ্যন্তরীণ গঠন

১। J=0, K=0

এটা JK ফ্লিপ-ফ্লপের স্বাভাবিক অবস্থা যা ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট কোন প্রভাব ফেলে না। CLK তে ক্লক পালস দেওয়া হলেও Q এ আগের অবস্থাই (Q_0) থাকবে যা এই ইনপুট কার্যকর হওয়ার পূর্বে ছিল।

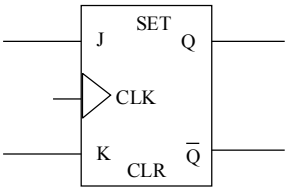

২। J=0, K=1

এই ইনপুট এবং CLK তে ক্লক পালস দেওয়া হলে সবসময় আউটপুটকে Q = 0 স্টেটে উন্নীত করবে। অর্থাৎ JK ফ্লিপ-ফ্লপকে JK ক্লিয়ার (CLEAR) করবে।

৩। J=1, K=0

এই ইনপুট এবং CLK তে ক্লক পালস দেওয়া হলে সবসময় আউটপুটে Q=1 অবস্থায় উন্নীত করবে। অর্থাৎ JK ফ্লিপ-ফ্লপকে সেট (SET) করবে।

৪। J=1, K=1

এই ইনপুট এবং CLK তে ব্লক পালস দেওয়া হলে JK ফ্লিপ-ফ্লপ আউটপুট টোগল করবে। অর্থাৎ ইনপুট দেওয়ার পূর্বের আউটপুট Q_0 হলে ইনপুট দেওয়ার পর বর্তমান আউটপুট $\overline{Q}_0$ হবে।

J	K	CLK	Q
0	0	↑	Q_0 (অপরিবর্তিত)
0	1	↑	1
1	0	↑	0
1	1	↑	$\overline{Q}_0$ (টোগল)

ক্লকড T ফ্লিপ-ফ্লপ

ক্লকড T ফ্লিপ-ফ্লপ হলো এক ইনপুট JK ফ্লিপ-ফ্লপ। JK ফ্লিপ-ফ্লপে J=K=T (সর্বদা) করে T ফ্লিপ-ফ্লপ তৈরি করা হয়েছে। T নামটা এসেছে Toggle শব্দ থেকে কারণ T=1 হলে $Q_t = \overline{Q}_0$ হয়।

T ফ্লিপ-ফ্লপের বৈশিষ্ট্য সারণি	
T	Q_t
0	Q_0
1	$\overline{Q}_0$

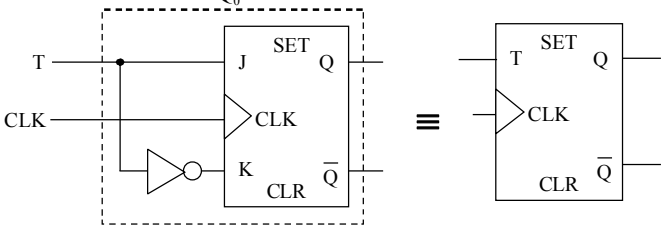

চিত্র ৬.৯.৪: T ফ্লিপ-ফ্লপ

শিক্ষার্থীর কাজ	নর গেইট ব্যবহার করে SR ফ্লিপ-ফ্লপের কার্যপ্রণালী লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ফ্লিপ-ফ্লপ লজিক গেইট দ্বারা তৈরি এক ধরনের মেমরি উপাদান যা একটি বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে। ফ্লিপ-ফ্লপের দুটি স্থায়ী অবস্থা (0,1) আছে এবং ফ্লিপ-ফ্লপ দুটি স্থায়ী অবস্থার যে কোন একটিতে থাকতে পারে। বিভিন্ন রেজিস্টার তৈরিতে ডিজিটাল ঘড়ি, ডিজিটাল ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ইত্যাদিতে ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। JK ফ্লিপ-ফ্লপে J=0, K=1 আউটপুট কত?

ক) 0 খ) 1

গ) Q_0 ঘ) কোনটাই নয়

২। D ফ্লিপ-ফ্লপে ইনপুট কয়টি?

ক) 4 খ) 3

গ) 2 ঘ) 1

পাঠ-৬.১০ রেজিস্টার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রেজিস্টার কি ও এর ব্যবহার বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের রেজিস্টার এর কার্যাবলী, চিত্র উপস্থাপন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	রেজিস্টার ।

৬.৮.২ রেজিস্টার

রেজিস্টার হলো ফ্লিপ ফ্লপের সমন্বয়ে গঠিত ডিজিটাল বর্তনী। রেজিস্টারের প্রতিটি ফ্লিপ-ফ্লপ এক বিট (Bit) তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। একটি n-bit রেজিস্টারে n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে যা বাইনারি n-bit তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। ফ্লিপ-ফ্লপ ছাড়াও রেজিস্টারে কম্বিনেশনাল (Combinational) গেইট থাকতে পারে যা কোন ডাটা প্রসেসিংয়ের কাজ করতে পারে। রেজিস্টারে ডাটার স্থানান্তর তিনভাবে হতে পারে। যথা–

১। প্যারালাল স্থানান্তর
২। সিরিয়াল স্থানান্তর ও
৩। মিশ্রভাবে স্থানান্তর।

যদি একটি রেজিস্টারের সব বিট একসঙ্গে একই ক্লক পালসে অন্য রেজিস্টারে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে প্যারালাল ট্রান্সফার সমান্তরাল স্থানান্তর বলে। কিন্তু প্রতি ক্লক পালসে এক বিট হিসেবে ডাটা স্থানান্তরিত হলে তাকে সিরিয়াল ট্রান্সফার বা সিরিয়াল স্থানান্তর বলে। ডাটার স্থানান্তর উভয়ভাবেই যখন হয় তখন তাকে মিশ্রভাবে ট্রান্সফার বলে। প্যারালাল ট্রান্সফারে সময় কম লাগে বলে বেশিরভাগ কম্পিউটারে প্যারালাল ট্রান্সফার ব্যবহার করা হয়।

রেজিস্টারের ব্যবহার

১। রেজিস্টারে প্রোগ্রামার কোন কিছু জমা রাখতে পারে না, একমাত্র CPU-ই গণনার প্রয়োজনে রেজিস্টারে কোন কিছু সঞ্চিত রাখতে পারে।
২। রেজিস্টার প্রধান মেমরির অন্তর্গত না হলেও এর গঠন প্রধান মেমরির অনুরূপ হতে পারে। ক্যাশ মেমরি হিসেবে রেজিস্টার বহুল ব্যবহৃত হয়।
৩। তাছাড়া ক্যালকুলেটর এবং ঘড়িতেও রেজিস্টারের ব্যবহার দেখা যায়।

রেজিস্টারের প্রকারভেদ

গঠন অনুসারে রেজিস্টার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা–

১। প্যারালাল লোড রেজিস্টার ও
২। শিফ্ট রেজিস্টার।

আবার কাজের প্রকৃতিভেদে রেজিস্টার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা–

১। অ্যাকুমুলেটর (Accumulator)
২। সাধারণ ব্যবহারের রেজিস্টার
৩। বিশেষ ব্যবহারের রেজিস্টার ইত্যাদি।

রেজিস্টারের গঠন

কাজের প্রকৃতি ও গঠন অনুসারে রেজিস্টার বিভিন্ন প্রকার হয়। তবে সরল ও সাধারণ রেজিস্টারগুলো শুধুমাত্র ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট দ্বারা গঠিত হয় এবং ক্লক পালস্ দ্বারা পরিচালিত। নিম্নে একটি 4 বিট রেজিস্টারের গঠন দেখানো হল যা 4 টি D টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা গঠিত।

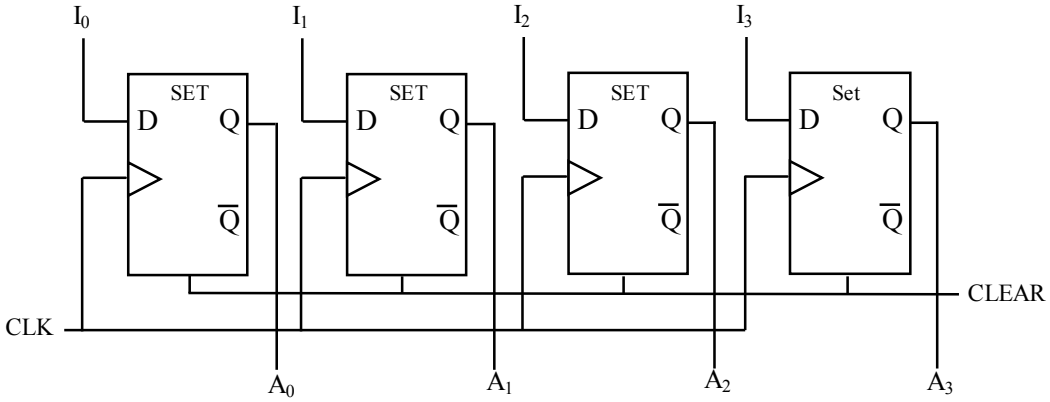

চিত্র ৬.১০.১ : 4 বিট রেজিস্টার

এই রেজিস্টারটি 4 বিটের বাইনারি সংখ্যা ধারণ ও সংরক্ষণ করতে পারে। একে বাফার রেজিস্টারও বলা হয়। ক্লক পালস্ যখন কমন ক্লক ইনপুটে দেয়া হয় তখন রেজিস্টারের I_0, I_1, I_2 ও I_3 ইনপুটের ডাটা রেজিস্টারে স্থানান্তরিত হয়। এই 4 বিট রেজিস্টারের আউটপুট A_0, A_1, A_2 ও A_3 হতে যে কোন সময় ডাটা গ্রহণ করা যায়। তবে যখন ফ্লিপ-ফ্লপের CLEAR এর ইনপুট ০ দেয়া হয় তখন এই 4 বিট রেজিস্টারের ডাটা রিসেট (Reset) হয়। আর সাধারণ অপারেশনের সময় CLEAR এ '1' পালস্ দিয়ে রাখতে হয়। রেজিস্টারের তথ্য অপরিবর্তিত রাখতে হলে সার্কিটের ক্লক পালস্ অফ রাখতে হয়।

শিফ্ট রেজিস্টার

যে রেজিস্টার বাইনারি ডাটাকে ডানদিক বা বাম দিকে বা উভয় দিকে সরাতে পারে তাকে শিফ্ট রেজিস্টার বলে। শিফ্ট রেজিস্টারে একগুচ্ছ ফ্লিপ-ফ্লপ চেইন আকারে একটির সাথে অপরটি যুক্ত থাকে যাতে একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট পরবর্তী ফিল্প-ফ্লপের ইনপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে। সকল ফ্লিপ-ফ্লপে একটি কমন ক্লক পালস্ পায় যা একটি স্টেজ থেকে অপর স্টেজে শিফ্ট সূচনা করে। একটি সরলতম শিফ্ট রেজিস্টারের চিত্র নিচে দেওয়া হলো যেখানে শুধুমাত্র D টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট পরবর্তী ফ্লিপ-ফ্লপের ইনপুটের সাথে সংযুক্ত। সকল ফ্লিপ-ফ্লপে একটি কমন ক্লক পালস্ দেওয়া হয়। এক একটি পালসে এক একটি বিট সরানো হয়।

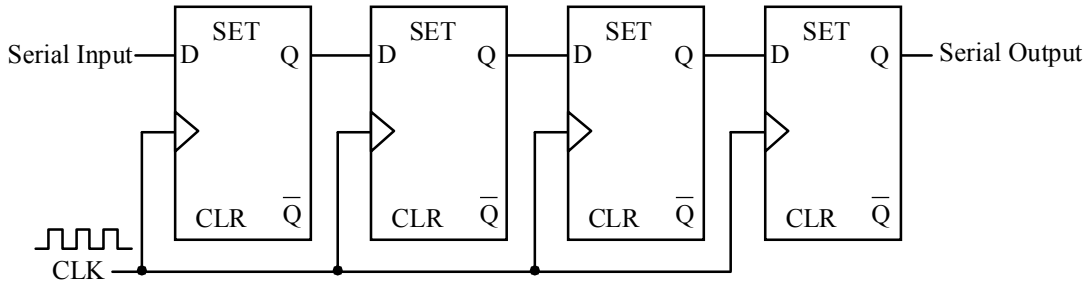

চিত্র ৬.১০.২ : D ফ্লিপ-ফ্লপ ব্যবহার করে একটি 4 বিট শিফ্ট লেফট

শিফ্ট রেজিস্টার কয়েক ধরনের হয়। যথা– শিফ্ট লেফট, শিফ্ট রাইট এবং কন্ট্রোলড শিফ্ট। কন্ট্রোলড শিফ্ট রেজিস্টার আবার দু'ধরনের হতে পারে। যথা- সিরিয়াল লোডিং ও প্যারালাল লোডিং।

শিক্ষার্থীর কাজ	রেজিস্টারের প্রয়োজনীয়তার উপর আপনার মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

ফ্লিপ ফ্লপের সমন্বয়ে গঠিত এক ধরনের ডিজিটাল বর্তনী হলো রেজিস্টার । রেজিস্টারের প্রতিটি ফ্লিপ-ফ্লপ এক বিট (Bit) তথ্য অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করতে পারে। একটি n-bit রেজিস্টারে n সংখ্যক ফ্লিপ-ফ্লপ থাকে যা বাইনারি n-bit তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। ক্যাশ মেমরি হিসেবে রেজিস্টার বেশি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ক্যালকুলেটর এবং ঘড়িতেও রেজিস্টারের ব্যবহার দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শিফ্ট রেজিস্টার কোনটি?

ক) শিফ্ট লেফট খ) কন্ট্রোলড শিফ্ট

গ) শিফ্ট রাইট ঘ) সবগুলোই

২। Resister ব্যবহার করা যায়-

i. 0, 1 স্টোর করতে

ii. 0 ও 1 যোগ করতে

iii. Data Shift করতে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক.i ও ii খ.i ও iii

গ.ii ও iii ঘ.i, ii ও iii

পাঠ-৬.১১ কাউন্টার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কাউন্টার এর কার্যাবলী উপস্থাপন করতে পারবেন।
- কাউন্টার এর ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- কাউন্টার এর প্রকারভেদ জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কাউন্টার।

৬.১১.১ কাউন্টার

কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট যা এর মধ্যে প্রদানকৃত ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে। কাউন্টারের ইনপুট পালস্ (যাকে কাউন্ট পালস্ও বলে) ক্লক পালস্ বা অন্য কোন পালস্ হতে পারে। কাউন্ট নির্দিষ্ট সময় পরপর আসতে পারে বা অনিয়মিতভাবেও আসতে পারে। কাউন্টার বিভিন্ন সিকুয়েন্স (Sequence) বা ক্রম অনুসরণ করতে পারে তবে সবচেয়ে সরল ও সহজ সিকুয়েন্স হলো বাইনারি সিকুয়েন্স। যে কাউন্টার বাইনারি সিকুয়েন্স অনুসরণ করে তাকে বাইনারি কাউন্টার বলেন। একটি n বিট বাইনারি কাউন্টার হলো n টি ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সংশ্লিষ্ট গেইট যা বাইনারি n বিট অর্থাৎ 0 থেকে 2^n -1 পর্যন্ত গণনার সিকুয়েন্সকে অনুসরণ করতে পারে।

কাউন্টার সর্বাধিক যতটি সংখ্যা গুণতে পারে তাকে তার মডিউলাস (Modulus) বা মোড নাম্বার বলে। কোন কাউন্টারে n টি ফ্লিপ-ফ্লপ থাকলে তার মডিউলাস 2^n। কোন কাউন্টারের ফ্লিপ-ফ্লপের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মোড নাম্বার বা মডিউলাস বৃদ্ধি করা যায়।

কাউন্টারের ব্যবহার

ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সে কাউন্টারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

১। ক্লক পালসের সংখ্যা গণনার কাজে
২। টাইমিং সিগনাল প্রদানের কাজে
৩। ডিজিটাল ঘড়িতে
৪। ডিজিটাল কম্পিউটারে
৫। অ্যানালগ সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে রূপান্তর করার কাজে ব্যবহার করা; ইত্যাদি।

৬.১১.২ কাউন্টারের প্রকারভেদ

ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সে বিভিন্ন ধরনের কাউন্টার ব্যবহার করা হয়। যেমন–

১। সিনক্রোনাস কাউন্টার (Synchronous counter)- এ ধরনের কাউন্টারে একটি মাত্র ক্লক পালস দিয়ে সব ফ্লিপ-ফ্লপের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। যেমন- রিং কাউন্টার, মড-10 কাউন্টার ইত্যাদি হলো সিনক্রোনাস কাউন্টার।

২। অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার (Asynchronous counter)-এ ধরনের কাউন্টারে একটি ফ্লিপ-ফ্লপের আউটপুট অন্য ফ্লিপ-ফ্লপের ক্লক পালস হিসেবে কাজ করে। যেমন–রিপল কাউন্টার।

রিপল কাউন্টার আবার দু'ধরনের। যথা–রিপল আপ কাউন্টার ও রিপল ডাউন কাউন্টার।

৬.১১.৩ কাউন্টারের গঠন (রিপল কাউন্টার)

রিপল কাউন্টার হলো অ্যাসিনক্রোনাস বাইনারি কাউন্টার। রিপল কাউন্টারে একটি ফ্লিপ-ফ্লপের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে অপর ফ্লিপ-ফ্লপকে প্রভাবিত করে।

বাইনারি সংখ্যা কিভাবে কাউন্টার কাউন্ট করে তা নিম্নে দেখানো হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিটটি (LSB) প্রতিবার টোগল করছে। দ্বিতীয় স্থানের অংকটি প্রতি দুইবার পর পর টোগল করছে এবং তৃতীয় স্থানের অংকটি প্রতি চারবার পর পর টোগল করছে।

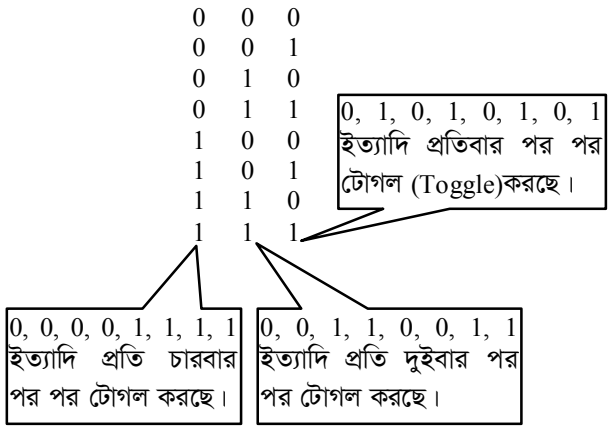

চিত্র ৬.১১.১ : কাউন্টার

রিপল কাউন্টার টোগল ফ্লিপ-ফ্লপ দ্বারা তৈরি করা যায় যা সবসময় টোগল মোডে কাজ করবে। T টাইপ ফ্লিপ-ফ্লপ একটি টোগল ফ্লিপ-ফ্লপ।

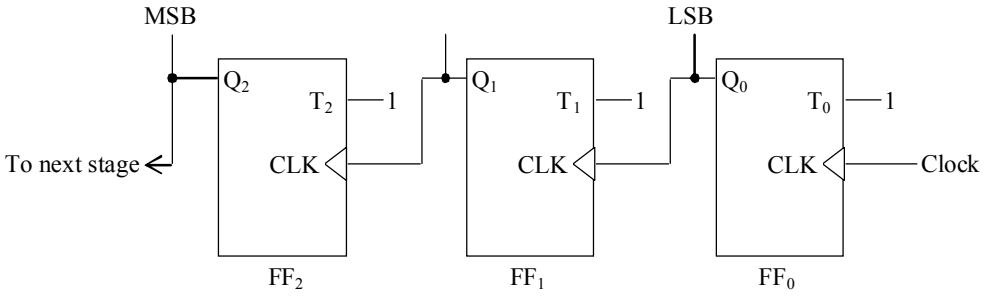

চিত্র ৬.১১.২ : 3 বিট রিপল কাউন্টার

কার্যপ্রণালী ঃ

১. FF_0 তে সিগনাল দিলে টোগল করবে অর্থাৎ প্রতিবার 0 থেকে 1 বা 1 থেকে 0 হবে।

২. Q_0 কে FF_1 এর ক্লক পালস্ হিসেবে দিলে FF_1 কাজ করবে। যখন $Q_0 = 1$ হয় তখন FF_2 টোগল করবে অর্থাৎ প্রতি ২ বার পর পর টোগল করবে।

৩. অনুরূপ Q_1 কে FF_2 এর ক্লক পালস হিসেবে যুক্ত করলে, $Q_1 = 1$ হলে FF_2 টোগল করবে। সুতরাং FF_2 প্রতি চার বার অন্তর টোগল করবে। এভাবে রিপল কাউন্টার কাজ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	অ্যাসিনক্রোনাস ও সিনক্রোনাস কাউন্টারের মধ্যে পার্থক্যের তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট যা এর মধ্যে প্রদানকৃত ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে। একটি n বিট বাইনারি কাউন্টার n টি ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সংশ্লিষ্ট গেইট নিয়ে গঠিত যা বাইনারি n বিট অর্থাৎ 0 থেকে 2^n -1 পর্যন্ত গণনার সিকুয়েন্সকে অনুসরণ করতে পারে। ডিজিটাল কম্পিউটারে, ডিজিটাল ঘড়িতে, টাইমিং সিগনাল প্রদানে ইত্যাদি কাজে কাউন্টার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কাউন্টার সর্বাধিক যতটি সংখ্যা গুণতে পারে তাকে কি বলে?

ক) মোড নাম্বার খ) কাউন্টার নাম্বার
গ) ফ্লিপ-ফ্লপ ঘ) সবগুলো

২। ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সে কাউন্টার কত ধরনের?

ক) 2 খ) 3
গ) 4 ঘ) 5

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৬

ক. জ্ঞান দক্ষতা স্তর

১। লজিক গেইট কী?

২। এডার কী?

৩। ফ্লিপ ফ্লপ কী ?

৪। কাউন্টার কী ?

খ. অনুধাবন দক্ষতা স্তর

১। 1+1 = 1 ব্যাখ্যা করুন।

২। "সত্যক সারণি ব্যবহার করে লজিক বর্তনী আঁকা সম্ভব" - ব্যাখ্যা করুন।

৩। যান্ত্রিক ভাষাকে মানুষের ভাষায় বোঝানোর উপযোগী লজিক সার্কিটটি ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বুলিয়ান যোগ '+' দ্বারা কোন অপারেটরকে বুঝায়?

ক. 'অথবা' অপারেটর খ. 'এবং' অপারেটর
গ. 'না' অপারেটর ঘ. 'কিন্তু' অপারেটর

২। নিচের কোনটি 'OR' গেইটের প্রতিক?

ক. 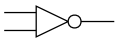 খ. 

গ.  ঘ. 

৩। কোন গেইট এর মাধ্যমে সকল মৌলিক গেইটের কাজ করা যায়?

ক. AND Gate খ. OR Gate
গ. NAND Gate ঘ. NOT Gate

৪। OR গেইট ও NOT গেইটের সমন্বিত গেইটকে কী বলে?

ক. XOR গেইট খ. XNOR গেইট
গ. NAND গেইট ঘ. NOR গেইট

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। NAND গেইট গঠিত হয়-

i. AND -গেইট দ্বারা
ii. OR- গেইট দ্বারা
iii. NOT - গেইট দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। ডিজিটাল সিস্টেমে মৌলিক লজিক গেইট হিসেবে ব্যবহার করা হয়-

i. AND গেইট
ii. OR গেইট
iii. NOR গেইট
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

লজিক গেইট সংক্রান্ত আলোচনা শেষে শিক্ষক বোর্ডে লিখলেন- $E\overline{F} + EF + EG$

১। উদ্দীপকের সমীকরণটির ফলাফল কত?

ক. EF খ. E

গ. F ঘ. G

২। উদ্দীপকের সমীকরণের ফলাফলের সাথে H যোগ করে NOT এর ভিতর দিয়ে পরিচালিত করা হলে তৈরি হবে -

i.যৌগিক গেইট ii.নর গেইট iii.সার্বজনীন গেইট
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক.i ও ii খ.i ও iii
গ.ii ও iii ঘ.i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আতিক সাহেব তার শয়ন কক্ষে ফ্যান চালানোর জন্য বেড সুইচ ব্যবহার করেন। ঠান্ডা অনুভূত হওয়ায় তিনি বেড সুইচটি অফ করলেন। ফলে ফ্যানটি বন্ধ হয়ে গেল। ফ্যানের একটি সুইচ খোলা থাকা সত্ত্বেও ফ্যানটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি চিন্তা করলেন এটি কিভাবে সম্ভব?

ক. এনকোডার কী? ১
খ. OR গেইটের তুলনায় XOR গেট এর সুবিধা– ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের সার্কিটটি অংকন করে ফ্যান বন্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সার্কিটটি কি পরিবর্তন করলে একটি সুইচ বন্ধ করলেও ফ্যানটি বন্ধ হবে না? ব্যাখ্যা করুন। ৪

২। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

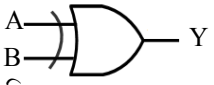

চিত্র:১

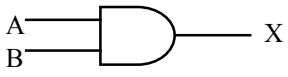

চিত্র : ২

ক. কাউন্টার কী ? ১

খ. বুলিয়ান এ্যালজেবরা ও সাধারণ অ্যালজেবরা এক নয়- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. চিত্র-১ এর সত্যক সারণি তৈরি করুন। ৩

ঘ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ লজিক গেইটের সাহায্যে কোন এডার তৈরি করা যায় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন। ৪

৩। নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ্য করুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

$$F = \overline{A}B + \overline{B}C$$

ক. BCD কী? ১

খ. 1+1 = 1 ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকের ফাংশনটির আলোকে সত্যক সারণী তৈরি করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ফাংশনটি কি শুধু NAND গেইটের সাহায্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠ - ৬.১	১	ঘ	২	ঘ
পাঠ - ৬.২	১	ক	২	ঘ
পাঠ - ৬.৩	১	ক	২	ক
পাঠ - ৬.৪	১	গ	২	ক
পাঠ - ৬.৫	১	ক	২	খ
পাঠ - ৬.৬	১	গ	২	গ
পাঠ - ৬.৭	১	ক	২	ক
পাঠ - ৬.৮	১	গ	২	গ
পাঠ - ৬.৯	১	ক	২	ঘ
পাঠ - ৬.১০	১	ঘ	২	খ
পাঠ - ৬.১১	১	ক	২	ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ খ ২ খ

গ. অভিন্ন বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ খ ২ ঘ

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML

ইউনিট ৭

ভূমিকা

বর্তমান যুগ ইন্টারনেটের যুগ। মানব সভ্যতার অন্যতম সেরা আবিস্কার এই ইন্টারনেট যার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য জানার জন্য দরকার হচ্ছে ওয়েবসাইট। ওয়েব সাইটের মূল হচ্ছে ওয়েবপেজ যা HTML দিয়ে তৈরি করা হয়। ওয়েবসাইট তৈরি করে সাধারণত তা কোনো সার্ভারে হোস্ট করে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এ ইউনিট শেষে আপনারা ওয়েবসাইট ডিজাইন এবং HTML সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৭.১ : ওয়েব ডিজাইন এর ধারণা
পাঠ - ৭.২ : ওয়েবসাইট এর কাঠামো
পাঠ - ৭.৩ : HTML এর মৌলিক বিষয়সমূহ
পাঠ - ৭.৪ : HTML ট্যাগ ও সিনট্যাক্স পরিচিতি
পাঠ - ৭.৫ : HTML নকশা ও কাঠামো লেআউট
পাঠ - ৭.৬ : HTML টেক্সট ফরমেটিং
পাঠ - ৭.৭ : HTML ডকুমেন্টে টেবিল যোগ করা
পাঠ - ৭.৮ : HTML ডকুমেন্টে ফর্ম যোগ করা
পাঠ - ৭.৯ : HTML ডকুমেন্টে ইমেজ ও লিঙ্ক যোগ করা
পাঠ - ৭.১০ : ওয়েবসাইট পাবলিশিং
পাঠ - ৭.১১ : ব্যবহারিক

পাঠ-৭.১ ওয়েব ডিজাইন এর ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ওয়েব ডিজাইন এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ওয়েব পেজ ও ওয়েব ব্রাউজিং কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আইপি এড্রেস ও ডোমেইন নেইম কি এবং এদের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের ওয়েব ব্রাউজার সম্পর্কে বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ওয়েব পেজ , আইপি এড্রেস, ডোমেইন নেইম ।

৭.১.১ ওয়েব ডিজাইনের ধারণা

ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সার্ভারে রক্ষিত ফাইলকে ওয়েব পেজ (Web Page) বলে যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দেখার উপযোগী। এটি সাধারণত HTML (Hyper Text Markup Language) দিয়ে লেখা হলেও বর্তমানে XML, DHTML, STML ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে। প্রতিটি ওয়েব পেজের ওয়েব এড্রেস থাকে।

ওয়েব পেজের সাথে শব্দ বা অডিও, ভিডিও ছবি, অ্যানিমেশন, ডাটা ইত্যাদি যুক্ত থাকতে পারে। এ রকম এক বা একাধিক ওয়েব পেজের সমন্বয়ে তৈরি হয় ওয়েব সাইট। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের ওয়েব সার্ভারে কয়েক মিলিয়ন ওয়েবসাইট সংরক্ষিত আছে। প্রতিটি ওয়েব সাইটের একটি ইউনিক এড্রেস আছে।

৭.১.২ ওয়েব পেজ

ইন্টারনেটে যে পেজগুলো আমরা দেখি সেগুলোকে ওয়েব পেজ বলে। ওয়েব পেজে ইন্টারনেটের তথ্য যেমন- লেখা, অডিও, ভিডিও, ছবি, এনিমেশন ইত্যাদি রাখা যায়। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সবকিছুই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। ওয়েব পেজ ডেভেলপ করার পর তা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের (www) মাধ্যমে প্রকাশের জন্য ওয়েব সার্ভারে হোস্ট করা হয়।

৭.১.৩ ওয়েব ব্রাউজিং

কোন সার্ভারে সংরক্ষিত ওয়েব পেজসমূহকে কোন ওয়েব ব্রাউজিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রদর্শন করাকে ওয়েব ব্রাউজিং বলে। ওয়েব ব্রাউজিংয়ের জনপ্রিয় কিছু সফ্টওয়্যার হল-

- ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার
- মজিলা ফায়ারফক্স
- সাফারি
- গুগল ক্রম

৭.১.৪ আইপি এড্রেস

ইন্টারনেটে যুক্ত প্রত্যেকটি কম্পিউটারের একটি আইডেন্টিটি থাকে যা আইপি এড্রেস নামে পরিচিত। আইপি হল এক ধরনের নেটওয়ার্ক প্রটোকল। বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে আলাদা করার জন্য যেমন নাম আছে, ইন্টারনেটে তেমনি প্রত্যেকটি কম্পিউটারকে আলাদা করে সনাক্ত করতে আইপি এড্রেস ব্যবহৃত হয়।

আইপি এড্রেস মূলত চারটি অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি অংশ ডট (.) চিহ্ন দ্বারা আলাদাভাবে বিভক্ত। এক একটি ভাগকে বলা হয় অকটেট (Octet)। তবে একটি আইপি এড্রেসকে প্রকাশ করার তিনটি পদ্ধতি আছে। যথা-

১। ডটেড ডেসিমেল নোটেশন(Dotted decimal notation)ঃ 192 .168 .15 .5

২। হেক্সাডেসিম্যাল নোটেশন (Hexadecimal notation) ঃ C0 .A8 .0F .05

৩। বাইনারি নোটেশন (Binary notation) ঃ 11000000 . 10101000 . 00001111 . 00000101

১ম অকটেট (1st Octet) ২য় অকটেট (2nd Octet) ৩য় অকটেট (3rd Octet) ৪র্থ অকটেট (4th Octet)

চারটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত আইপি অ্যাড্রেস IPv4 (IP ভার্সন 4) নামে পরিচিত। IPv4 এই অ্যাড্রেস হলো 4 X 8 বা 32 বিটের। যার 2^{32} বা 4294967296 সংখ্যক নেটওয়ার্কযুক্ত কম্পিউটার বা ডিভাইসকে সনাক্ত করা যায়। তবে আইপি অ্যাড্রেসের নতুন ভার্সন হলো IPv6; যার সাহায্যে 2^{128} সংখ্যা ডিভাইসকে সনাক্ত করা যায় এবং যা 128 বিটের অ্যাড্রেস।

৭.১.৫ ডোমেইন নেইম

সংখ্যার সমন্বয়ে গঠিত আইপি এড্রেস মানুষের পক্ষে মনে রাখা খুবই কষ্টকর। তাই আইপি এড্রেস সহজে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য সহজ কোন নাম ব্যবহার করা হয়। ডোমেইন নেইম হচ্ছে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত নেটওয়ার্ক সার্ভারের একটি নির্দিষ্ট নাম। যেমন- www.google.com এই সাইটটির আইপি এড্রেস হল- 216.58.212.164। যে পদ্ধতিতে ডোমেইন নেইমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে ডোমেইন নেইম সিস্টেম বলে (DNS-Domain Naming System)। ডোমেইন নেইম এর বিভিন্ন অংশ থাকে। ডট (.) অপারেটর দ্বারা অংশগুলো বিভক্ত।



চিত্র ৭.১.১: ডোমেইন নেইম

উপরের চিত্রে একটি ওয়েব সাইটের এড্রেস হতে ডোমেইন নেইম mnhs.com কে দেখানো হয়েছে । এখানে mnhs কে ডোমেইন নেইম এবং .com কে ডোমেইন টাইপ বলা হয়। সাধারণত ডোমেইন টাইপ দ্বারা প্রতিষ্ঠানের টাইপ জানা যায়। যেমন-

- .com – কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয় - উদাহরণ- www.google.com
- .gov – সরকারি প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয় - উদাহরণ- www.bpsc.gov.bd
- .org – অর্গানাইজেশনকে বুঝানো হয় - উদাহরণ- www.bccbd.org
- .edu – শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয় - উদাহরণ- www.du.edu

শিক্ষার্থীর কাজ	ওয়েব পেজ ও ওয়েব সাইটের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ওয়েব সাইটের স্বতন্ত্র কোন পেজকে ওয়েবপেজ বলা হয়। এক বা একাধিক ওয়েব পেজের সমন্বয়ে গঠিত হয় ওয়েব সাইট। তাই পরস্পর সম্পর্কিত ওয়েব পেজের সংগ্রহকে ওয়েবসাইট বলে। বর্তমানে ওয়েবপেজকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করা হয়ে থাকে। ওয়েব ডিজাইন হলো একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে টেক্সট, অডিও, ভিডিও, এনিমেশন, কালার ইত্যাদি ব্যবহার করে ওয়েব পেজ তথা ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইপি ভার্সন ৪ (IPV4) এ প্রত্যেকটি আইপি এড্রেস কত বিটের হয়ে থাকে?

ক) ৮ খ) ১৬

গ) ৩২ ঘ) ৬৪

২। আইপি এড্রেসের অংশ কয়টি?

ক) ২ খ) ৩

গ) ৪ ঘ) ৫

পাঠ-৭.২ ওয়েবসাইট এর কাঠামো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ওয়েবসাইট এর কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়েবসাইট এর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ডাইনামিক ও স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন। ওয়েবসাইট

	মুখ্য শব্দ	ডাইনামিক ওয়েবসাইট, স্ট্যাটিক ওয়েব সাইট।

৭.২.১ ওয়েবসাইট এর কাঠামো

একটি ওয়েবসাইট মূলত কতগুলো ওয়েব পেইজের সমষ্টি। ওয়েবসাইটের অন্তর্গত বিভিন্ন পেজগুলো কিভাবে সাজানো থাকে তাই হল ওয়েবসাইটের কাঠামো। অন্যভাবে বলা যায়, একটি ওয়েবসাইটের সকল বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার অবকাঠামো হচ্ছে ঐ ওয়েবসাইটের কাঠামো। সাধারণত একটি ওয়েবসাইটের কাঠামোতে তিনটি অংশ থাকে। যথা-

১. হোম পেজ (Home Page)
২. প্রধান অংশ (Main Section) ও
৩. উপশাখা (Subsection)

হোম পেজ : হোম পেইজ হলো ওয়েবসাইটে প্রবেশের প্লাটফর্ম। এটি সুন্দর ও আকর্ষনীয় হওয়া উচিৎ। ওয়েব ব্রাউজার শুরুতে এই পেইজটি লোড করে। এখানে ওয়েবসাইটের অন্যান্য সকল পেইজের তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া থাকে। একটি ওয়েবসাইট কোন ধরনের তথ্য বহন করছে তা হোম পেইজ থেকেই জানা যায়। অন্যান্য পেইজ ব্রাউজ করার জন্য এই পেইজে লিংক দেওয়া থাকে।

প্রধান অংশ : হোম পেইজের পরের ওয়েব পেজগুলোকে প্রধান অংশ বা মূল সেকশন বলে। ওয়েবসাইটের প্রধান অংশটি কয়েকটি ওয়েব পেজ নিয়ে গঠিত হতে পারে। সাধারণত হোম পেজের বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিত তথ্য এখানে সন্নিবেশ করা থাকে।

উপশাখা : প্রধান অংশে অন্তর্ভূক্ত পেইজ আবার এক বা একাধিক পেইজের সাথে যুক্ত থাকে যাদেরকে উপশাখা বা সাব-সেকশন পেইজ বলে। এই পেইজগুলোতে বিস্তারিত তথ্য এবং লিংক যুক্ত করে তথ্যের সমন্বয় করা হয়।

৭.২.২ ওয়েবসাইট কাঠামোর প্রকারভেদ

হোম পেইজ ও হোম পেইজের সাথে লিংককৃত পেইজগুলো কিভাবে সাজানো যায় তার উপর ভিত্তি করে ওয়েবসাইটের কাঠামোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. হায়ারারকিক্যাল কাঠামো (Hierarchical Structure)
২. লিনিয়ার কাঠামো (Linear Structure)
৩. নেটওয়ার্ক কাঠামো (Network Structure) ও
৪. হাইব্রিড কাঠামো (Hybride Structure)

হায়ারারকিক্যাল কাঠামো : এই কাঠামোতে ওয়েব পেইজগুলো বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত থাকে। ফলে ব্যবহারকারীগণ সহজে বুঝতে পারে কোথায় কি আছে। এই কাঠামোতে মূল বিষয়গুলো থেকে মেনু, সাব-মেনু এভাবে ভাগ করা হয়। এই কাঠামো অনেক জনপ্রিয় ও সহজ।

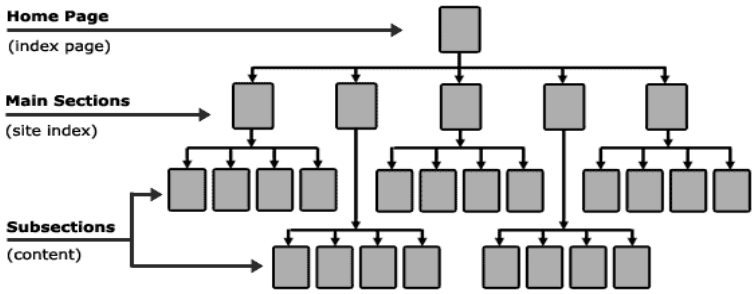

চিত্র ৭.২.১: হায়ারারকিক্যাল কাঠামো

লিনিয়ার কাঠামো : এই ধরনের কাঠামোতে পেইজগুলো একটি নির্দিষ্ট সিকুয়েন্স অনুযায়ী সাজানো থাকে। কোন পেইজ কোন পেইজের পরে হবে তা ওয়েব ডিজাইনের সময় ঠিক করা হয়। এই ধরনের পেইজগুলোতে সাধারণত Next, previous, Last, First ইত্যাদি অনুযায়ী সাজানো থাকে।

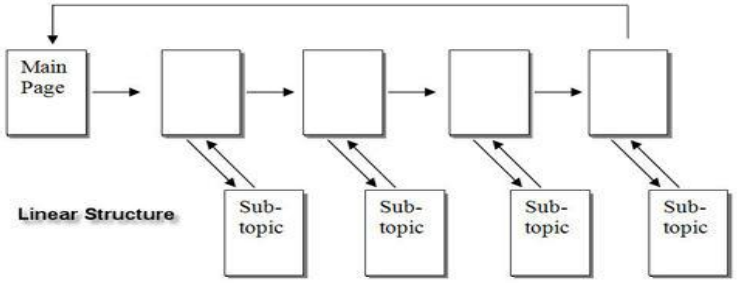

চিত্র ৭.২.২: লিনিয়ার কাঠামো

নেটওয়ার্ক কাঠামো : এই কাঠামোতে ওয়েব সাইটের সকল পেইজ একটি অপরটির সাথে যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক পেইজের একে অপরের সাথে লিংক থাকে। হোম পেইজের সাথে যেমন অন্যান্য পেইজের লিংক থাকে তেমনি অন্যান্য পেইজে নিজেদের মধ্যে এবং হোম পেইজের সাথে লিংক থাকে।

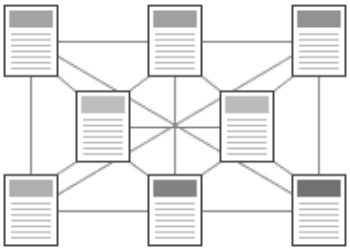

চিত্র ৭.২.৩: নেটওয়ার্ক কাঠামো

হাইব্রিড কাঠামো : এই কাঠামোটি একাধিক কাঠামোর সমন্বয়ে গঠিত। এ কারণে একে কম্বিনেশনাল কাঠামোও বলা হয়ে থাকে। সাধারণত ওয়েবসাইটের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এই কাঠামো ব্যবহার করা হয়।

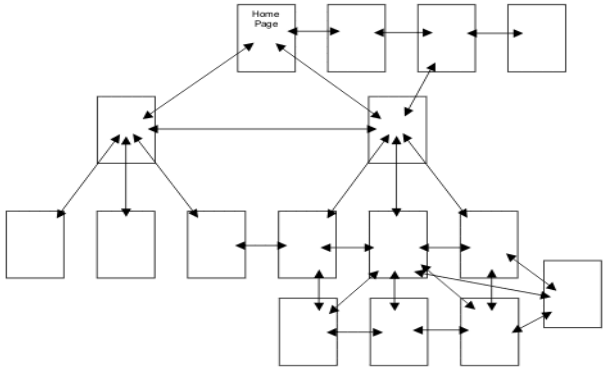

চিত্র ৭.২.৪: হাইব্রিড কাঠামো

গঠন বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করে ওয়েবসাইটকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট
- ডাইনামিক ওয়েবসাইট

স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট: যে সকল ওয়েব পেইজ পূর্ব থেকে তৈরীকৃত কিছু তথ্য প্রদর্শন করে থাকে এবং কোড পরিবর্তন না করে কনটেন্ট যুক্ত করা, ডিলিট এবং অ্যাপডেট করা যায় না সে সকল ওয়েবসাইটকে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বলে। সাধারণত HTML এবং CSS ব্যবহার করে এসব ওয়েবসাইটের পেইজ তৈরী করা হয়।

ডাইনামিক ওয়েবসাইট: যে সকল ওয়েব পেইজে সবসময় আপডেটেড তথ্য প্রদর্শন করা হয় এবং কোড পরিবর্তন না করেই কনটেন্ট যুক্ত করা, ডিলিট এবং অ্যাপডেট করা যায় সে সকল ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক ওয়েবসাইট বলে। যেমন- ক্রিকেট খেলার লাইভ স্কোর দেখানোর জন্য যে ওয়েবসাইট আছে সেটি ডাইনামিক ওয়েবসাইট। সাধারণত পিএইচপি (PHP), এএসপি (ASP), জেএসপি(JSP) ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করে ডাইনামিক ওয়েব পেইজ তৈরী করা হয়ে থাকে।

৭.২.২ স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট ও ডাইনামিক ওয়েবসাইটের মধ্যে তুলনা

স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট	ডাইনামিক ওয়েবসাইট
১। নির্দিষ্ট সংখ্যক পেইজ থাকে।	১। ডাইনামিকভাবে পেইজ তৈরি করা হয়।
২। ওয়েবসাইটের থিম এবং কন্টেন্ট নির্দিষ্ট।	২। ওয়েবপেইজ ডিজাইন এবং কন্টেন্ট রান টাইমে পরিবর্তিত হয়।
৩। সাধারণত ডাটাবেজ সার্ভার ব্যবহার করা হয় না।	৩। ডাটাবেজ সার্ভার ব্যবহার করা হয়।
৪। ওয়েবপেজ পরিবর্তন করলে পুনরায় আপলোড করতে হয়।	৪। সার্ভার এপ্লিকেশন ব্যবহার করে কন্টেন্ট পেইজ পরিবর্তন করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট ও ডাইনামিক ওয়েবসাইটের সুবিধা ও অসুবিধার ওপর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

একটি ওয়েবসাইট মূলত কতগুলো ওয়েব পেইজের সমষ্টি। যে সকল ওয়েব পেইজ পূর্ব থেকে তৈরীকৃত কিছু তথ্য প্রদর্শন করে থাকে সে সকল ওয়েবসাইটকে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট বলে। অন্যদিকে যে সকল ওয়েব পেইজে সবসময় আপডেটেড তথ্য প্রদর্শন করা হয় সে সকল ওয়েবসাইটকে ডাইনামিক ওয়েবসাইট বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ওয়েবসাইটের কাঠামো কত ধরনের?

ক) ৩ খ) ৪
গ) ৫ ঘ) ৬

২। কোন ধরনের ওয়েবসাইটে থিম এবং কন্টেন্ট নির্দিষ্ট থাকে?

ক) স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট খ) ডাইনামিক ওয়েবসাইট
গ) কন্সট্যান্ট ওয়েবসাইট ঘ) সবগুলো

পাঠ-৭.৩ HTML এর মৌলিক বিষয়সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- HTML কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- HTML এর মৌলিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	HTML, HTML Tag।

৭.৩.১ এইচটিএমএল (HTML)

HTMLএর পুরো অর্থ হলো 'হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাংগুয়েজ (Hyper Text Markup Language)। প্রকৃত অর্থে এটি কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা নয় বরং একটি মার্কআপ ভাষা যা মার্কআপ ট্যাগ এর সমন্বয়। ওয়েব পেইজকে বর্ণনা করার জন্য এসব মার্কআপ ট্যাগগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৭.৩.২ HTML-এ ফাইল তৈরি ও দেখার নিয়ম

HTML লেখার জন্য একটি টেক্সট এডিটর সফ্টওয়্যারের প্রয়োজন হয়। এডিটর সফ্টওয়্যার হিসেবে সাধারণত Notepad, Wordpad, Front Page ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। টেক্সট এডিটর ব্যবহার করে HTML ফাইল তৈরির পর যে কোন একটি ব্রাউজার সফ্টওয়্যার (Internet Explorer বা Mozilla Firefox) দিয়ে HTML ফাইলটি ওপেন করলেই ওয়েব পেইজটি দৃশ্যমান হবে।

৭.৩.৩ HTML Tag

HTML মার্কআপ ভাষায় ব্যবহৃত ট্যাগকেই সাধারণত HTML ট্যাগ বলা হয়। HTML tags একটি অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট < > দ্বারা আবৃত একটি কী-ওয়ার্ড। যেমন– <html>। HTML tags সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় লেখা হয়। যেমন– এবং । প্রথম ট্যাগকে Start tag বা opening tag এবং শেষ ট্যাগকে end tag বা closing tag বলে। শেষ ট্যাগটি back slash (/) দ্বারা লিখতে হয়। <html> ট্যাগের মধ্যেই ডকুমেন্টের সবকিছু অবস্থান করে। <html> ট্যাগটি <head> tag ও <body> tag এই দুইটি অংশে বিভক্ত। HTML-এর কোড ইংরেজি বড় হাতের, ছোট হাতের কিংবা উভয় হাতের মিশ্রণে লেখা যায়। তাই <title> এর পরিবর্তে <TITLE> লেখা যায়।

৭.৩.৪ HTML Document

ওয়েব পেইজই হচ্ছে HTML ডকুমেন্ট। HTML ডকুমেন্টকে ওয়েবপেইজের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। HTML ডকুমেন্টের মধ্যে HTML tags এবং plain text থাকে। বিভিন্ন ওয়েব ব্রাউজারের (যেমন – ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, ফায়ারফক্স প্রভৃতি) প্রধান কাজ হচ্ছে HTML ডকুমেন্টের বিষয়বস্তু পড়া এবং সেগুলোকে ওয়েবপেজের মাধ্যমে প্রদর্শন করা। ওয়েব ব্রাউজার HTML tags প্রদর্শন করতে পারে না কিন্তু ওয়েবপেজের বিষয়বস্তু অনুবাদ করার জন্য HTML tag ব্যবহার করা হয়। HEAD, BODY, Paragraph, lists, tables প্রভৃতি হচ্ছে HTML ডকুমেন্টের উপাদান। HTML ট্যাগের মধ্যে কিছু উপাদানের এ্যাট্রিবিউট থাকতে পারে, যা উপাদানের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। যেমন– ফন্ট সাইজ, ফন্টের অবস্থান, ইমেজের উৎস প্রভৃতি।

৭.৩.৫ HTML ফাইল এর গঠন

HTML এ লিখিত প্রোগ্রামকে দুটি সেকশন বা অংশে ভাগ করা যায়। যেমন-

১. হেড সেকশন (Head Section) ও
২. বডি সেকশন (Body Section)

হেড সেকশন ঃ <head> ট্যাগের মাধ্যমে হেড সেকশনের শুরু নির্দেশ করে। <head>...</head> এই ট্যাগের মধ্যে <title> <link> <meta> <style> এবং <script> এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্যাগগুলো রাখা হয়। এই ট্যাগগুলির মাধ্যমে ব্রাউজারে ওয়েব পেইজ সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য প্রদর্শনের পাশাপাশি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কাজ করা যায়।

বডি সেকশন ঃ <body> ট্যাগের মাধ্যমে বডি সেকশনের শুরু নির্দেশ করে। <body>..... </body> এই ট্যাগের মধ্যবর্তী বিষয়গুলো ব্রাউজারের উইন্ডোতে প্রদর্শিত হয়।

HTML file শুরু হয় <html> ট্যাগ দিয়ে এবং শেষ হয় </html> ট্যাগ দিয়ে। একটি HTML file এর সাধারণ গঠন বা basic structure নিম্নরূপ-

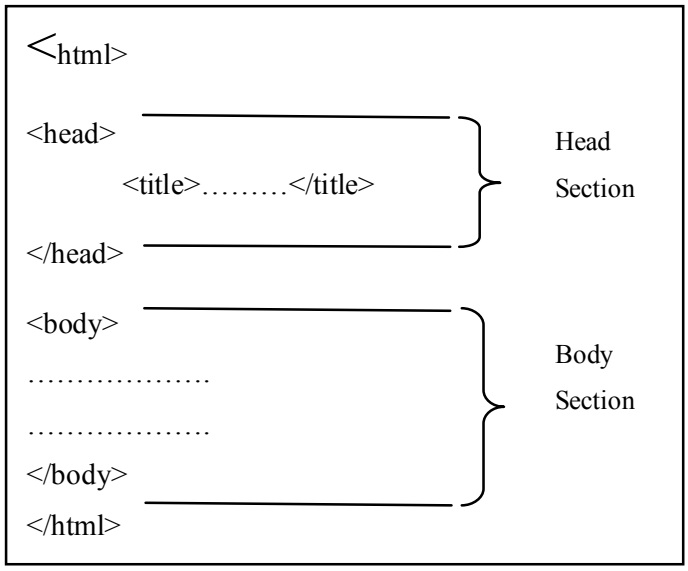

উদাহরণ ঃ Education System of Bangladesh শিরোনাম দিয়ে একটি ওয়েবপেজ তৈরির HTML কোড যার বডিতে Welcome To ICT লেখাটি থাকবে।

সমাধান ঃ নোডপ্যাড এ নিম্নোক্তটি লিখে যে কোন একটি নাম দিয়ে ফাইলটি html বর্ধিতাংশ লিখে একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডারে সংরক্ষণ করতে হবে।

```
<html>
<head>
<title> Education System Of Bangladesh </title>
</head>
<body>
<h1> Welcome To ICT.</h1>
</body>
</html>
```

ফলাফল ঃ যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার (Internet Explorer / Mozilla Firefox) ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি রান করলেই আউটপুট দেখা যাবে যা নিম্নরূপ-

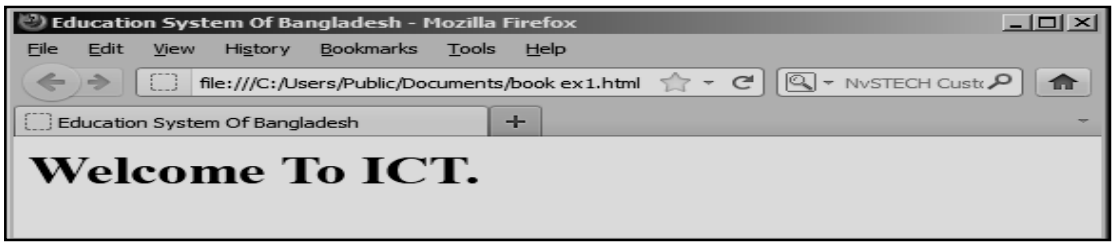

শিক্ষার্থীর কাজ	Bangladesh Open University শিরোনাম দিয়ে একটি ওয়েবপেজ তৈরির HTML কোড লিখুন যার বডিতে We live in Bangladesh. লেখাটি থাকবে।

সারসংক্ষেপ

সাধারণত HTML ডকুমেন্ট বা ফাইল কিছু মার্কআপ ট্যাগ ও এ্যাট্রিবিউটের সমন্বয়ে তৈরি। একটি ওয়েব পেইজের বিভিন্ন অংশ ব্রাউজারের মাধ্যমে কেমনভাবে প্রদর্শিত হবে তা মার্কআপ ট্যাগের উপর নির্ভর করে। এই মার্কআপ ট্যাগ একজোড়া এঙ্গেল ব্র্যাকেটের (< >) মধ্যে লেখা হয়। ট্যাগগুলো সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় লেখা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। HTML ডকুমেন্টের উপাদান কোনটি?

ক) Paragraph খ) table
গ) list ঘ) সবগুলোই

২। HTML এর পুরো নাম হলো-

ক) Hyper Text Makeup Language খ) Higher Text Markup Language
গ) Hyper Text Markup Language ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৪ HTML ট্যাগ ও সিনট্যাক্স পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- HTML ট্যাগ কি তা বলতে পারবেন।
- HTML ট্যাগের গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- HTML সিনট্যাক্স ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	HTML ট্যাগ, সিনট্যাক্স।

৭.৪.১ HTML ট্যাগ

ট্যাগ হলো মার্কআপ ভাষায় ব্যবহৃত এক ধরনের সংকেত বা কীওয়ার্ড । এই সংকেতগুলো নির্দিষ্ট কিছু নির্দেশ বহন করে। ট্যাগগুলো যে নির্দেশ বহন করে তা ব্রাউজারের সাথে যুক্ত ইন্টারপ্রেটার অনুবাদ করে এবং ট্যাগের নির্দেশকে কার্যকরী করে । বিভিন্ন ধরনের ল্যাংগুয়েজ ভেদে ট্যাগের প্রকৃতি ও ব্যবহারিক নিয়ম কানুন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। HTML ট্যাগ ব্যবহারে সাধারণ কয়েকটি নিয়ম হলো-

১. ট্যাগ এ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট এর মধ্যে রাখতে হয় ।
২. Container Tag এর ক্ষেত্রে শুরুর ট্যাগ ব্যবহার করলে অবশ্যই সমাপনী ট্যাগ ব্যবহার করতে হয় ।
৩. ট্যাগের বানান শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক ।
৪. প্রতিটি ট্যাগের একটি সুনির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। সেই সীমারেখা ইচ্ছেমত অতিক্রম করা যাবে না ।
৫. শূণ্য (Empty) ট্যাগের ক্ষেত্রে শুধু শুরুর ট্যাগ ব্যবহার করা হয় ।

৭.৪.২ HTML ট্যাগের প্রকারভেদ

মার্কআপ ভাষায় ব্যবহৃত ট্যাগকেই মূলত HTML ট্যাগ বলে । দুটি এ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মাঝে অবস্থিত স্বতন্ত্র উপাদান (Element) নিয়ে HTML ট্যাগ গঠিত । HTML এ দুই ধরনের ট্যাগ ব্যবহৃত হয় । যথা-

১. শূণ্য বা ফাঁকা ট্যাগ (Empty Tag)
২. কনটেইনার বা ধারক ট্যাগ (Container Tag)

শূণ্য বা Empty ট্যাগ

HTML ট্যাগগুলো সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় লেখা হয়। তবে শূণ্য (Empty) ট্যাগের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ট্যাগ এর শুরুর ট্যাগ বা opening tag থাকলেও কোন শেষ বা closing tag থাকে না। কয়েকটি কমন HTML এমটি ট্যাগ হলো ঃ

এমটি ট্যাগ	ব্যবহার বা কাজ
 	লাইন ব্রেকের জন্য ব্যবহৃত হয়।
<hr>	অনুভূমিক (Horizontal) লাইন তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়।
<img>	ওয়েব পেজে চিত্র বা ছবি যুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কনটেইনার বা ধারক ট্যাগ (Container Tag)

যে সকল ট্যাগের ওপেনিং বা শুরু, ট্যাগের বিষয়বস্তু ও ক্লোজিং বা শেষ ট্যাগ থাকে তাদেরকে কনটেইনার ট্যাগ বলে। অর্থাৎ কনটেইনার ট্যাগের শুরুর ট্যাগ বা opening এবং শেষ বা closing ট্যাগ থাকে। যেমন ঃ Text । এখানে কনটেইনার ট্যাগ এবং এর মাঝের Text লিখাটি bold হবে।

উদাহরণ ঃ < b > We live in Bangladesh. </ b > ফলাফল ঃ **We live in Bangladesh.**

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কনটেইনার ট্যাগসমূহ হলো ঃ

ট্যাগ	কাজ বা ব্যবহার	উদাহরণ	ফলাফল
<u>	যে কোন লেখাকে আন্ডারলাইন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।	<u> Have a nice day.</u>	Have a nice day.
<i>	যে কোন লেখাকে ইটালিক করে।	<u> Have a nice time.</u>	*Have a nice time.*
< b >	যে কোন লেখাকে বোল্ড করে।	< b > Welcome to ICT.</ b >	**Welcome to ICT.**
	কোন তালিকাকে অর্ডার লিস্ট আকারে প্রদর্শন করে।	< ol type = "1" > - Bangla - ICT	1. Bangla 2. ICT
	কোন তালিকাকে আন অর্ডার লিস্ট আকারে প্রদর্শন করে।	< ul type = "disc" > - Bangla - ICT	• Bangla • ICT

শিক্ষার্থীর কাজ	এমটি ট্যাগ ও কনটেইনার ট্যাগ ব্যবহার করে Bangladesh Open University শিরোনাম দিয়ে একটি ওয়েবপেজ তৈরির HTML কোড লিখুন যার বডিতে We live in Bangladesh. লেখাটি পর পর ৩ বার থাকবে।

সারসংক্ষেপ

ট্যাগ হলো মার্কআপ ভাষায় ব্যবহৃত এক ধরনের সংকেত বা কীওয়ার্ড । সাধারণত HTML ট্যাগগুলো জোড়ায় জোড়ায় লেখা হয়। HTML এ এমটি ট্যাগ(Empty Tag) ও কনটেইনার ট্যাগ (Container Tag) এই দুই ধরনের ট্যাগ ব্যবহৃত হয়। যে সকল ট্যাগের ওপেনিং বা শুরু, ট্যাগের বিষয়বস্তু ও ক্লোজিং বা শেষ ট্যাগ থাকে তাদেরকে কনটেইনার ট্যাগ বলে। আর যে সকল ট্যাগের ওপেনিং বা শুরুর ট্যাগ থাকলেও শেষ ট্যাগ থাকে না তাদেরকে এমটি ট্যাগ(Empty Tag) বলে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ট্যাগ হলো মার্কআপ ভাষায় ব্যবহৃত এক ধরনের-

ক) সংকেত খ) আউটপুট
গ) ইন্টারপ্রেটার ঘ) সবগুলোই

২। যে সকল HTML ট্যাগে শুরু বা শেষ ট্যাগের মাঝে কনটেন্ট এলিমেন্ট থাকে কি বলে?

ক) <HTML> শুরু ট্যাগ খ) Container Tag
গ) Empty Tag ঘ) কোনটাই নয়

পাঠ-৭.৫ HTML নকশা ও কাঠামো লেআউট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- HTML নকশা ও কাঠামো লেআউট এর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	HTML নকশা , কাঠামো লেআউট

৭.৫.১ HTML নকশা ও কাঠামো লেআউট

ওয়েবপেজে লে-আউট ডিজাইন করার জন্য এইচটিএমএল ব্যবহার করা হয়। তবে বর্তমানে এইচটিএমএল এবং সিএসএস (CSS) একত্রে ব্যবহার করে লেআউট তৈরি করা হচ্ছে। এইচটিএমএল দিয়ে তৈরী কোন ওয়েব পেজের দুটি অংশ থাকে। যথা-

- হেড অংশ (Head Section)
- বডি অংশ (Body Section)

হেড অংশ : এই অংশে সাধারণত পেইজের টাইটেল বা শিরোনাম থাকে। এছাড়া ওয়েবপেইজের ধরন, সার্চ ইঞ্জিনের জন্য কী-ওয়ার্ড ও প্রয়োজনীয় কোড থাকে হেড অংশে।

বডি অংশ : এই অংশটি ওয়েব পেইজের মূল অংশ। ওয়েব পেইজের প্রদর্শিত অংশ এখানে থাকে। বিভিন্ন ধরনের টেক্সট, ছবি প্রদর্শনের কোড, টেবিল, ফর্মের যাবতীয় উপাদান এই অংশে থাকে।

কোন একটি ওয়েবপেইজের লেআউটের মাধ্যমে ওয়েবপেইজের বিভিন্ন উপাদানগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়। সাধারণত একটি সুশৃংখল ওয়েবপেজের লেআউট তৈরি করতে সময় লাগে। নিচের চিত্রে একটি ওয়েবপেইজের লেআউটের গঠন দেখানো হল-

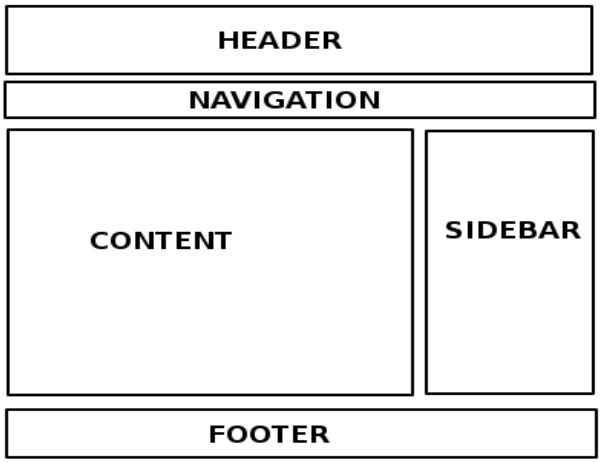

চিত্র ৭.৫.১: HTML কাঠামো লেআউট

ওয়েবপেজের লেআউটের অনেকগুলো ভাগ থাকে। যথা-

- <HEADER> - পেইজের টাইটেল বা শিরোনাম থাকে।
- <NAVGATION> - এই অংশে ওয়েবসাইটের পেইজের লিংক থাকে।
- <CONTENT> - এই অংশে ওয়েবসাইটের পেইজের মূল বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়।
- <SIDEBAR> - সাইডবারে সহায়ক এলিমেন্ট থাকে।

- <FOOTER> - ডকুমেন্টের ফুটার নির্দেশ করে।

৭.৫.২ টেবিল ব্যবহার করে HTML লেআউট তৈরি

সবচেয়ে সহজ ও ভালো উপায় হচ্ছে টেবিল ব্যবহার করে HTML লেআউট তৈরি করা। টেবিলে কলাম ও সারিতে ভাগ করে প্রয়োজনীয় উপাদান সাজানো হয়। নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হল-

```
<html>
<head>
<title>Bangladesh Open University</title>
</head>
<body>
<table width="100%" border="0">
  <tr>
    <td colspan="2" bgcolor="#b5dcb3">
      <h1>Header Image</h1>
    </td>
  </tr>
  <tr valign="top">
    <td bgcolor="#aaa" width="50">
      <b>Main Menu</b><br />
      Home<br />
      About<br />
      Notice...
    </td>
    <td bgcolor="#eee" width="100" height="200">
       Detail about Bangladesh Open University
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2" bgcolor="#b5dcb3">
      <center>
      Copyright © Bangladesh Open University
      </center>
    </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

ওয়েব পেজের আউটপুট নিচে দেখানো হলো-

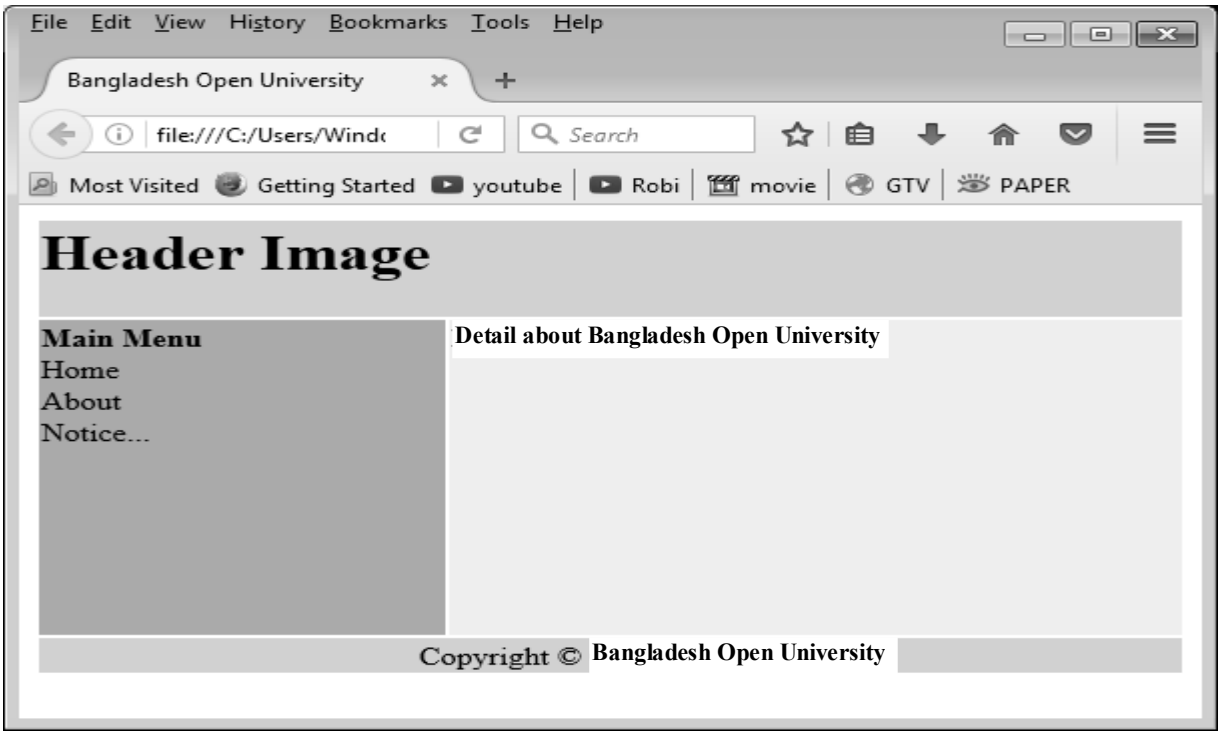

চিত্র ৭.৫.২: টেবিল ব্যবহার করে HTML লেআউট

এছাড়া tag ব্যবহার করে HTML লেআউট তৈরী করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ডিভ ( ) ট্যাগ ব্যবহার করে একটি লেআউট তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

কোন একটি ওয়েবপেজের লেআউটের মাধ্যমে ওয়েবপেইজের বিভিন্ন উপাদানগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়। সাধারণত একটি সুশৃংখল ওয়েবপেইজের লেআউট তৈরী করতে সময় লাগে। ওয়েবপেইজে লেআউট ডিজাইন করার জন্য এইচটিএমএল ব্যবহার করা হয়। তবে বর্তমানে এইচটিএমএল এবং সিএসএস (CSS) একত্রে ব্যবহার করে লেআউট তৈরি করা হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ওয়েবপেইজের লেআউটের উপাদান -

ক. <HEADER> ও <FOOTER> খ. <NAVGATION>
গ. <CONTENT> ঘ. সবগুলোই

২। কোন ওয়েব পেজের কতটি অংশ থাকে কত হয়?

ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৩

পাঠ-৭.৬ HTML টেক্সট ফরমেটিং

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- HTML ট্রেক্সট ফরমেটিং কি জানতে পারবেন।
- HTML ট্রেক্সট এর সাইজ ও এলাইন করতে পারবেন।
- HTML ট্রেক্সট বোল্ড, ইটালিক ও আন্ডারলাইন করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	HTML ট্রেক্সট এলাইন, বোল্ড, ইটালিক, আন্ডারলাইন।

৭.৬.১ HTML ট্রেক্সট ফরম্যাটিং

আউটপুটকে ফরমেটিং করার জন্য HTML এর <b> এবং <i> এর মতো ট্যাগগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই দুটি ট্যাগের মাধ্যমে টেক্সটকে বোল্ড এবং ইটালিক করা যায়। এ ধরনের আরও অনেক ট্যাগ রয়েছে যেগুলোকে ফরমেটিং ট্যাগ বলে। ফরমেটিং ট্যাগগুলোর একটি বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

ফরমেটিং ট্যাগ	বর্ণনা
<b>	টেক্সটকে বোল্ড করতে ব্যবহৃত হয়।
<big>	টেক্সটকে বড় করে দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
<u>	টেক্সটকে আন্ডারলাইন করতে ব্যবহৃত হয়।
<i>	টেক্সটকে ইটালিক করতে ব্যবহৃত হয়।
<small>	টেক্সটকে ছোট করে দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
	টেক্সটকে স্ট্রং করে দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
<sub>	সাবস্ক্রিপ্ট টেক্সট দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
<sup>	সুপারস্ক্রিপ্ট টেক্সট দেখাতে ব্যবহৃত হয়।
<ins>	ইনসার্টকৃত টেক্সট নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। টেক্সটের নিচে আন্ডারলাইন প্রদর্শিত হয়।
<del>	কোনো টেক্সটের মাঝখানে দাগ টেনে সেটি ডিলিট করা হয়েছে এমন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ ঃ Bangladesh Open University লেখাটি আলাদা আলাদাভাবে বোল্ড, ইটালিক এবং আন্ডারলাইন অবস্থায় প্রদর্শনের জন্য HTML ভাষার প্রোগ্রাম :

```
<html>
<body>
        <br> <b> Bangladesh Open University </b>
        <br> <i> Bangladesh Open University </i>
        <br> <u> Bangladesh Open University </u>
</body>
</html>
```

ফলাফল ঃ যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার (Internet Explorer / Mozilla Firefox) ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি রান করলেই নিমোক্ত আউটপুট পাওয়া যাবে-

Bangladesh Open University
Bangladesh Open University
Bangladesh Open University

৭.৬.২ Text Alignment নির্ধারণ

স্টাইল এ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে HTML ডকুমেন্টের এলিমেন্টের জন্য একটি স্টাইল নির্ধারণ করে দেয়া যায়। এজন্য নিচের HTML প্রোগ্রামটি লক্ষ্য করি যেখানে <h1 style = "text-align : center"> This is heading 1</h1> লিখে একটি হেডিং সৃষ্টি করা হয়েছে যাকে ব্রাউজারের পৃষ্ঠার মাঝ বরাবর দেখাতে style এ style = "text-align : center" লেখা হয়েছে।

```
<html>
<body>
<h1 style = "text-align : center" this is heading 1</h1>
<p> The heading above is aligned to the center of this page. The heading above is aligned to the center of this page. The heading above is aligned to the center of this page. </p>
</body>
<html>
```

যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি রান করলে নিম্নোক্ত আউটপুট পাওয়া যাবে-

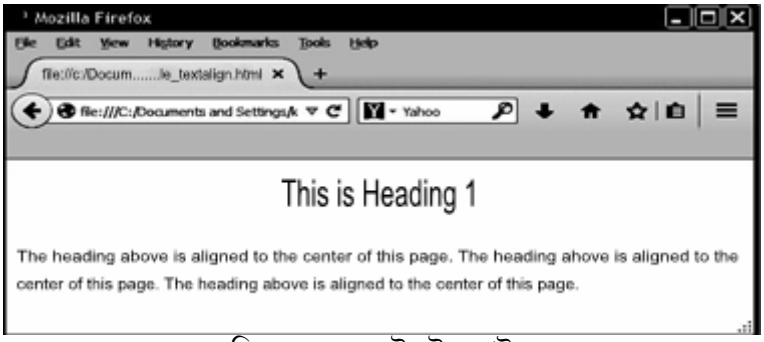

চিত্র ৭.৬.১ : টেক্সট এলাইন

অনুরূপভাবে আমরা কোন প্যারাগ্রাফের টেক্সটকে লেফট এলাইন, রাইট এলাইন করে দেখাতে পারি। এজন্য নিচের ফরমেটিং ব্যবহার করা হয়:

< p align=" left| right| center| justify " >

নিচের প্যারাগ্রাফে ব্যবহৃত বিভিন্ন align এর মান ও তার ফলাফল দেওয়া হল:

Value	কাজ বা ব্যবহার
left	টেক্সটকে বামদিক বরাবর অবস্থান করতে ব্যবহৃত হয়।
right	টেক্সটকে ডানদিক বরাবর অবস্থান করতে ব্যবহৃত হয়।
center	টেক্সটকে মাঝ বরাবর অবস্থান করতে ব্যবহৃত হয়।
justify	টেক্সটকে দুই দিক সমান করতে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণস্বরূপ নিচের প্রোগ্রামটি লক্ষ্য করি-

```
<html>
<head>
</head>
<body>
<P ALIGN=LEFT>This is aligned left. This is the default.</P>
<P ALIGN=CENTER>This is aligned center.</P>
<P ALIGN=RIGHT>This is aligned right.</P>
</body>
</html>
```

উক্ত প্রোগ্রামটি যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে রান করলে নিম্নোক্ত আউটপুট পাওয়া যাবে-

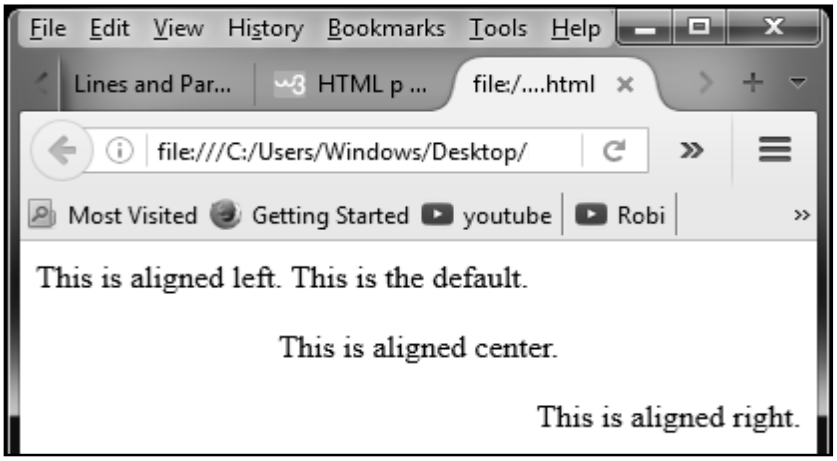

চিত্র ৭.৬.২ : প্যারাগ্রাফ এলাইন

শিক্ষার্থীর কাজ	Bangladesh Open University লেখাটিতে বিভিন্ন এলাইন ব্যবহার করে প্রদর্শনের জন্য HTML ভাষার প্রোগ্রাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ওয়েব পেজের টেক্সটগুলোকে বিভিন্ন গঠনে সাজিয়ে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফরমেটিং। অর্থাৎ ফরমেটিং এর মাধ্যমে লেখাকে ছোট, বড়, আন্ডারলাইন, বোল্ড, ইটালিক ইত্যাদি আকারে ওয়েব পেইজে উপস্থাপন করা যায়। HTML এ বিভিন্ন ট্যাগের সাহায্যে এ ধরনের ফরমেটিং এর কাজগুলো করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। <i> ট্যাগের মাধ্যমে টেক্সটকে কি করা হয়?

ক) বোল্ড খ) ইটালিক
গ) বড় ঘ) সবগুলোই

২। <p align="left "> থাকলে আউটপুট কি রকম হবে?

ক) Left-align text খ) right-align text
গ) center-align text ঘ) justify-align text

পাঠ-৭.৭ HTML ডকুমেন্টে টেবিল যোগ করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- টেবিল ট্যাগের এ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- HTML ডকুমেন্টে টেবিল ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	টেবিল ট্যাগ।

৭.৭.১ এইচটিএমএল টেবিল (HTML Table)

HTML ডকুমেন্টে টেবিল তৈরির জন্য টেবিল <table> ট্যাগ ব্যবহৃত হয়। একটি টেবিল <tr> ট্যাগ দ্বারা রো (Row) তে বিভক্ত থাকে এবং প্রতিটি রো আবার <td> ট্যাগ দ্বারা ডাটা সেলসমূহে বিভক্ত থাকে। td এর মানে হলো "table data" যা একটি ডাটা সেলের কনটেন্ট। একটি ডাটা সেল টেক্সট, ইমেজ, লিস্ট, ফটোগ্রাফ, ফর্ম ইত্যাদি বহন করতে পারে।

টেবিল ট্যাগসমূহ

ট্যাগ	বর্ণনা
<table>	একটি টেবিলকে নির্ধারণ করে।
<th>	টেবিলের হেডারকে নির্ধারণ করে।
<tr>	টেবিলের রো নির্ধারণ করে।
<td>	টেবিলের সেল নির্ধারণ করে।
<caption>	টেবিলের ক্যাপশন নির্ধারণ করে।
<colgroup>	টেবিলের কলামগুলোর গ্রুপসমূহকে নির্ধারণ করে।
<col>	টেবিলের মধ্যে থাকা এক বা একাধিক কলামের জন্য অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু নির্ধারণ করে।
<thead>	টেবিলের হেড নির্ধারণ করে।
<tbody>	টেবিলের বডি নির্ধারণ করে।
<tfoot>	টেবিলের ফুটার নির্ধারণ করে।

উদাহরণ ঃ বিজ্ঞান বিভাগের নিলয়, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের মাসা ও মানবিক বিভাগের নাতাসা 'X' কলেজে অধ্যায়নরত। তাদের রোল নম্বরসমূহ যথাক্রমে 1001, 2001 ও 3001। এই তথ্যসমূহ তিন রো ও তিন কলাম বিশিষ্ট টেবিলে প্রদর্শনের জন্য HTML ভাষার প্রোগ্রাম :

```
<html>
<head>
        <title> 'X' College </title>
</head>
<body>
        <table border = "2">
                <tr>  <th> Name </th>    <th> Group </th>          <th> Roll  </th>   </tr>
                <tr>  <th> Niloy </th>    <th> Science </th>        <th>1001 </th>   </tr>
                <tr>  <th> Masha </th>    <th> Commerce </th>     <th>2001 </th>   </tr>
                <tr>  <th> Natasha </th>  <th> Arts </th>           <th>3001 </th>   </tr>
        </table>
 </body>
</html>
```

ফলাফল ঃ যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি রান করলেই নিম্নোক্ত আউটপুট পাওয়া যাবে-

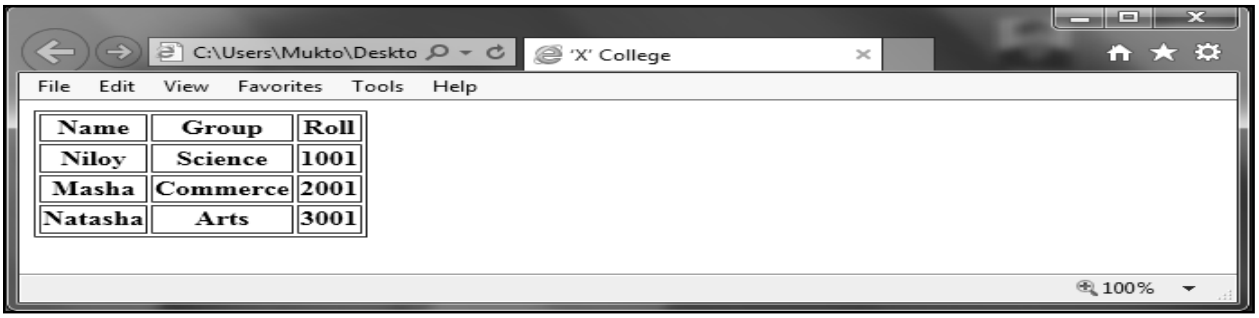

উল্লেখ্য ডিফল্ট হিসেবে টেবিলের চারিদিকে কোনো বর্ডার থাকে না। অর্থাৎ <table > ট্যাগ এর মধ্যে বর্ডার অ্যাট্রিবিউট নির্ধারণ না করে দিলে ব্রাউজারে টেবিলটি বর্ডার ছাড়াই প্রদর্শিত হয়। তবে ব্যবহারকারী ইচ্ছেমত বর্ডারের মান নির্ধারণ করে দিতে পারে। যেমন- <table border = "1">; <table border = "3"> ইত্যাদি।

৭.৭.২ Rowspan ও Colspan এ্যাট্রিবিউট

টেবিলের একাধিক সারি বা রো-কে একটি সেলে বা রো-তে রূপান্তরিত করার জন্য rowspan এবং একাধিক কলামকে একটি কলামে বা সেলে রূপান্তরিত করার জন্য colspan এ্যাট্রিবিউট ব্যবহৃত হয়। যেমন-

<th rowspan="2"> অদ্রুপ, <th colspan="2">

<td rowspan="2"> <td colspan="2">

উদাহরণ ঃ

```
<html>
<body>
<table border ="1">
<caption> Table: Student's Information</caption>
<tr>  <td> Department </td>  <td> Section </td>  <td> Male </td>  <td> female  </td>  </tr>
<tr>  <td rowspan ="2"> Science</td> <td> Neutron </td> <td>150</td> <td> 120  </td>  </tr>
<tr>  <td> proton </td> <td>200</td>  <td> 100  </td>  </tr>
<tr>  <td colspan ="2"> Total </td>  <td colspan = "2"> 570 </td>  </tr>
 </table>
 </body>
</html>
```

উক্ত প্রোগ্রামটি যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে রান করলে নিম্নোক্ত আউটপুট পাওয়া যাবে-

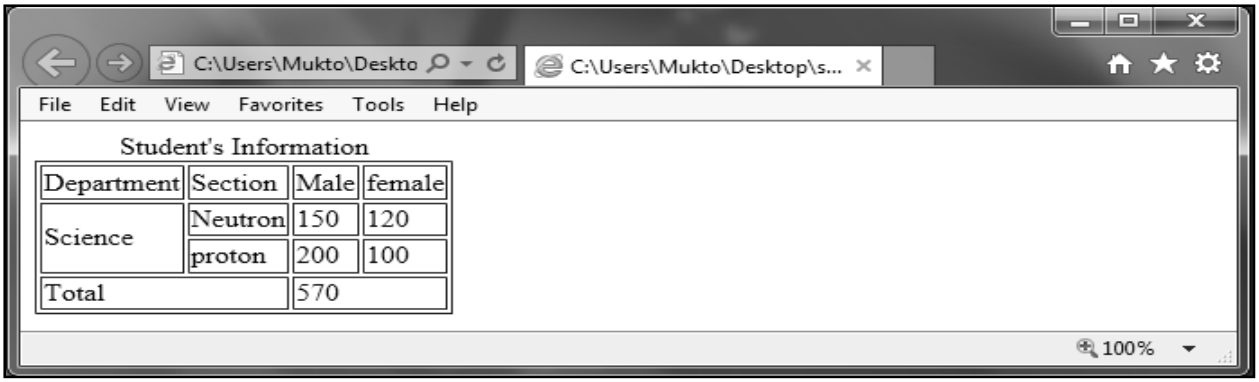

শিক্ষার্থীর কাজ	'X' কলেজে অধ্যায়নরত ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের চারজন শিক্ষার্থীর রোল নম্বরসমূহ যথাক্রমে 1001, 1002, 1003 ও 1004। তাদের CGPA রেজাল্ট যথাক্রমে 4.25, 4.50, 5.00 ও 4.00। এই তথ্যসমূহ দিয়ে চার রো ও চার কলাম বিশিষ্ট টেবিল প্রদর্শনের HTML ভাষার প্রোগ্রাম লিখুন ।

সারসংক্ষেপ

ভিন্ন ধরনের কোনো বৃহৎ আকারের ডাটাকে সারিবদ্ধভাবে বা ছকবদ্ধভাবে প্রকাশের পদ্ধতিই হলো টেবিল। সাধারণত ওয়েব পেইজের তথ্যকে সারি এবং কলাম আকারে বিন্যস্ত করে প্রদর্শনের জন্য টেবিল ব্যবহৃত হয়। HTML -এ টেবিল তৈরিতে <table> ট্যাগ ব্যবহৃত হয়। আর টেবিলে সারি বা রো তৈরির জন্য <tr> এবং ডাটা সেল তৈরির জন্য <td> ট্যাগ ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। টেবিলের রো তৈরিতে নিচের কোন ট্যাগটি ব্যবহৃত হয়?

ক. <TR> খ.<TD>
গ.<TH> ঘ.

২। টেবিলের সেল তৈরিতে নিচের কোন ট্যাগটি ব্যবহৃত হয়?

ক. <TR> খ.<TD>
গ.<TH> ঘ.

পাঠ-৭.৮ HTML ডকুমেন্টে ফর্ম যোগ করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- HTML ডকুমেন্ট এ ফর্ম তৈরির ট্যাগসমূহ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- HTML ব্যবহার করে ফর্ম তৈরির প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ফর্ম, চেক বক্স, বাটন ।

৭.৮.১ ফর্ম

HTML ডকুমেন্টে ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য ফর্ম (form) তৈরি করা হয়। আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের ডাটা ওয়েব পেজে প্রদান করে থাকি। যেমন, কোন কোন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার সময় নাম, ই-মেইল আইডি, পাসওয়ার্ড ইত্যাদি প্রদান করে থাকি। ফর্মের মাধ্যমে তথ্য নিয়ে সাধারণত সংরক্ষণ করা হয়। HTML ডকুমেন্টে ফর্ম দিয়ে অনেক ধরনের ডাটা সংগ্রহ করা হয়। <form> ট্যাগের সাহায্যে ফর্ম দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। <form> এর গঠন নিম্নরূপ-

```
<form>
form elements
</form>
```

নিচে একটি HTML ফর্ম এর উদাহরণ দেওয়া হল-

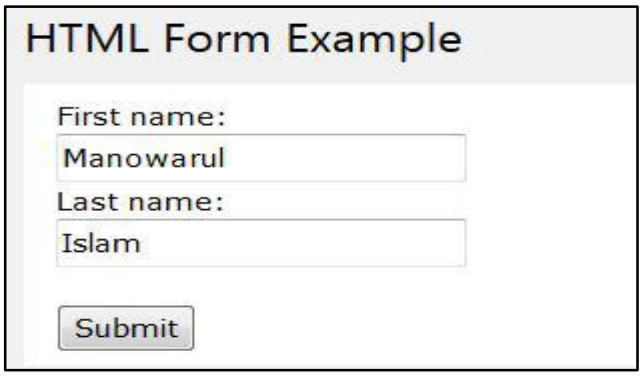

চিত্র ৭.৮.১: একটি সাধারণ ফর্ম

চিত্রে দুইটি টেক্সট ফিল্ড First name ও Last name, যেখানে টেক্সট ইনপুট দিতে পারব।

<form> ট্যাগের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট যেমন- টেক্সট, চেক বক্স, বাটনসহ অনেক এলিমেন্ট থাকে।

৭.৮.২ HTML ফর্ম এলিমেন্ট

অনেক ধরনের এলিমেন্ট দিয়ে HTML পেইজে ইনপুট নেয়া যায়। যেমন-

- টেক্সট ইনপুট (Text Input)
- চেক বক্স (Check Box)
- রেডিও বক্স (Radio Box)
- সিলেক্ট বক্স (Select Box)
- বাটন (Submit and Reset Button)

৭.৮.৩ <input> এলিমেন্ট

ফর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলিমেন্ট হল input । নিচে এর গঠন দেখানো হল:

< input type=" " >

<input> এলিমেন্টের type এট্রিবিউটের বিভিন্ন মানের উপর ভিত্তি করে অনেক ধরনের ইনপুট নেয়া যায়। নিচে এর কিছু এট্রিবিউটের কাজ দেখানো হল:

Type এর ভ্যালু	বর্ণনা
<input type="text">	এক লাইনের টেক্সট ইনপুট নেয়া হয়।
<input type="radio">	কোন কিছু সিলেক্ট করার জন্য রেডিও বাটন ইনপুট নেয়া হয়।
<input type="submit">	ফর্ম থেকে ডাটা প্রসেস করে ডাটা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

৭.৮.৪ টেক্সট ইনপুট

এক লাইনের টেক্সট ইনপুট নেওয়ার জন্য <input type = "text"> ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসেবে নিচের প্রোগ্রামটি লক্ষ্য করি-

```
<html>
<head>
<title>Text Input Control</title>
</head>
<body>
<form >
First name:  <input type="text" name="first_name" />  <br>
Last name:  <input type="text" name="last_name" />
</form>
</body>
</html>
```

উক্ত প্রোগ্রামটি যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার (যেমন- Internet Explorer / Mozilla Firefox) ব্যবহার করে রান করলে নিচের আউটপুট পাওয়া যাবে-

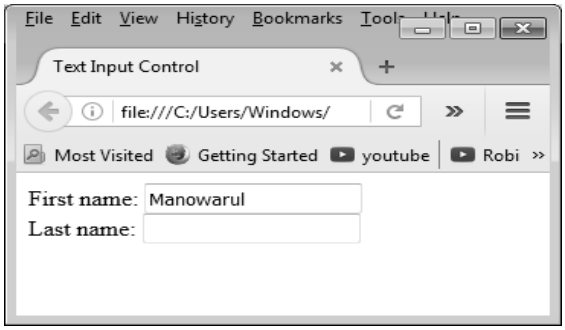

চিত্র ৭.৮.২: HTML টেক্সট ইনপুট

৭.৮.৫ পাসওয়ার্ড ইনপুট

আমরা অনেক ওয়েব সাইটে প্রবেশের জন্য ইউজার আইডি ইনপুট করি। পাসওয়ার্ড ইনপুট নেওয়ার জন্য <input type="password"> ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসেবে নিচের প্রোগ্রামটি লক্ষ্য করি-

```
<html>
<head>
<title>Password Input Control</title>
</head>
<body>
<form >
```

```
User ID :  <input type="text" name="user_id" > <br>
Password:  <input type="password" name="password" >
</form>
</body>
</html>
```

উক্ত প্রোগ্রামটি যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে রান করলে নিচের আউটপুট পাওয়া যাবে-

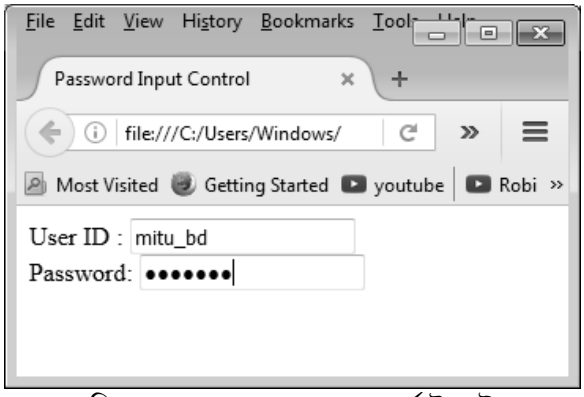

চিত্র ৭.৮.৩: HTML পাসওয়ার্ড ইনপুট

৭.৮.৬ রেডিও বাটন

অনেক ধরনের অপশন থেকে পছন্দের বা সঠিক অপশন নির্বাচনের জন্য রেডিও বাটন ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসেবে নিচের প্রোগ্রামটি লক্ষ্য করি-

```
<html>
<head>
<title>Radio Box Control</title>
</head>
<body>
<form> Enter your choise:
<input type="radio" name="subject" value="maths"> Maths
<input type="radio" name="subject" value="physics"> Physics
</form>
</body>
</html>
```

উক্ত প্রোগ্রামটি যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার (যেমন- Internet Explorer / Mozilla Firefox) ব্যবহার করে রান করলে নিচের আউটপুট পাওয়া যাবে-

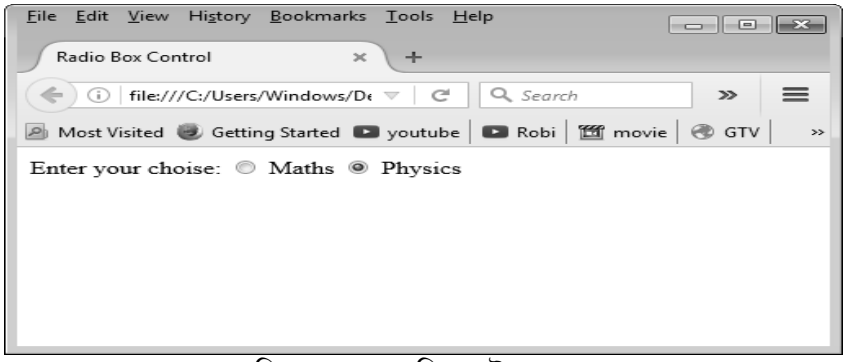

চিত্র ৭.৮.৪: রেডিও বাটন

৭.৮.৭ সিলেক্ট অপশন

অনেক ধরনের অপশন থেকে পছন্দের বা সঠিক অপশন নির্বাচনের জন্য সিলেক্ট এট্রিবিউট ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসেবে নিচের প্রোগ্রামটি লক্ষ্য করি-

```
<html>
<head>
<title>Select Box Control</title>
</head>
<body>
<form>
Enter you option
<select name="dropdown">
<option value="Maths" selected>Maths</option>
<option value="Physics">Physics</option>
</select>
</form>
</body>
</html>
```

উক্ত প্রোগ্রামটি যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার (যেমন- Internet Explorer / Mozilla Firefox) ব্যবহার করে রান করলে নিচের আউটপুট পাওয়া যাবে-

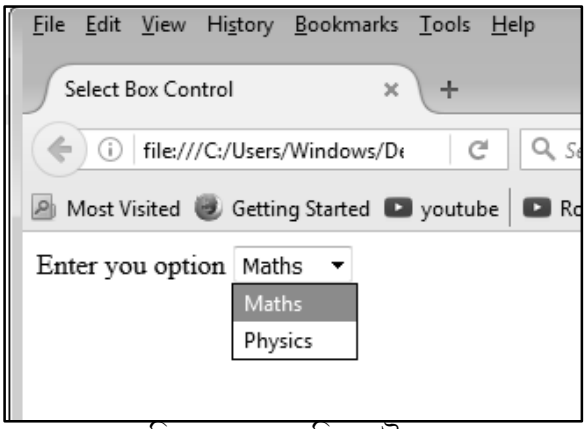

চিত্র ৭.৮.৫: রেডিও বাটন

৭.৮.৮ সাবমিট বাটন

ফর্মের সকল ডাটা নির্ধারিত সার্ভারে পাঠানোর জন্য সাবমিট বাটন ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ হিসেবে নিচের প্রোগ্রামটি লক্ষ্য করি-

```
<html>
<head>
<title>File Upload Box</title>
</head>
<body>
<form>
First name:  <input type="text" name="first_name" />
<br>
Last name:  <input type="text" name="last_name" />
```

```
<br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit" />
</form>
</body>
</html>
```

উক্ত প্রোগ্রামটি যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে রান করলে নিচের আউটপুট পাওয়া যাবে-

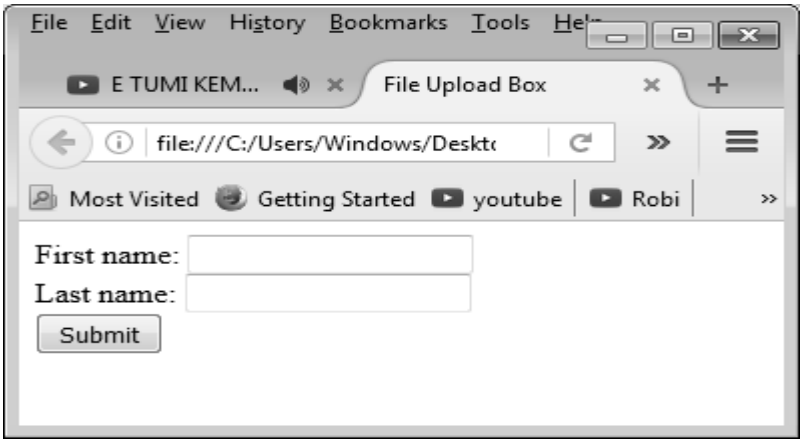

চিত্র ৭.৮.৬ সাবমিট বাটন

শিক্ষার্থীর কাজ	ইনপুট, রেডিও বাটন, চেকবক্স ও সাবমিট বাটন ইত্যাদি এলিমেন্ট ব্যবহার একটি ফর্ম তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

ওয়েব পেইজে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে তথ্য ইনপুট দেওয়ার জন্য বা কোন ডাটা নেওয়ার জন্য যে ডিজাইন করা হয় তাকে ফর্ম বা HTML- ফর্ম বলে। HTML এর সাহায্যে ফর্ম তৈরি করে ওয়েব পেইজ আরও আর্কষণীয় করে তোলা যায়। <form> ট্যাগের সাহায্যে ফর্ম দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। <form> ট্যাগের ভিতরে বিভিন্ন ধরনের এলিমেন্ট যেমন- টেক্সট, চেক বক্স, বাটনসহ অনেক এলিমেন্ট থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অনেক ধরনের অপশন থেকে পছন্দের বা সঠিক অপশন নির্বাচনের জন্য নিচের কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক) রেডিও বাটন খ) টেক্সট
গ) সাবমিট বাটন ঘ) সবগুলো

২। ফর্মের সকল ডাটা নির্ধারিত সার্ভারে পাঠানোর জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয়?

ক) সাবমিট বাটন খ) রেডিও বাটন
গ) সিলেক্ট বাটন ঘ) কোনটাই নয়

পাঠ-৭.৯ HTML ডকুমেন্টে ইমেজ ও লিঙ্ক যোগ করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- HTML ডকুমেন্টে হাইপারলিঙ্ক যোগ করে প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবেন।
- HTML ডকুমেন্টে ইমেজ বা ছবি যোগ করার প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হাইপারলিংক, ইমেজ বা ছবি যোগ ।

৭.৯.১ হাইপারলিংক

হাইপারলিংক হলো ওয়েবের একটি রিসোর্সে অবস্থিত কোনো রেফারেন্স (কোনো ঠিকানা) যার সাহায্যে পাঠক সরাসরি তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। HTML পেইজ, ইমেজ, সাউন্ড ফাইল, মুভি ইত্যাদি রিসোর্সকে হাইপারলিংক দিয়ে নির্দেশ করা যায়। কোনো ডকুমেন্টের অভ্যন্তরে হাইপারলিংকের গন্তব্যকে নির্ধারণ করার জন্য অ্যাঙ্কর টার্মটি ব্যবহৃত হয়। হাইপারলিংক এবং অ্যাংকর উভয়ই নির্ধারণ করতে HTML অ্যাংকর এলিমেন্ট < a > ব্যবহৃত হয়। HTML লিংকের সিনটেক্স হলো :

Link text

স্টার্ট ট্যাগটি লিংকের এ্যাট্রিবিউট বহন করে। এলিমেন্ট কনটেন্ট (লিংক টেক্সট) যে অংশটি প্রদর্শিত হবে সেটি নির্ধারণ করে। এলিমেন্ট কনটেন্টটিকে যে টেক্সটই হতে হবে তেমন নয়। কোনো ইমেজ বা যে কোনো HTML এলিমেন্ট থেকে লিংক ও হতে পারে। আর href এ্যাট্রিবিউট লিংকের ঠিকানা নির্ধারণ করে।

উদাহরণঃ গুগল সার্চ ওয়েবসাইটটিকে ওয়েবপেজে সংযোজনের HTMLভাষার প্রোগ্রাম :

```
<html>
<head>
        <title> Adding Hyperlink in a webpage </title>
</head>
<body>
      <b> Adding another website in webpage</b> <br>
         <a href = “http:\\ www.google.com”> Search Item</a> <br>
</body>
</html>
```

ফলাফল ঃ যে কোন ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ফাইলটি রান করলেই নিম্নোক্ত আউটপুট পাওয়া যাবে-

Adding another website in webpage
Search Item

৭.৯.১ HTML ডকুমেন্টে ইমেজ যোগ করা

প্রায় প্রতিটি ওয়েব পেইজে ব্যানারসহ বিভিন্ন ধরনের ছবি দেখা যায়। HTML এর সাহায্যে কোন ওয়েব পেজে অতি সহজে ব্যানারসহ যে কোন ধরনের ছবি যোগ করা যায়। ওয়েব পেইজে ছবি বা গ্রাফিক্স যোগ করার জন্য <img> নামের HTML ট্যাগের সাথে src-নামের এ্যাট্রিবিউট ব্যবহৃত হয়। ওয়েব পেজে ছবি যোগ করার সিনটেক্স হলো ঃ

<img src = “URL”>

এখানে URL-হলো যে ছবিটি ওয়েব পেজে যোগ করতে চাই সেই ছবির লোকেশন। উদাহরণের সাহায্যে তা দেখানো হলো-

HTML Code Output in a web browser:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>
An image:
<img src="pic/smiley.gif" width="42" height="42"></p>
<p>

</body>
</html>
```



উপরের, src= "pic/smiley.gif " লেখাটির অর্থ হলো HTML file-টি যে লোকেশনে আছে সেই লোকেশনের pic নামের ফোল্ডারে smiley.gif নামক ইমেজের অবস্থান।

o <img> ট্যাগ এর height, width এবং border এ্যাট্রিবিউট

ওয়েব পেইজে যে ইমেজ বা ছবিটি ইনসার্ট করা হবে সেটি উচ্চতায় এবং প্রস্থে কত পিক্সেলের হবে তা height এবং width এ্যাট্রিবিউটের উপর নির্ভর করে। width এ্যাট্রিবিউট ইমেজের প্রস্থ নির্দেশ করে এবং height এ্যাট্রিবিউট ইমেজের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে। অপরদিকে ইমেজের চারিদিকে লাইন বা বর্ডার দেয়ার জন্য border এ্যাট্রিবিউটটি ব্যবহৃত হয়। এই বর্ডারের রং সাধারণত (ডিফল্ট হিসেবে) কালো হয়। তবে ডিফল্ট হিসেবে ইমেজের কোন বর্ডার থাকে না। অবশ্য border = "0" লিখলে কোন বর্ডার পাওয়া যাবে না। তাই বর্ডারের ০ এর চেয়ে বেশি দেয়া উচিত।

উদাহরণ ঃ 300 X 200 সাইজ দিয়ে index.jpg ইমেজটি ওয়েবপেইজে সংযোজনের জন্য HTML ভাষার প্রোগ্রাম :

```
<html>
<head>
        <title> Adding image in a webpage </title>
</head>
<body>
         <p> < img src  = " index.jpg"  width = "300" height = "200"  border = "2" > </p>
</body>
</html>
```

শিক্ষার্থীর কাজ	200 X 400 সাইজ দিয়ে niloy.jpg ইমেজটি ওয়েবপেইজে সংযোজনের জন্য একটি HTML ভাষার প্রোগ্রাম লিখুন এবং বিভিন্ন এ্যাট্রিবিউট বিশ্লেষণ করুন ।

সারসংক্ষেপ

একটি ওয়েব পেইজ বা ওয়েব সাইটের সাথে অন্য একটি ওয়েব পেইজ বা সাইটের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থাই হলো হাইপারলিংক। হাইপারলিংক অংশে মাউস দিয়ে ক্লিক করার মাধ্যমে লিংকটি যে অংশের বা ডকুমেন্টের সাথে যুক্ত সেখানে যাওয়া যায়। হাইপারলিংক তৈরির HTML ট্যাগ হলো- <a> ও ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Link ট্যাগ কোনটি?

ক. < o1 > ..... </o1 > খ. < 1i > ..... </1i >

গ. < a > ..... ঘ. < q > ..... </q >

২। ওয়েবপেইজে চিত্র সংযোগ করার জন্য কোন ট্যাগ ব্যবহৃত হয়?

ক. <img> খ.<jpg>

গ. <pic> ঘ.<png>

পাঠ-৭.১০ ওয়েবসাইট পাবলিশিং

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ওয়েব পেজ পাবলিশিং কি বলতে পারবেন।
- ওয়েবসাইট পাবলিশিং এর ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ওয়েব পেইজ পাবলিশিং।

৭.১০.১ ওয়েবসাইট পাবলিশিং

ওয়েব পেইজ তৈরি করার পর তা কোন একটি নির্ভরযোগ্য ওয়েব সার্ভারে হোস্ট করা প্রয়োজন। এই হোস্টিং প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ওয়েবসাইট পাবলিশিং। ডোমেইন নেইমটি রেজিস্ট্রেশন করার পরে তা ওয়েব হোস্টিং কোম্পানিতে স্থানান্তর করতে হবে। আজকাল অবশ্য অনেক ISP(Internet Service Providers) এবং ওয়েব হোস্টিং কোম্পানী পাওয়া যাবে যারা নতুন ডোমেইন রেজিস্ট্রারের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে দিতে আগ্রহী। তাদের থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। ওয়েবসাইট পাবলিশিংয়ের জন্য নিম্নে বর্ণিত কাজসমূহ করতে হবে-

ধাপ-১ঃ ওয়েব পেইজ ডিজাইন

ওয়েব পেইজ ডিজাইন করতে হবে। পূর্ববর্তী পাঠগুলোতে আমরা শিখেছি কিভাবে ওয়েবপেইজ ডিজাইন করে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা অর্থের বিনিময়ে ওয়েব পেইজ ডিজাইন করে দেয়।

ধাপ-২ঃ ডোমেইন নেইম রেজিস্ট্রেশন

সুন্দর একটি নাম যা সহজে মনে রাখা যায় এবং অর্থবোধক তা নির্বাচন করে সেই নামের ডোমেইন নেইম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

ধাপ-৩ ঃ ওয়েব সার্ভারে পেইজ হোস্টিং

ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন ও ওয়েব পেইজ ডিজাইন সম্পন্ন করার পর ওয়েব সাইট/ পেইজগুলো নির্ভরযোগ্য কোন সার্ভারে হোস্ট করতে হবে। অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা অর্থের বিনিময়ে এই হোস্টিং সার্ভিস প্রদান করে।

ধাপ- ৪ ঃ সার্চ ইঞ্জিনের সাথে ওয়েবসাইট সংযুক্ত

এই ধাপটি অত্যাবশকীয় নয়। ওয়েব পেইজ/সাইটটি আরো বেশী প্রচারমূখী করার জন্য সার্চ ইঞ্জিনের সাথে সংযুক্ত করতে হয়।

৭.১০.২ হোস্টিং প্রযুক্তি

উইন্ডোজ হোস্টিং (Windows Hosting)

যদি ওয়েব সাইটটি ASP(Active Server Page) Programming Language এবং Microsoft SQL Server ডেটাবেস ব্যবহার করে তৈরি হয়ে থাকে তবে windows server এ হোস্টিং করতে হবে।

লিনাক্স হোস্টিং (Linux Hosting)

যদি ওয়েব সাইটটি PHP (Hyper Text Processor) Programming Language এবং MySQL Server ডেটাবেস ব্যবহার করে তৈরি হয়ে থাকে তবে linux server এ হোস্টিং করতে হবে। বাংলাদেশে লিনাক্স হোস্টিং জনপ্রিয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশে PHP developer এর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

বিশ্বজুড়ে বহু প্রতিষ্ঠান আছে যারা টাকার বিনিময়ে তাদের ওয়েব সার্ভারে কোন ওয়েব সাইটের জন্য প্রয়োজনীয় স্পেস বা জায়গা ভাড়া দেয়। তবে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিনামূল্যে ওয়েব হোস্টিং সুবিধা প্রদান করে। তবে বিনামূল্যের ওয়েব হোস্টিং এ অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে। www.freeservers.com সাইটে বিনামূল্যে ওয়েব হোস্টিং সার্ভারের সন্ধান পাওয়া যাবে। এই ধরনের হোস্টিং এর সাধারণত ব্যান্ডউইডথ কম এবং ডোমেইন নেম থাকে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	ওয়েবসাইট পাবলিশিং এর কারণ সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

একটি ওয়েবসাইট তৈরি করার পর এটি তখনই ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা বা ভিজিটরগণ দেখতে পাবে অথবা এ্যাকসেস করতে পারবে যদি ওয়েব সাইটটিকে ইন্টারনেটের সাথে সার্বক্ষণিক যুক্ত কোন ওয়েব সার্ভারে আপলোড করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিই হলো ওয়েবসাইট পাবলিশিং। অর্থাৎ ওয়েব পেজ তৈরী করার পর তা কোন একটি নির্ভরযোগ্য ওয়েব সার্ভারে প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ওয়েবসাইট পাবলিশিং।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ওয়েবপেইজ তৈরি করার পর তা কোন একটি নির্ভরযোগ্য ওয়েব সার্ভারে রাখা প্রক্রিয়াটিকে বলা হয়-

ক) ডোমেইন নেইম রেজিস্ট্রেশন
খ) ওয়েব সার্ভারে পেইজ হোস্টিং
গ) ওয়েব পেইজ ডিজাইন
ঘ) ওয়েবসাইট পাবলিশিং

২। ওয়েবসাইট তৈরির জন্য প্রোগ্রামিং Language-

ক) HTML
খ) PHP
গ) Javascript
ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৭.১১ ব্যবহারিক (Practical)

ব্যবহারিক ১ ঃ একটি সাধারণ ওয়েব পেজ তৈরিকরণ।

তত্ত্বঃ ওয়েব পেইজ তৈরি করার পূর্বে আমাদের অবশ্যই এর ডিজাইন কি রকম হবে এবং এতে কি কি ইনফরমেশন থাকবে তা পূর্বেই ঠিক করে নিতে হয়।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্বাচন বা সিলেক্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যারও নির্বাচন করতে হয়।

হার্ডওয়্যার ঃ একটি কম্পিউটার।
সফ্টওয়্যার ঃ অপারেটিং সিস্টেম : উইন্ডোজ XP বা উইন্ডোজ 7 ।
এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার ঃ নোটপ্যাড, Mozila firefox/internet explorer।

উপরিউক্ত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

১. Computer এর Power Connection ভাল ভাবে Check করে CPU এর Power ON করতে হবে।
২. Microsoft Windows এর ডেস্কটপ চলে আসবে।
৩. উল্লিখিত সফ্টওয়্যারগুলো ইনস্টল আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
৪. বর্ণিত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য ইনস্টলকৃত এডিটরটি চালু করতে হবে।
৫. পরীক্ষণটির কার্যক্রম সম্পন্ন হলে চালুকৃত প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামসমূহ বন্ধ করতে হবে এবং যথানিয়মে কম্পিউটারটি বন্ধ বা শাট ডাউন করতে হবে। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন করতে হবে।

ফলাফল উপস্থাপন ঃ

(১) প্রক্রিয়া অনুসরণ ঃ

পরীক্ষণটির কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে -

১। প্রথমে উইন্ডোজ থেকে Notepad প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। সেজন্য-
ক্লিক Start বাটন ⟶ ক্লিক All Progarms ⟶ ক্লিক Accessories ⟶ ক্লিক Notepad

২। Notepad প্রোগ্রামটি চালু হলে নিম্নের HTML কোডগুলো টাইপ করতে হবে।

```
<html>
    <head> <title> Title of the page. </title> </head>
    <body>
    I am a new designer.
    </body>
</html>
```

৩। কোডিং শেষে ফাইলটি .htm বা html বর্ধিতাংশ লিখে একটি নির্দিষ্ট ফোল্ডারে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে File মেনুতে ক্লিক Save অপশনে ক্লিক করতে হবে। Save as ডায়লগ বক্স আসবে। File Name এর জায়গায় Exam1. html লিখে (অবশ্য বির্ধতাংশ টিক রেখে অন্য যে কোন নামও ব্যবহার করা যায়) Save/Ok বাটনে ক্লিক করে সংরক্ষণ বা সেভ করি। যা মূলত C ড্রাইভ এর Document বা My Document লোকেশনে সংরক্ষিত হবে।

(২) ব্যাখ্যা ঃ

১. HTML এমন একটি ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা যার মাধ্যমে অতি সহজে পছন্দ অনুযায়ী ওয়েব পেইজ তৈরি করা সম্ভব। HTML file শুরু হয় <html> ট্যাগ দিয়ে এবং শেষ হয় </html> ট্যাগ দিয়ে। তবে কোড শেষ করার জন্য ফরওয়ার্ড স্ল্যাস (/) ব্যবহার করা হয়।
২. <body> ট্যাগের মাধ্যমে বডি সেকশনের শুরু নির্দেশ করে। <body>..... </body> এই ট্যাগের মধ্যবর্তী বিষয়গুলো ব্রাউজারের উইন্ডোতে প্রদর্শিত হয়।

৩. উল্লিখিত পরীক্ষণটিতে ব্যবহৃত অন্যান্য ট্যাগসমূহ হলো-

ট্যাগসমূহ	বর্ণনা বা কাজ বা ব্যবহার
<head>	HTML ডকুমেন্টের head অংশ নির্দেশ করে।
<title>	HTML ডকুমেন্টের title অংশ নির্দেশ করে।

(৩) ফলাফল ঃ

একটি ব্রাউজিং সফ্টওয়্যার (Internet Explorer Or Mozilla Firefox) ব্যবহার করে নির্দিষ্ট ফোল্ডার থেকে Exam1. html ফাইলটি ওপেন করলেই পেইজটির আউটপুট দেখা যাবে। এক্ষেত্রে নিমোক্ত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

১। Document বা My Document ওপেন করতে হবে।

২। Exam1. html ফাইলটি সিলেক্ট করতে হবে।

৩। মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে প্রাপ্ত সাবমেনু থেকে Internet Explorer Or Mozilla Firefox ক্লিক করলে ফাইলটির আউটপুট পাওয়া যাবে। যা নিম্নরূপ-

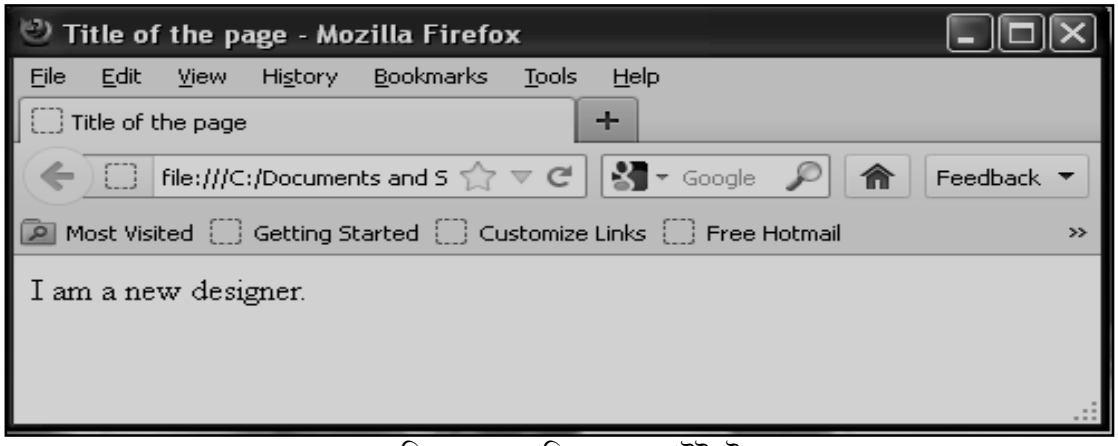

চিত্র- ১: ব্যবহারিক ১ এর আউটপুট

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৭

ক. জ্ঞান দক্ষতা স্তর

১। ওয়েব পেজ কী?

২। ওয়েব সাইটের কাঠামো কী ?

৩। আইপি অ্যাড্রেস কী?

৪। ওয়েবসাইট পাবলিশিং কী ?

৫। ওয়েবসাইট হোস্টিং কী?

৬। HTML কী?

খ. অনুধাবন দক্ষতা স্তর

১। html একটি কন্টেইনার ট্যাগ-ব্যাখ্যা করুন।

২। "প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল তথ্যের ওয়েবসাইট"-ব্যাখ্যা করুন।

৩। "IP অ্যাড্রেসে চারটি অকটেট থাকে"-বুঝিয়ে লিখুন।

৪। URL কীভাবে ব্রাউজারকে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা করুন।

৫। HTML কে কেন হাইপার ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়-ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। HTML -এ <head> এলিমেন্ট এর মাঝে কোনটি রাখতে হয়?

ক. <body> এলিমেন্ট খ. <title> এলিমেন্ট

গ. <text> এলিমেন্ট ঘ. <Document> এলিমেন্ট

২। HTML ডকুমেন্ট মূলত কয়টি অংশ নিয়ে গঠিত?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৩। সকল ওয়েব ব্রাউজার কোন ভাষা বুঝতে পারে?

ক. Sql খ. php

গ. java ঘ. html

৪। ডোমেইন নেইম হলো–

ক. ওয়েবসাইটের একটি স্বতন্ত্র নাম খ. সার্ভারের নাম

গ. ওয়েব ফাইলের নাম ঘ. ফোল্ডারের নাম

৫। ওয়েবের একটি রিসোর্সে অবস্থিত কোন রেফারেন্সকে ওয়েবের ভাষায় কী বলে?

ক. ওয়েবসাইট খ. হাইপারলিংক

গ. কানেকশন ঘ. ওয়েবপেইজ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। html এর body অংশে থাকে–
i. ওয়েবপেইজ টাইটেল
ii. টেবিল
iii. ছবি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। একটি web Page -এ যে element সমূহ থাকে–
i. HTML
ii. head
iii. tittle
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ প্রশ্নের উত্তর দিনঃ

সালাউদ্দীন একটি ওয়েবসাইট তৈরি করে তাতে তার ব্যক্তিগত সকল তথ্যের সাথে প্রয়োজনীয় ছবি ও কার্টুন যুক্ত করল।

১। সালাউদ্দীন এর কাজকে বলা যায়–
ক. ওয়েবহোস্টিং খ. ওয়েব লিঙ্ক
গ. ওয়েব ইনফো ঘ. ওয়েব ডিজাইন

২। সালাউদ্দীন তার ওয়েবপেজে যুক্ত করতে পারে-
i. টেক্সট
ii. ভিডিও
iii. চিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক.i ও ii খ.i ও iii
গ.ii ও iii ঘ.i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের দুটি গ্রুপে ভাগ করে কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইট তৈরির জন্য বলা হল। ১ম গ্রুপ HTML, CSS ইত্যাদি ব্যবহার করে ওয়োবসাইটটি প্রস্তুত করে। দ্বিতীয় গ্রুপ CSS, Mysql, Php ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের ওয়েবসাইটটি তৈরি করে। বিচারকমন্ডলী ২য় গ্রুপের ওয়েবসাইটটি কলেজের জন্য পছন্দ করেন। ICT শিক্ষক কলেজের ওয়েবসাইটটির হোম পেজের Ministry of education লেখাটির সাথে ওয়েব www.moedu.gov.bd অ্যাড্রেসটি যুক্ত করেন।

ক. ওয়েব সার্ভার কী? ১
খ. 'এই হোস্টিং বেশি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা ' - ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের ICT শিক্ষকের কার্যক্রমের সংশ্লিষ্ট কোড ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. বিচারকেরা কোন যুক্তিকশায় ২য় গ্রুপের ওয়েবসাইটটি পছন্দ করেন? ব্যাখ্যা করুন। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

'ক' কলেজের জন্য একটি ওয়েব পেইজ তৈরি করা হলো যা কোন ব্রাউজারে রান করলে প্রদর্শিত বিষয়গুলি নিম্নরূপ ঃ (ক) কলেজের একটি ছবি ("=D:\picture\index.jpg" height = "400" width = "300" align = "top" border = "2") ও (খ) কলেজের নাম <h1> হেডিংয়ে।

ক. ওয়েবসাইট কী? ১

খ. ডোমেইন নেম কেন কিনতে হয়? -ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকে প্রদর্শিত ওয়েব পেইজটি তৈরির HTML কোড লিখুন। ৩

ঘ. ওয়েবপেইজ তৈরিতে উদ্দীপকের (ক) তে ব্যবহৃত এ্যাট্রিবিউটগুলি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

পাঠ - ৭.১	১	খ	২	ঘ	৩	খ
পাঠ - ৭.২	১	ঘ	২	ক		
পাঠ - ৭.৩	১	ঘ	২	গ		
পাঠ - ৭.৪	১	ক	২	খ		
পাঠ - ৭.৫	১	খ	২	খ		
পাঠ - ৭.৬	১	খ	২	ক		
পাঠ - ৭.৭	১	গ	২	খ		
পাঠ - ৭.৮	১	ক	২	ক		
পাঠ - ৭.৯	১	খ	২	খ		
পাঠ - ৭.১০	১	ঘ	২	ঘ		

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ খ ২ ক ৩ ঘ ৪ ক ৫ খ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্নঃ

১ গ ২ ঘ

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ ঘ ২ ঘ

প্রোগ্রামিং এর ভাষা

ইউনিট ৮

ভূমিকা

কম্পিউটার ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যা সমাধান করা। বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা আছে, কিছু আছে যা শেখা ও ব্যবহার করা কঠিন, কিছু আছে যাদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন– বৈজ্ঞানিক হিসাব, অংকন কিংবা ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট। কম্পিউটারের সাথে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হলো কম্পিউটারের ভাষা। আমরা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময়ের জন্য যেমন বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করি, তেমনি কম্পিউটারকে আমাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জানানোর জন্য বিশেষ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারের ভাষা হচ্ছে আসলে প্রোগ্রামের ভাষা। এই ইউনিটে আপনারা প্রোগ্রাম এর ধারণা, বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামের ভাষা, প্রোগ্রামের সংগঠন, প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়াও এলগরিদম ও ফ্লোচার্ট সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৮.১ : প্রোগ্রাম এর ধারণা ও প্রোগ্রামের ভাষা
পাঠ - ৮.২ : বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামের ভাষা
পাঠ - ৮.৩ : উচ্চস্তরের ভাষা
পাঠ - ৮.৪ : অনুবাদক প্রোগ্রাম
পাঠ - ৮.৫ : প্রোগ্রামের সংগঠন ও প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ
পাঠ - ৮.৬ : অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট
পাঠ - ৮.৭ : বিভিন্ন ফ্লোচার্ট তৈরির নিয়ম ও উদাহরণ
পাঠ - ৮.৮ : প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল

পাঠ-৮.১ প্রোগ্রাম এর ধারণা ও প্রোগ্রামের ভাষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রোগ্রাম এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রোগ্রামের ভাষা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কম্পিউটার প্রোগ্রাম, প্রোগ্রামের ভাষা ।

৮.১.১ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর প্রাথমিক ধারণা

কম্পিউটার ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যা সমাধান করা। কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় নির্দেশ বা কোড লেখা হয়। এরূপ সারিবদ্ধ সুশৃঙ্খল একগুচ্ছ নির্দেশমালার সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলে।

প্রোগ্রাম হলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো কতকগুলো নির্দেশের সমষ্টি যা কম্পিউটারের কাজে সহায়তা করে। আর ভাষা হচ্ছে সেইসব নির্দেশাবলী লেখার সংকেত বা কোড। অর্থাৎ প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে সেই কোড যা দ্বারা কম্পিউটারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা যায়। কিছু কী-ওয়ার্ড (key-words) বা রিজার্ভড ওয়ার্ড (reserved words) দ্বারা এই সকল নির্দেশাবলী লেখা হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা আছে, কিছু আছে যা শেখা ও ব্যবহার করা কঠিন, কিছু আছে যাদেরকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যেমন– বৈজ্ঞানিক হিসাব, অংকন কিংবা ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট।

মূলত কম্পিউটারের সাথে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম হলো কম্পিউটারের ভাষা। কম্পিউটারের ভাষা হচ্ছে আসলে প্রোগ্রামের ভাষা। বস্তুত প্রোগ্রামের ভাষাকে আমরা নির্দেশ বা কোড হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কারণ এটা কোনো কাজ কিভাবে করতে হয় তার নির্দেশনা দান করে। মোটামুটি এ ধরনের ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা থেকেই প্রোগ্রামের বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব হয়। কাজেই প্রোগ্রামের ভাষা বলতে আমরা বুঝি কিছু নির্দেশাবলী যা কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং কম্পিউটার কি ধরনের কাজ করবে, কোথায় ডাটাসমূহ রাখবে, ফলাফল কি হবে প্রভৃতি নির্ধারণ করে।

৮.১.২ প্রোগ্রামের ভাষা

দৈনন্দিন জীবনে আমরা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ বা বিভিন্ন রকম সমস্যা সমাধানের জন্য নানা রকম ভাষা ব্যবহার করি। আমরা একে অপরের সাথে ভাব বিনিময়ের জন্য যেমন বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করি, তেমনি কম্পিউটারকে আমাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দেয়ার জন্য বিশেষ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়। এসব ভাষাই মূলত প্রোগ্রামের ভাষা। প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষার বিশেষ কিছু সিনট্যাক্স রয়েছে যা বিশেষ অর্থবোধক এবং এই সিনট্যাক্স ব্যবহার করে ঐ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে হয়। কম্পিউটার ব্যবহার করে কোন সসম্যা সমাধানের জন্য যে সব ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয় সে সকল ভাষাকে প্রোগ্রামিং ভাষা বলে। যেমন: সি(C), সি $^{++}$ (C^{++}), ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic), জাভা (Java), ওরাকল (Oracle), অ্যালগল (Algol), ফোরট্রান (Fortran) পাইথন (Python) ইত্যাদি।

১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে এ যাবত বহু প্রোগ্রামিং ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই সকল ভাষাকে পাঁচটি স্তরে বা প্রজন্মে ভাগ করা যেতে পারে। যথা -

১। প্রথম প্রজন্মের ভাষা (1945) : মেশিন ভাষা (Machine Language)
২। দ্বিতীয় প্রজন্মের ভাষা (1950) : অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)
৩। তৃতীয় প্রজন্মের ভাষা (1960) : উচ্চতর ভাষা (High Level Language)
৪। চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (1970) : অতি উচ্চতর ভাষা (Very High Level Language)
৫। পঞ্চম প্রজন্মের ভাষা (1980) : স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল ভাষা (Natural Language)

মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষাকে লো-লেভেল ভাষা বলা হয়। কারণ এগুলো কম্পিউটারের ভাষার (0 বা 1) কাছাকাছি। অন্যদিকে হাই-লেভেল বা উচ্চতর ভাষা মানুষের ভাষার কাছাকাছি। যেমন – ইংরেজি।

শিক্ষার্থীর কাজ	কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষার প্রয়োজনীয়তার ওপর আপনার বিস্তারিত মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

কম্পিউটার ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্যা সমাধান করা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন প্রোগ্রাম। প্রোগ্রাম হলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো কতকগুলো নির্দেশের সমষ্টি যা কম্পিউটারের কাজে সহায়তা করে। আর কম্পিউটার ব্যবহার করে কোন সমম্যা সমাধানের জন্য যে সব ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয় সে সকল ভাষাকে প্রোগ্রামিং ভাষা বলে। সি, সি $^{++}$, ভিজুয়াল বেসিক , জাভা , ওরাকল , অ্যালগল, ফোরট্রান, পাইথন ইত্যাদি হলো কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষার উদাহরণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষাকে কয়টি প্রজন্মে ভাগ করা যায়?

ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা কোনটি?

ক. সি খ. জাভা
গ. ভিজুয়াল বেসিক ঘ. সবগুলো

পাঠ-৮.২ বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মেশিন ভাষার সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বলতে পারবেন।
- অ্যাসেম্বলি ভাষা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মধ্যম স্তরের ভাষা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	মেশিন ভাষা, অ্যাসেম্বলি ভাষা।

৮.২.১ বিভিন্ন প্রোগ্রামের ভাষা

প্রোগ্রাম রচনার সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য এসকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রোগ্রামিং ভাষা মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. লো-লেভেল ভাষা বা নিম্ন স্তরের ভাষা ও
২. হাই-লেভেল বা উচ্চ স্তরের ভাষা

নিম্ন স্তরের ভাষাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় । যথা:

- মেশিন ভাষা ও
- অ্যাসেম্বলি ভাষা

৮.২.২ মেশিন ভাষা

কম্পিউটারে সবচেয়ে নিচের স্তরের ভাষা হলো মেশিন ভাষা । কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষাকে মেশিন ভাষা বা নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়। কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা হলো এই নিম্নস্তরের ভাষা। এ ভাষায় বাইনারি সংখ্যা (1 এবং 0) অথবা হেক্সাডেসিম্যাল পদ্ধতি ব্যবহার করে সবকিছু লেখা হয়। কম্পিউটার শুধুমাত্র মেশিন ভাষাই বুঝতে পারে। অন্য কোনো ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা হলে কম্পিউটার কার্যনির্বাহের আগে উপযুক্ত অনুবাদকের সাহায্যে তাকে মেশিনের ভাষায় পরিণত করে নেয়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কার্যনির্বাহের জন্য বিদ্যুৎ তরঙ্গের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে মেশিনের ভাষার সরাসরি মিল রয়েছে। শুধুমাত্র 0 এবং 1 দিয়ে এ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখা হয় যা অত্যন্ত জটিল ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এ সকল কারণে মেশিন ভাষাকে লো-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বা নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়।

মেশিন ভাষার সুবিধা

১। এই ভাষা দিয়ে সরাসরি মেমোরি অ্যাড্রেসের সাথে সংযোগ সাধন সম্ভব।

২। সবচেয়ে কম পরিমাণ লজিক ও কম মেমোরিতে এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম নির্বাহ করা যায়।

৩। এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম দরকার হয় না।

৪। মেশিন ভাষা অন্যান্য ভাষা থেকে দ্রুত কাজ করে।

মেশিন ভাষার অসুবিধা

১। এই ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ।

২। এক ধরনের মেশিনের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা যায় না।

৩। মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে দক্ষ প্রোগ্রামার প্রয়োজন।

৪। প্রোগ্রামের ভুল-ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধন কষ্টসাধ্য।

৮.২.৩ অ্যাসেম্বলি ভাষা

অ্যাসেম্বলি ভাষা হচ্ছে মেশিন ভাষার পরবর্তী প্রোগ্রামের ভাষা। মেশিন ভাষার সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য পঞ্চাশের দশকে অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রচলন শুরু হয়। এই ভাষা দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহার করা হতো যা মেশিনের ভাষা থেকে উন্নত, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যবহারকারীর জন্য সহজবোধ্য। অ্যাসেম্বলি ভাষাকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য অ্যাসেম্বলার নামক এক ধরনের ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। অ্যাসেম্বলি ভাষা বিভিন্ন সংকেতের সমন্বয়ে লেখা হয়ে থাকে। এজন্য অ্যাসেম্বলি ভাষাকে সাংকেতিক ভাষাও (Symbolic Language) বলা হয়। কারণ অ্যাসেম্বলি ভাষার ক্ষেত্রে নির্দেশ ও ডাটার অ্যাড্রেস বাইনারি বা হেক্সাডেসিম্যাল সংখ্যার সাহায্যে না দিয়ে বিভিন্ন সংকেতের সাহায্যে দেয়া হয়। যথা- ADD, SUB, MUL, DIV, JMP, INP, OUT ইত্যাদি। এগুলোকে অপকোড বা অপারেশন কোড বলে। নিচে কিছু অপকোডের কাজ দেয়া হল:

নির্দেশ	অর্থ
ADD	প্রধান মেমোরির নির্দিষ্ট অবস্থানের সংখ্যা অ্যাকুমুলেটরের সংখ্যার সঙ্গে যোগ করে যোগফল অ্যাকুমুলেটরে রাখার কমান্ড।
SUB	প্রধান মেমোরি নির্দিষ্ট অবস্থানের সংখ্যা অ্যাকুমুলেটরের সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে বিয়োগফল অ্যাকুমুলেটরে রাখার কমান্ড।
MUL	গুণ করার নির্দেশ।
DIV	প্রধান মেমোরি নির্দিষ্ট অবস্থানের সংখ্যা অ্যাকুমুলেটরের সংখ্যাকে ভাগ করে ভাগফল অ্যাকুমুলেটরে রাখার কমান্ড।

অ্যাসেম্বলি ভাষার সুবিধা

১। মেশিনের ভাষার মতো দক্ষ ও সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম রচনা সম্ভব।

২। মেশিনের ভাষার তুলনায় এ ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা তুলনামূলক সহজ।

৩। মেশিনের ভাষার তুলনায় ডিবাগিং সহজতর।

অ্যাসেম্বলি ভাষার অসুবিধা

১। মেশিনের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

২। এই ভাষার প্রোগ্রাম মেশিনের সংগঠনের উপর নির্ভরশীল।

৩। এই ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা যথেষ্ট ক্লান্তিকর ও সময় সাপেক্ষ।

৪। এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।

৮.২.৪ মধ্যম স্তরের ভাষা

যে প্রোগ্রামিং ভাষার মধ্যে লো-লেভেল ও হাই-লেভেল উভয় ভাষার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে মধ্যম স্তরের ভাষা বলে। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার নিয়ন্ত্রণ ও সিস্টেম প্রোগ্রাম রচনার জন্য বিট পর্যায়ের প্রোগ্রামিং ভাষা হচ্ছে মধ্যম স্তরের ভাষা। এ ভাষায় উচ্চতর ভাষার সুবিধা পাওয়া যায়। আবার নিম্নস্তরের ভাষায়ও প্রোগ্রাম রচনা করা যায়।

মধ্যমস্তরের ভাষার সুবিধা

১. এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বোঝা প্রোগ্রামারদের কাছে সহজসাধ্য।

২. একবার লিখিত প্রোগ্রাম পরবর্তীতে পরিবর্তিত করা সহজ।

৩. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

মধ্যমস্তরের ভাষার অসুবিধা

১. অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।

২. প্রোগ্রাম নির্বাহ করতে মেশিন ভাষার তুলনায় বেশি সময় লাগে।

৩. উচ্চতর ভাষার তুলনায় এই ভাষা কঠিন।

শিক্ষার্থীর কাজ	মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কম্পিউটারে সবচেয়ে নিম্ন স্তরের ভাষা হল মেশিন ভাষা। মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে দক্ষ প্রোগ্রামার প্রয়োজন। আর অ্যাসেম্বলি ভাষা হচ্ছে মেশিন ভাষার পরবর্তী প্রোগ্রামের ভাষা। এই ভাষা দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে ব্যবহার করা হতো যা মেশিনের ভাষা থেকে উন্নত, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যবহারকারীর জন্য সহজবোধ্য। অন্যদিকে যে প্রোগ্রামিং ভাষার মধ্যে লো-লেভেল ও হাই-লেভেল উভয় ভাষার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাকে মধ্যম স্তরের ভাষা বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা কোনটি?

ক) মেশিন ভাষা খ) অ্যাসেম্বলি

গ) উচ্চ স্তরের ভাষা ঘ) সবগুলো

২। অপকোড বা অপারেশন কোড কোনটি ?

ক) ADD খ) SUB

গ) DIV ঘ) সবগুলো

পাঠ-৮.৩ উচ্চ স্তরের ভাষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উচ্চ স্তরের ভাষা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উচ্চ স্তরের ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন উচ্চ স্তরের (সি, জাভা, পাইথন) ভাষা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	উচ্চ স্তরের ভাষা সি, জাভা, পাইথন।

৮.৩.১ উচ্চ স্তরের ভাষা

হাই-লেভেল বা উচ্চ স্তরের ভাষা কোন সংকেত বা সাংকেতিক কোড নির্ভর নয়। এটি ইংরেজি ভাষার মতই। মেশিন বা অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রধান অসুবিধা হলো, এক ধরনের কম্পিউটারের জন্য প্রোগ্রাম অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না। তাছাড়া মেশিন ও অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখা অনেক কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এছাড়া মানুষের পক্ষে লো-লেভেল ভাষা বোঝা সহজসাধ্য নয়। এই অসুবিধা দুর করার জন্য উচ্চ স্তরের ভাষার উদ্ভব হয়। এই স্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বিভিন্ন ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা সম্ভব।

উচ্চ স্তরের ভাষা মানুষের ভাষার (যেমন– ইংরেজি ভাষা) সাথে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে। উচ্চ স্তরের ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভাষা হচ্ছে– BASIC, COBOL, FORTRAN, PASCAL, C++, JAVA, PROLOG ইত্যাদি। কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার নামক প্রোগ্রাম ব্যবহার করে এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফলে কম্পিউটার এ জাতীয় প্রোগ্রাম বুঝতে পারে।

উচ্চ স্তরের ভাষার সুবিধা

১। এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম যে কোনো কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।
২। এ ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা সহজ ও যুক্তিনির্ভর।
৩। প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয় ও সংশোধন অপেক্ষাকৃত সহজ।
৪। উচ্চ স্তরের ভাষায় অসংখ্য লাইব্রেরি ফাংশনের সুবিধা আছে।
৫। প্রোগ্রাম লেখার সময় কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ধারণার প্রয়োজন নেই।

উচ্চ স্তরের ভাষার অসুবিধা

১। কম্পিউটার সরাসরি এ ভাষা বুঝতে পারে না।
২। এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে কম্পিউটারে চালাতে হলে অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।
৩। প্রোগ্রাম রান করতে বেশি সময় প্রয়োজন হয়।

কয়েকটি উচ্চ স্তরের ভাষা সম্পর্কে ধারণা

হাই-লেভেল বা উচ্চ স্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা অনেক সহজ। নিচে কয়েকটি উচ্চ স্তরের ভাষার বর্ণনা দেয়া হল:

সি (C)

সি' একটি প্রোগ্রামিং ভাষা। বেল ল্যাবে ৭০এর দশকে কাজ করার সময় ডেনিস রিচি সি ভাষার উদ্ধাবন করেন। সি++ ও জাভাসহ পরবর্তীকালের অনেক প্রোগ্রামিং ভাষার ওপর সি'র গভীর প্রভাব পড়েছে। সি এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এর বহনযোগ্যতা। সি দিয়ে রচিত প্রোগ্রাম যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমের কম্পিউটারে চালানো যায়। ৭০ এবং ৮০ দশকের দিকে সি এর জনপ্রিয়তা বাড়ার সাথে সাথে এর অনেকগুলো ভার্সন তৈরি হয়। সি একটি প্রোসিডিউরাল ভাষা।

সি++

এক ধরনের অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা। ১৯৮০ সালে বিয়ার্নে স্ট্রোভ্স্ট্রুপ (Biarne Stroustrup) যুক্তরাষ্ট্রের এটিএন্ডটি বেল ল্যাবরোটরিতে (AT&T Bell Laboratary) এটি ডেভেলপ করেন। মূলত সিমলা ৬৭ এবং সি প্রোগ্রামিং ভাষার সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় সাধন করে সি++ তৈরি হয়।

সি++একটি মধ্যম শ্রেণীর প্রোগ্রামিং ভাষা যাতে উচ্চ স্তর এবং নিম্ন স্তর ভাষাগুলোর সুবিধা সংযুক্ত আছে। এটি সর্বকালের অন্যতম জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষা এবং সফ্টওয়্যার শিল্পে এটি বহুল ব্যবহৃত হয়। যেমন-সিস্টেম সফ্টওয়্যার, এপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার, ডিভাইস ড্রাইভার, এম্বেডেড সফ্টওয়্যার, উচ্চ মানের সার্ভার ও ক্লায়েন্ট এপ্লিকেশন, বিনোদন সফ্টওয়্যার ইত্যাদি। সি++ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ভাষাকে প্রভাবিত করেছে যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জাভা।

সি++ ভাষায় যে সমস্ত ধারণা ও বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হলো- শ্রেণী (classes), ভার্চুয়াল ফাংশন (virtual function), অপারেটর ওভারলোডিং (operator oveloading), ফাংশন ওভারলোডিং (function oveloading), ইনহেরিটেন্স (inheritance) ইত্যাদি।

ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic)

ভিজুয়াল বেসিক (সংক্ষেপে ভিবি বা VB) একটি তৃতীয় প্রজন্মের ইভেন ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং ভাষা এবং মাইক্রোসফ্টের ''কম'' বা কম্পোনেন্ট অবজেক্ট মডেল (COM –Component Object Model) এর আইডিই (IDE-Integrated Development Environment)। এই ভাষা বেসিক ভাষার উন্নত সংস্করণ। দৃশ্যমান বা গ্র্যাফিকাল বৈশিষ্ট্য এবং বেসিক ভাষার উত্তরাধিকার ভিবিকে তুলানামূলকভাবে সহজে ব্যবহার করার সুবিধা প্রদান করেছে।

ভিজুয়াল বেসিকের শেষ প্রকাশনা ছিল ১৯৯৮ সালের সংস্করণ ৬ (Version 6)। মাইক্রোসফ্টের বর্ধিত সহযোগিতা ২০০৮ এর মার্চ মাসে শেষ হয়েছে। বর্তমানে এই ভাষাটি ভিজুয়াল বেসিক ডট নেট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ভিবি জিইউআই-গ্র্যাফিকাল ইউজার ইন্টারফেস (GUl-Graphical User Interface) বা ব্যবহারকারীর জন্য দৃশ্যমান ব্যবহার ব্যবস্থার র‍্যাপিড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট বা র‍্যাড (RAD-rapid application development) এপ্লিকেশন চালু করেছে। এছাড়াও ডাটা অ্যাকসেস অবজেক্ট, রিমোট ডাটা অবজেক্ট ইত্যাদির মাধ্যমে ডাটাবেজ কাজ করার এবং আকটিভএক্স (Activex) নিয়ন্ত্রক ও অবজেক্ট তৈরি করার সুবিধা দিয়েছে।

জাভা (Java)

জাভা একটি প্রোগ্রামিং ভাষা। সান মাইক্রোসিস্টেম ৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে জাভা ডিজাইন করার পর এটি অতি দ্রুত বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষার একটিতে পরিণত হয়। জাভা'র এই জনপ্রিয়তার মূল কারণ এর বহনযোগ্যতা (portability), নিরাপত্তা এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ও ওয়েব প্রোগ্রামিং এর প্রতি পরিপূর্ণ সাপোর্ট। জাভায় লেখা প্রোগ্রাম যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমে চালানো যায় শুধু যদি সেই অপারেটিং সিস্টেমের জন্য একটি জাভা রান্টাইম এনভায়রনমেন্ট (জাভা ভার্চুয়াল মেশিন) থেকে থাকে। এই সুবিধা জাভাকে একটি অনন্য প্ল্যাটফর্মে পরিণত করে। বিশেষ করে ইন্টারনেটে, যেখানে অসংখ্য কম্পিউটার যুক্ত থাকে এবং কম্পিউটারগুলো বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে থাকে সেখানে জাভায় লেখা অ্যাপলেটগুলো সকল কম্পিউটারে চলতে পারে এবং এর জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয় না। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর কারণে জাভার অতিদীর্ঘ প্রোগ্রাম লেখা এবং ত্রুটিমুক্ত (debug) করা অনেক সহজ ।

ফোরট্রান (FORTRAN)

ফোরট্রান আদিতম উচ্চস্তরের নির্দেশমূলক প্রোগ্রামিং ভাষা। জন বাকাস ও তাঁর সহযোগীরা আইবিএম-এ কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি এটি তৈরি করেন। ফোরট্রানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণগুলো হচ্ছে ফোরট্রান I, ফোরট্রান II, ফোরট্রান iv, ফোরট্রান ৭৭, এবং ফোরট্রান ৯০। এদের মধ্যে শেষের দুইটির বিবরণ অ্যানসাই মান আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ফোরট্রান ৭৭-ই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। তবে ফোরট্রান ৯০-এর ভাষাটির ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে; এতে পুনরাবৃত্তি, পয়েন্টার, নতুন নিয়ন্ত্রণ সংগঠন এবং অনেক নতুন অ্যারে অপারেশন যোগ করা হয়েছে।

ফোরট্রান দিয়ে অসংখ্য গাণিতিকি হিসাব সহজেই করা যায়। শিক্ষা, ব্যাংকিং, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় হিসাব ও পরিকল্পনা করার জন্যে প্রয়োজনীয় হিসাব করা যাবে এটি দিয়ে। এছাড়া ভিডিও গেম প্রোগ্রামিং, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও সামরিক খাতে এবং গবেষণার কাজেও ফোরট্রান ব্যাবহৃত হয়েছে। ফোরট্রান দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাব-নিকাশ করা যায়।

পাইথন (Python)

পাইথন একটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা। ১৯৯১ সালে গুইডো ভ্যান রোসাম এটি প্রথম প্রকাশ করেন। পাইথন নির্মাণ করার সময় প্রোগ্রামকে পঠনযোগ্যতার ওপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। এখানে প্রোগ্রামারের পরিশ্রমকে কম্পিউটারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পাইথনের কোর সিনট্যাক্স ও সেমান্টিক্স খুবই সংক্ষিপ্ত, তবে ভাষাটির স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি অনেক সমৃদ্ধ।

পাইথন একটি বহু-প্যারাডাইম এবং পুরোপুরি চলমান প্রোগ্রামিং ভাষা যার স্বনিয়ন্ত্রিত মেমরি ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এদিক থেকে এটি পার্ল, রুবি প্রভৃতির মতো।

ওরাকল (Oracle)

ওরাকল হলো এক ধরনের ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Database Management System বা DBMS)। এ সিস্টেমে রচিত প্রোগ্রামে একটি ডাটাবেজ থাকবে, সাথে থাকবে এক বা একাধিক এ্যাপ্লিকেশন। ওরাকল ডাটাবেজ সাধারণত ওরাকল RDBMS হিসেবে অথবা কেবল ওরাকল হিসেবে উল্লেখ করা হয়। কম্পিউটারে ডাটা সংরক্ষণ ও ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য ওরাকল সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সি ও সি++ ভাষার মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রোগ্রাম রচনার জন্য সহজে বোধগম্য সার্বজনীন ভাষাকে উচ্চ স্তরের ভাষা বলা হয়। কম্পিউটার যে ভাষা সরাসরি বুঝতে পারে না বিভিন্ন ধরনের অনুবাদকের মাধ্যমে ঐ ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য করতে হয় তাই উচ্চ স্তরের ভাষা। এ ভাষা অনেকটা ইংরেজি ভাষার মত। উচ্চ স্তরের ভাষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভাষা হচ্ছে– BASIC, COBOL, FORTRAN, PASCAL, C++, JAVA, PROLOG ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি++ ভাষায় যে সমস্ত ধারণা ও বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত করা হয়েছে-

ক) শ্রেণী খ) ভার্চুয়াল ফাংশন
গ) অপারেটর ওভারলোডিং ঘ) সবগুলো

২। উচ্চ স্তরের ভাষা কোনটি ?

ক) সি++ খ) জাভা
গ) পাইথন ঘ) সবগুলো

পাঠ-৮.৪ অনুবাদক প্রোগ্রাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অনুবাদক প্রোগ্রাম-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অনুবাদক প্রোগ্রাম এর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অনুবাদক প্রোগ্রাম, অ্যাসেম্বলার, কম্পাইলার, ইন্টারপ্রেটার ।

৮.৪.১ অনুবাদক প্রোগ্রাম

অ্যাসেম্বলি বা উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে সোর্স প্রোগ্রাম এবং মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করা প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রাম বলা হয়। অ্যাসেম্বলি ও হাই লেভেল ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে না। কম্পিউটার কেবল মেশিন ভাষা বুঝতে পারে। তাই সোর্স প্রোগ্রামকে চালানোর আগে কোনো অনুবাদক প্রোগ্রামের মাধ্যমে মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করতে হয়। সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে পরিণত করার জন্য যে প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে। মেশিনের ভাষায় প্রোগ্রাম অনুবাদ করার জন্য 0 এবং 1 এই দু'টি বাইনারি ডিজিট ব্যবহার করা হয়। সোর্স প্রোগ্রামকে অনুবাদ করার জন্য তিন ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম আছে। যেমন –

১। কম্পাইলার (Compiler)
২। অ্যাসেম্বলার (Assmebler) ও
৩। ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)

কম্পাইলার (Compiler)

কম্পাইলার হল এমন একটি অনুবাদক যা সোর্স প্রোগ্রামকে একসাথে সম্পূর্ণরূপে মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করে একটি অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করে এবং একটি এক্সিকিউশন ফাইল (.exe) তৈরি করে। এখানকার এক্সিকিউশন ফাইল অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এক্সিকিউট হয়ে থাকে। ফলে প্রোগ্রামিং প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুততর হয় এবং প্রোগ্রামারকে নিজ হাতে কোন অনুবাদকের কাজ করতে হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতর ভাষার প্রোগ্রামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার ব্যবহৃত হয়। কারণ কোন নির্দিষ্ট কম্পাইলার একটি মাত্র উচ্চতর ভাষার প্রোগ্রামকে কম্পাইল করতে পারে। যেমন- যে কম্পাইলার COBOL প্রোগ্রামকে কম্পাইল করতে পারে সেই কম্পাইলার বেসিক প্রোগ্রাম কম্পাইল করতে পারে না। কম্পাইলার অনুবাদ করা ছাড়াও উৎস প্রোগ্রামের গুণাগুণও বিচার করতে পারে।

কম্পাইলারের প্রধান কাজ

১। উৎস প্রোগ্রামকে অনুবাদ করে অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করা।
২। প্রোগ্রামের সঙ্গে প্রয়োজনীয় রুটিন যোগ করা। রুটিন হলো প্রোগ্রামের ছোট অংশ যাতে কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয়া থাকে।
৩। প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা জানানো।
৪। প্রোগ্রামের যেকোনো ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা।

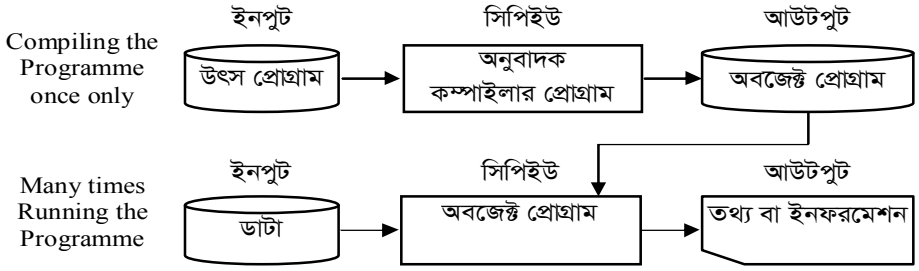

চিত্র ৮.৪.১ : সোর্স প্রোগ্রামকে কম্পাইল করার প্রক্রিয়া

অ্যাসেম্বলার (Assembler)

অ্যাসেম্বলার হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত উৎস প্রোগ্রাম অর্থাৎ নেমোনিক কোডকে মেশিনের ভাষায় লিখিত অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করা এক ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম। এ ভাষার অন্যতম কাজ হচ্ছে প্রধান মেমোরিতে রক্ষিত অ্যাসেম্বলি ভাষার সব নির্দেশ ঠিক আছে কিনা তা ব্যবহারকারীকে জানানো। এ ভাষার প্রত্যেকটি নির্দেশকে অ্যাসেম্বলার মেশিন ভাষার একটি নির্দেশে পরিণত করে। ভুল সংশোধনের পর এ ভাষা পুনরায় প্রথম নির্দেশ থেকে অনুবাদের কাজ শুরু করে।

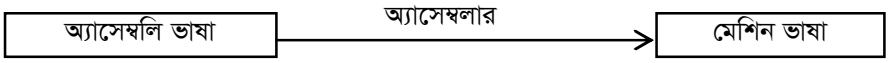

চিত্র ৮.৪.২ : সোর্স প্রোগ্রামকে কম্পাইল করার প্রক্রিয়া

অ্যাসেম্বলারের প্রধান কাজ

১। নেমোনিক কোডকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তর করা।
২। সব নির্দেশ এবং ডেটা প্রধান মেমোরিতে জমা রাখা।
৩। প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা জানানো।
৪। সব তথ্য ও নির্দেশ মেমরিতে রাখা।

ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)

ইন্টারপ্রেটারও কম্পাইলারের মতো উচ্চতর ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে, তবে কম্পাইলার যেমন প্রথমে সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে এবং শেষে ফলাফল প্রদান করে কিন্তু ইন্টারপ্রেটার সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করে না। ইন্টারপ্রেটার এক লাইন করে সম্পাদন করে এবং তাৎক্ষণিক ফলাফল প্রদান করে। ইন্টারপ্রেটারের মাধ্যমে প্রোগ্রামের ভুল-ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধন করার ক্ষেত্রে সময় কম লাগে। তবে ইন্টারপ্রেটারের অসুবিধা হচ্ছে অনুবাদের ক্ষেত্রে এটি ধীর গতি সম্পন্ন এবং প্রতিবার প্রোগ্রাম নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্টেটমেন্ট নতুন করে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করতে হয়।

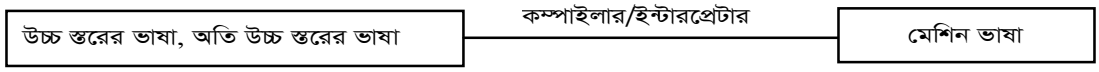

চিত্র ৮.৪.৩ : সোর্স প্রোগ্রামকে ইন্টারপ্রেটেশন করার প্রক্রিয়া

৮.৪.২ কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য

কম্পাইলার	ইন্টারপ্রেটার
১। সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে।	১। এক লাইন এক লাইন করে অনুবাদ করে।
২। এটি বড় আকৃতির প্রোগ্রাম।	২। এটি ছোট আকৃতির প্রোগ্রাম।
৩। প্রোগ্রাম নির্বাহের গতি তুলনামূলক দ্রুত।	৩। গতি তুলনামূলক কম।
৪। কাজ করতে প্রধান মেমোরিতে বেশি জায়গা প্রয়োজন হয়।	৪। প্রধান মেমোরিতে কম জায়গা প্রয়োজন হয়।
৫। ডিবাগিং বা প্রোগ্রামের ভুল-ত্রুটি সনাক্ত ও	৫। ভুল-ত্রুটি সনাক্ত ও সংশোধন করার ক্ষেত্রে

সংশোধন করার ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগে।	সময় কম লাগে।
৬। প্রোগ্রামের সবগুলো ভুল এক সাথে প্রদর্শন করে।	৬। প্রতিটি লাইনের ভুল প্রদর্শন করে এবং ভুল মাত্রই অনুবাদের কাজ বন্ধ করে দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	অ্যাসেম্বলার, কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের সুবিধা ও অসুবিধার তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

অ্যাসেম্বলি বা উচ্চতর ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে সোর্স প্রোগ্রাম বলা হয় । আর মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করা প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রাম বলা হয়। যে প্রোগ্রাম সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করে তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলে। অনুবাদক প্রোগ্রাম অ্যাসেম্বলার, কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটার এই তিন ধরনের হয়ে থাকে। অ্যাসেম্বলার শুধুমাত্র অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করে। অন্যদিকে কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটার উচ্চ স্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সোর্স প্রোগ্রামকে অনুবাদ করার জন্য কত ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম আছে?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

২। কোনটি এক সাথে প্রোগ্রামকে সম্পূর্ণরূপে মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করে?

ক) কম্পাইলার খ) ইন্টারপ্রেটার
গ) অ্যাসেম্বলার ঘ) সবগুলো

পাঠ-৮.৫ প্রোগ্রামের সংগঠন ও প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- একটি আদর্শ প্রোগ্রামের সংগঠন বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্রোগ্রামের সংগঠন, প্রোগ্রাম ডিজাইন , প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন ।

৮.৫.১ প্রোগ্রামের সংগঠন

একটি প্রোগ্রাম তৈরীর রীতি ও গঠনকে প্রোগ্রামের সংগঠন বলে। যেকোন প্রোগ্রাম তৈরী করতে হলে বুঝতে হবে প্রোগ্রামে কি কি ইনপুট নিতে হবে, কিভাবে ইনপুট প্রসেস হবে এবং ফলাফল কি কি আসতে পারে। প্রত্যেক প্রোগ্রামের তিনটি অংশ থাকে, যাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রামে রূপ লাভ করে। অংশ তিনটি হলো–

১। ইনপুট (Input)
২। প্রক্রিয়া (Process) ও
৩। আউটপুট (Output)

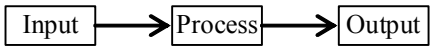

ইনপুট (Input) : যে সকল ডাটা বা নির্দেশ কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হয়।
প্রক্রিয়া (Process) : ইনপুট অনুযায়ী প্রক্রিয়াকরণ করা।
আউটপুট (Output) : প্রক্রিয়াকরণের পর যে ফলাফল পাওয়া যায়।

নিচের প্রোগ্রামটিতে দুইটি সংখ্যার গড় বের করা হয়েছে। প্রোগ্রামের সংগঠনের তিনটি অংশকে দেখানো হয়েছে-

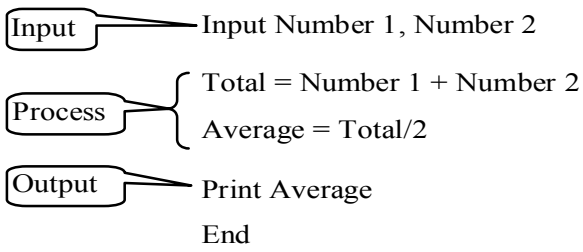

৮.৫.২ প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ

সুষ্ঠুভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করতে না পারলে প্রোগ্রামের ফলাফল পাওয়া যায় না। এজন্য প্রোগ্রাম তৈরির সময় পরিকল্পিত কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হয়। এই ধাপসমূহ হলো-

১। সমস্যা নির্দিষ্টকরণ
২। সমস্যা বিশ্লেষণ
৩। প্রোগ্রাম ডিজাইন
৪। প্রোগ্রাম উন্নয়ন
৫। প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন
৬। প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন ও
৭। প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ

সমস্যা নির্দিষ্টকরণ

এটি প্রোগ্রাম রচনার প্রথম ধাপ। কোন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রামটি রচনা করা হবে তা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা ও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এজন্য সব রকম তথ্যানুসন্ধান করতে হয়। তথ্যানুসন্ধানের জন্য সমস্যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে সমস্যার বর্ণনা প্রস্তুত করা হলে প্রোগ্রামের আশানুরূপ ফলাফল আসতে পারে।

সমস্যা বিশ্লেষণ

সমস্যা নির্দিষ্ট করার পর সমস্যা সংশ্লিষ্ট সকল ডাটা বিশ্লেষণ করতে হবে। ডাটা বিশ্লেষণ করার জন্য চার্ট, গ্রাফ, তালিকা ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে সমস্যাকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে নিতে হয়। এছাড়া সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটার প্রয়োজন কিনা তা নির্ণয়, সমস্যার কাঠামোগত বর্ণনা প্রস্তুত এবং সম্ভব হলে সমস্যার গাণিতিক মডেল প্রস্তুত করতে হয়।

প্রোগ্রাম ডিজাইন

প্রোগ্রাম ডিজাইন হলো সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান সিস্টেমের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নতুন সিস্টেমের মূল রূপরেখা প্রণয়ন। সমস্যার মডেল অথবা গঠনগত বর্ণনা হতে সুবিধাজনক অ্যালগরিদম বা সিদ্ধান্তক্রম নির্ধারণ এবং প্রবাহ চিত্রের সহায়তায় প্রোগ্রামের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করতে হয়। বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সমন্বয় এবং নতুন সিস্টেমে যে আর্থিক সংশ্লিষ্টতা আছে তাও বিবেচনা করতে হয়। প্রোগ্রাম ডিজাইনের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত–

- ইনপুট ডিজাইন
- আউটপুট ডিজাইন এবং
- ইনপটু ও আউটপুটের মধ্যে সম্পর্ক ডিজাইন।

প্রোগ্রাম উন্নয়ন

অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্টের সহায়তায় কম্পিউটারের ভাষায় নির্দেশসমূহ সাজিয়ে প্রোগ্রাম রচনা করতে হয়। একে বলা হয় কোডিং। কোডিং করার পূর্বে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হলো সমস্যাটির প্রকৃতি নির্ধারণ। কারণ সমস্যাটির প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষা নির্বাচনের প্রয়োজন পড়ে। যেমন– বৈজ্ঞানিক কোনো সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হলে সাধারণত FORTRAN ভাষাটি নির্বাচন করা হয়। অনুরূপভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের জন্য COBOL, নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য JAVA ইত্যাদি।

প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন

প্রোগ্রাম রচনার পর প্রথমে প্রোগ্রামের প্রতিটি অংশ এবং পরে সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এ সময় প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে প্রোগ্রামকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত করে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে নেয়া হয়। যদি ফলাফল না মিলে তাহলে বুঝতে হবে প্রোগ্রামে ভুল আছে। এক্ষেত্রে ভুল সংশোধন করতে হবে।

প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন

ভুল সংশোধনের পর প্রোগ্রাম সঠিকভাবে কাজ করলে তাকে Run programme বলা হয় এবং এ প্রোগ্রামকে ভবিষ্যতে সংরক্ষণের জন্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। এ লিপিবদ্ধ প্রোগ্রামকে ডকুমেন্টেশন বলে। আধুনিকীকরণ করার জন্য প্রোগ্রামের সঠিক ডকুমেন্টেশন তৈরি করতে হয় অর্থাৎ প্রোগ্রামের বিবরণী স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে না পারলে এর আধুনিকীকরণ কঠিন হয়ে পড়ে। পেপার, ম্যাগনেটিক ডিস্ক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রোগ্রামকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ

বিভিন্ন প্রয়োজনে ও প্রোগ্রামের উন্নতিকল্পে প্রোগ্রামের আধুনিকীকরণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন ইত্যাদি প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহারিক সুবিধা এবং আর্থিক বিষয় বিবেচনা করে অনেক সময় নতুন প্রোগ্রাম তৈরি না করে বিদ্যমান প্রোগ্রামকে আধুনিকীকরণ করা অধিক সুবিধাজনক।

শিক্ষার্থীর কাজ	কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহের গুরুত্বের ওপর আপনার মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

একটি প্রোগ্রাম তৈরির রীতি ও গঠনকে প্রোগ্রামের সংগঠন বলে। এর ওপর ভিত্তি করেই যে কোনো ধরনের প্রোগ্রামিংয়ের কাজ করা যায়। আবার সঠিকভাবে প্রোগ্রাম তৈরির জন্য সুপরিকল্পিত কিছু ধাপের প্রয়োজন হয়। এই ধাপসমূহকেই বলা হয় প্রোগ্রাম তৈরির ধাপ। আর বিভিন্ন প্রয়োজনে ও প্রোগ্রামের উন্নতিকল্পে প্রোগ্রামের আধুনিকীকরণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন ইত্যাদি প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অন্তর্ভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রত্যেক প্রোগ্রামের কতটি অংশ থাকে?

ক) ২ খ) ৫
গ) ৩ ঘ) সবগুলো

২। প্রোগ্রাম রচনার প্রথম ধাপ কোনটি ?

ক) সমস্যা বিশ্লেষণ খ) সমস্যা নির্দিষ্টকরণ
গ) প্রোগ্রাম উন্নয়ন ঘ) সবগুলো

পাঠ-৮.৬ অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অ্যালগরিদম কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অ্যালগরিদম-এর বৈশিষ্ট্য ও লিখার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফ্লোচার্ট কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ফ্লোচার্ট -এর বৈশিষ্ট্য ও লিখার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট ।

৮.৬.১ অ্যালগরিদম

কোন একটি সমস্যা সমাধানের জন্য কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হয়। অ্যালগরিদম অর্থ ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান। অর্থাৎ একটি সমস্যাকে কয়েকটি ধাপে ভেঙে প্রত্যেকটি ধাপ পর্যায়ক্রমে সমাধান করে সমগ্র সমস্যা সমাধান করা। সমস্যা সমাধানের এই যৌক্তিক পর্যায়ক্রমকে অ্যালগরিদম বলা হয়। অন্য কথায়, যে পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করা হয় তাকে অ্যালগরিদম বলা হয়।

অ্যালগরিদম হচ্ছে একটি প্রোগ্রামের পরিকল্পনা ও যৌক্তিক বিন্যাসের লিখিত বর্ণনা। সমস্যার বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ, ডাটা বা কাজের প্রবাহ, শর্তারোপ ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অ্যালগরিদমে উল্লেখ করা থাকে। এ কারণে প্রোগ্রামারগণ প্রোগ্রাম রচনার পূর্বে অ্যালগরিদম তৈরি করে থাকেন।

অ্যালগরিদমের বৈশিষ্ট্য

১. অ্যালগরিদমে শূন্য, এক বা একাধিক ইনপুট থাকে।
২. কমপক্ষে একটি আউটপুট থাকে।
৩. প্রত্যেকটি ধাপ স্পষ্ট থাকে ।
৪. অ্যালগরিদম সহজবোধ্য।
৫. নির্দিষ্ট সংখ্যক ধাপে সমস্যার সমাধান হয়।
৬. একে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।

উদাহরণ

তিনটি সংখ্যার যোগফল এবং গড় নির্ণয়ের অ্যালগরিদম।

ধাপ-১ : শুরু।
ধাপ-২ : সংখ্যা তিনটি পড়।
ধাপ-৩ : সংখ্যা তিনটির যোগফল বের কর।
ধাপ-৪ : যোগফলকে 3 দ্বারা ভাগ করে গড় নির্ণয় কর।
ধাপ-৫ : যোগফল এবং গড় ছাপাও।
ধাপ-৬ : শেষ কর।

৮.৬.২ ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদমের চিত্ররূপ হলো ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্র। ফ্লোচার্ট প্রোগ্রামের প্রকৃতি ও ধারাবাহিকতা বুঝাতে সাহায্য করে। ফ্লোচার্ট তৈরির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু প্রতীক বা ব্লক ব্যবহার করা হয় এবং সেগুলোকে তাদের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করে তীর চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত করে ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হয়। ফ্লোচার্টের উপর নির্ভর করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। তবে ফ্লোচার্ট কোনো নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ভাষায় লেখা উচিত নয়। একটি ফ্লোচার্টের ডিজাইন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে আলাদা হতে পারে।

এজন্য একজন প্রোগ্রামারকে সর্বোত্তম না হলেও চেষ্টা করা উচিত একটি ভালো ফ্লোচার্ট তৈরি করার।

ফ্লোচার্টের বৈশিষ্ট্য

একটি উন্নতমানের ফ্লোচার্টে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। যেমন —

১। প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে সহায়তা করে।
২। প্রোগ্রাম পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনে সহায়তা করে।
৩। সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বুঝা যায়।
৪। সহজে ও সংক্ষেপে জটিল প্রোগ্রাম লেখা যায়।
৫। প্রোগ্রাম রচনায় সহায়তা করে।

অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্টের মধ্যে পার্থক্য

অ্যালগরিদম (Algorithm)	ফ্লোচার্ট (Flowchart)
১। যে পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করা হয় তাকে বলা হয় অ্যালগরিদম।	১। যে পদ্ধতিতে চিত্রের সাহায্যে কতকগুলো চিহ্ন ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করা হয় তাকে বলা হয় ফ্লোচার্ট।
২। এটি বর্ণনামূলক।	২। এটি চিত্রভিত্তিক।
৩। অ্যালগরিদম লেখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা হয় না।	৩। ফ্লোচার্ট তৈরির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চিহ্ন বা বস্তুকে ব্যবহার করা হয়।
৪। এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম বুঝা কঠিন।	৪। এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম বুঝা সহজ।

শিক্ষার্থীর কাজ	অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্টের সুবিধা ও অসুবিধার ওপর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

অ্যালগরিদম হচ্ছে একটি প্রোগ্রামের পরিকল্পনা ও যৌক্তিক বিন্যাসের লিখিত বর্ণনা। সমস্যার বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ, ডাটা বা কাজের প্রবাহ, শর্তারোপ ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে অ্যালগরিদমে উল্লেখ করা থাকে। অন্যদিকে ফ্লোচার্ট হচ্ছে এক ধরনের রেখাচিত্র যার সাহায্যে একটি অ্যালগরিদম প্রকাশ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অ্যালগরিদমের চিত্ররূপ হলো -

ক) ফ্লোচার্ট খ) প্রোগ্রাম
গ) অ্যালগরিদম ঘ) সবগুলোই

২। ফ্লোচার্টের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

i. প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে সহায়তা করে
ii. সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বুঝা যায়
iii. প্রোগ্রাম রচনায় সহায়তা করে
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৮.৭ বিভিন্ন ফ্লোচার্ট তৈরির নিয়ম ও উদাহরণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট-এ ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রতীক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রোগ্রামের ফ্লোচার্ট ও অ্যালগরিদম লিখতে ও বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সিস্টেম ফ্লোচার্ট, প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট।

৮.৭.১ বিভিন্ন ফ্লোচার্ট তৈরি করার নিয়ম

অ্যালগরিদমের চিত্ররূপ হলো ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্র। কোন ফ্লোচার্ট তৈরি করার জন্য কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করা প্রয়োজন। যেমন–

১। ফ্লোচার্ট তৈরি করার জন্য প্রচলিত প্রতীক ব্যবহার করা উচিত। প্রয়োজনে প্রতীকের সাথে মন্তব্য দেয়া যেতে পারে।
২। প্রত্যেক ফ্লোচার্টের একটি লজিক্যাল Start ও End অর্থাৎ শুরু ও শেষ থাকবে।
৩। ফ্লোচার্ট তৈরি করার সময় সংযোগ চিহ্ন যত কম হয় ততই ভালো।
৪। প্রতিটি চিহ্নের লেখা সংক্ষেপ ও সহজবোধ্য হওয়া উচিত।
৫। তীর চিহ্ন ডাটা বা নির্দেশের প্রবাহের দিকে সাধারণত উপর থেকে নিচে অথবা বাম হতে ডান দিকে অগ্রসর হয়।
৬। চিহ্নগুলোর আকার ছোট বা বড় হতে পারে, তবে স্টাইল আকৃতির পরিবর্তন হবে না।

ফ্লোচার্টের প্রকারভেদ

ফ্লোচার্ট দুই ধরনের। যথা

১। সিস্টেম ফ্লোচার্ট ও
২। প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট

সিস্টেম ফ্লোচার্ট

যে ফ্লোচার্টে ডাটা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণের প্রবাহ দেখানো হয় অর্থাৎ ডাটা গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও ফলাফল প্রদর্শনের প্রবাহ বা দিক চিহ্নিত হয় তাকে সিস্টেম ফ্লোচার্ট বলে। কোন সিস্টেমের কার্যপ্রণালি বুঝাতে নির্দিষ্ট কতকগুলো চিহ্নের মাধ্যমে সিস্টেম ফ্লোচার্ট তৈরি করা হয়।

প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট

কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখার জন্য এই ফ্লোচার্ট ব্যবহার করা হয়। এই ফ্লোচার্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের ধাপসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। মূলত সিস্টেম ফ্লোচার্টের চেয়ে প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টই বেশি ব্যবহৃত হয়। প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে কতকগুলো জ্যামিতিক চিত্র ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো হলো —

প্রতীক	নির্দেশিত অর্থ বা ব্যবহার বা তাৎপর্য
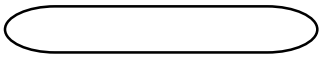	প্রোগ্রাম শুরু বা শেষ করতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
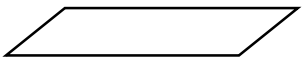	প্রোগ্রামে ইনপুট ও আউটপুটের ক্ষেত্রে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
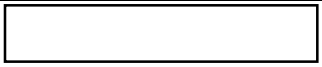	প্রক্রিয়াকরণ (গাণিতিক) এর জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

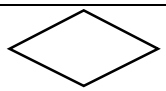	সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	সংযোগের জন্য বা এক পৃষ্ঠার প্রবাহচিত্র অপর পৃষ্ঠার শুরুতে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
	এই চিহ্নের সাহায্যে প্রোগ্রামের গতি নির্দেশ করে।
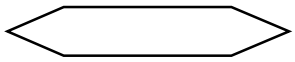	ক্রমান্বয়ে সংযোজন ও বিয়োজনের ক্ষেত্রে এই চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়।

নিচে কিছু সমস্যা সমাধানের অ্যালগরিদম এবং ফ্লোচার্ট দেখানো হলো

উদাহরণ ১ ঃ তিনটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট ।

অ্যালগরিদম ঃ

ধাপ ০১ ঃ কাজ শুরু
ধাপ ০২ ঃ সংখ্যা তিনটির মান গ্রহণ
ধাপ ০৩ ঃ যোগফল নির্ণয়
ধাপ ০৪ ঃ যোগফল ছাপ
ধাপ ০৫ ঃ কাজ শেষ কর

ফ্লোচার্ট ঃ

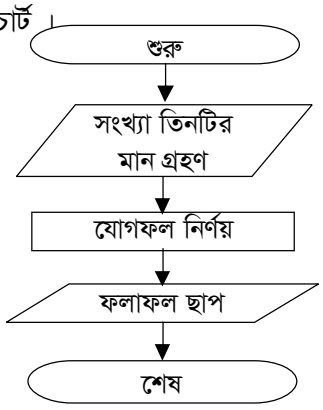

উদাহরণ ২ ঃ সেন্টিগ্রেড স্কেলের তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট স্কেলে রূপান্তরের ফ্লোচার্ট ।
মনেকরি, সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা C এবং ফারেনহাইট তাপমাত্রা F ।

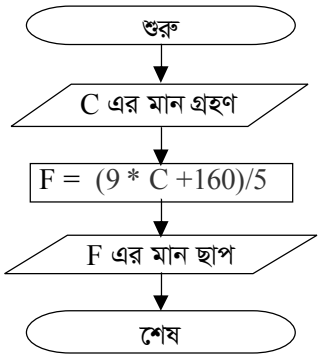

প্রয়োজনীয় সূত্র ঃ

$$\frac{c}{5} = \frac{F-32}{9}$$

$$F = \frac{9c}{5} + 32$$

$$= (9c+160)/5$$

উদাহরণ ৩ ঃ তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয়ের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট ।

অ্যালগরিদম ঃ ধাপ - ১ ঃ কাজ শুরু কর।
ধাপ - ২ ঃ A, B ও C সংখ্যা তিনটির মান গ্রহণ কর।
ধাপ - ৩ ঃ A সংখ্যাটি কি B ও C সংখ্যার চেয়ে বড়?
ক) হ্যাঁ, ফলাফল ছাপ, A সংখ্যাটি বড় এবং ৬ নং ধাপে যাও।
খ) না, পরবর্তী ধাপে যাও।
ধাপ - ৪ ঃ B সংখ্যাটি কি C সংখ্যার চেয়ে বড় ?
ক) হ্যাঁ, ফলাফল ছাপ, B সংখ্যাটি বড় এবং ৬ নং ধাপে যাও।

খ) না, পরবর্তী ধাপে যাও।

ধাপ - ৫ ঃ ফলাফল ছাপ, C সংখ্যাটি বড়।

ধাপ - ৬ ঃ কাজ শেষ কর।

ফ্লোচার্ট ঃ

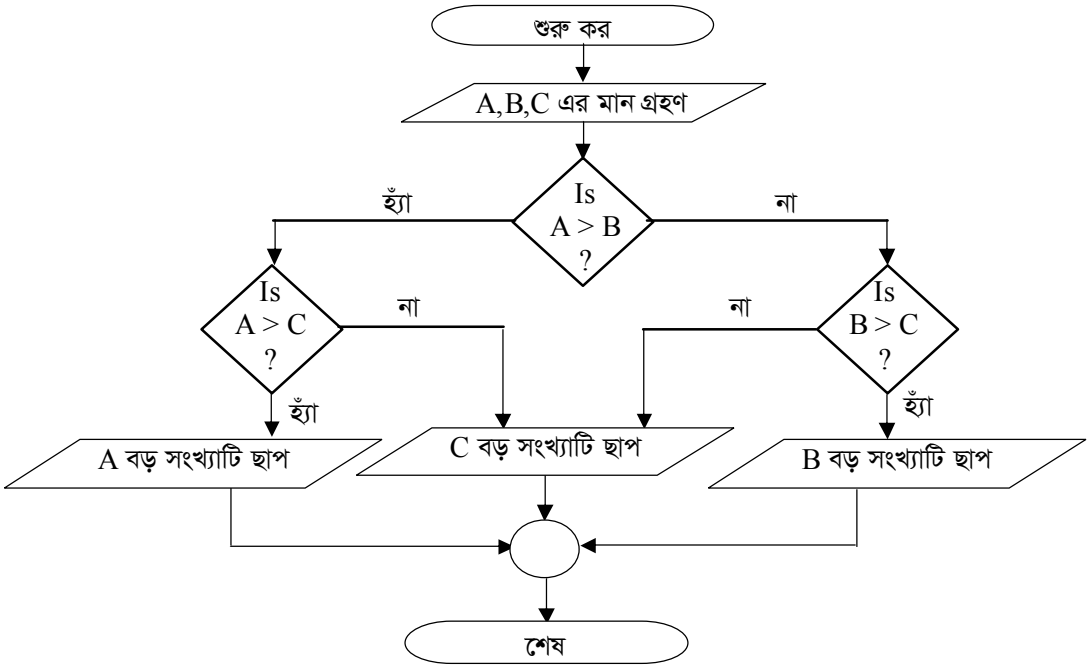

শিক্ষার্থীর কাজ	তিনটি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যাটি নির্ণয়ের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

অ্যালগরিদমের চিত্ররূপ হলো ফ্লোচার্ট বা প্রবাহচিত্র। ফ্লোচার্ট দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা- সিস্টেম ফ্লোচার্ট ও প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট। সিস্টেম ফ্লোচার্ট ডাটা প্রসেসিং সিস্টেমের বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রবাহ দেখাতে ব্যবহৃত হয়। আর কম্পিউটার প্রোগ্রাম লেখার জন্য মূলত প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ফ্লোচার্ট কত ধরনের?

ক. ২ খ. ৫

গ. ৩ ঘ. সবগুলো

২। ফ্লোচার্ট তৈরি করার নিয়ম হলো -

i. প্রত্যেক ফ্লোচার্টের শুরু ও শেষ থাকবে

ii. প্রতিটি চিহ্নের লেখা সংক্ষেপ ও সহজবোধ্য হওয়া উচিত

iii. তীর চিহ্ন সাধারণত উপর থেকে নিচে অথবা বাম হতে ডান দিকে অগ্রসর হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-৮.৮ প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল, ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং , স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং।

৮.৯.১ প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল

প্রোগ্রামের গঠন রীতিনীতিকে প্রোগ্রাম মডেল বলে। সঠিকভাবে প্রোগ্রাম লেখা এবং প্রোগ্রামকে সহজভাবে বুঝার জন্য প্রোগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি মডেল অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ একটি মডেল অনুসরণ করে প্রোগ্রাম লিখলে সহজে অনুধাবনযোগ্য হয়। জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ডিজাইন মডেলসমূহ হলো :

১. স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং (Structured Programming)
২. ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং (Visual Proramming)
৩. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (Object Oriented Programming)
৪. ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং (Event Driven Programming) ইত্যাদি।

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং এমন এক ধরনের প্রোগ্রামিং যেখানে প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে লেখা হয়। শ্রেণিগুলোতে স্টেটমেন্ট ব্যবহারের সংখ্যা সম্পর্কিত কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। তাই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা যায় এবং প্রত্যেক শ্রেণি স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকে। স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং এ টপ-ডাউন-অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে প্রোগ্রামকে কতকগুলো অংশ বা মডিউলে ভাগ করা হয়। এই মডিউলগুলোর মধ্যে একটি মূল মডিউল থাকে এবং কিছু সাব-প্রোগ্রাম বা ফাংশন থাকতে পারে। C, Pascal, QBASIC, ALGOL, PL/I, Ada ইত্যাদি হলো স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং এর উদাহরণ। স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ের গঠন তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

১। পর্যায়ক্রমিক গঠন (Sequential Structure)
২। চক্র বা লুপ (Loop) ও
৩। ডিশিসন স্টেটমেন্ট (Desicion Statement)

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ের বৈশিষ্ট্য

- এটা সহজে অনুধাবনযোগ্য।
- ডিবাগিং করা সহজ।
- সহজে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।
- সহজে রচনা করা যায়।

ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং

যে প্রোগ্রামিং সিস্টেমে মেন্যু বা চিত্রের সাহায্যে কমান্ড বা নির্দেশ প্রদান করা হয় তাকে ভিজুয়্যাল বা দৃশ্যমান প্রোগ্রামিং বলে। অর্থাৎ এটা একটি চিত্রভিত্তিক প্রোগ্রামিং মডেল। উইন্ডোজ (Windows) অপারেটিং সিস্টেম এ মডেলটি সমর্থন করে। ডস (DOS) অপারেটিং সিস্টেমে এ মডেলের প্রোগ্রাম রচনা সম্ভব নয়। ভিজুয়্যাল প্রোগ্রামিং-এ প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয় অবজেক্ট প্রোগ্রামের মধ্যেই সংযুক্ত থাকে। ফলে প্রোগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবজেক্ট নির্বাচন করে শুধু কোডিং করলেই অতি সহজেই প্রোগ্রাম রচনা সম্পন্ন করা যায়। Visual Basic, Visual C, C^{++}, Visual Foxpro, MS

Access ইত্যাদি হলো ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং এর উদাহরণ।

অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং

অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে ডাটা ও ইনস্ট্রকাশনের সমন্বয়ে চলক তৈরি করা হয়। একে বলা হয় অবজেক্ট। মেসেজে আদান-প্রদানের মাধ্যমে অবক্টেগুলো পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। একটি প্রোগ্রাম হলো কতকগুলো ডাটা এবং নির্দেশের সমষ্টি। কোনো প্রোগ্রাম লেখার কাজটা ডাটাকেন্দ্রিক হতে পারে; আবার নির্দেশকেন্দ্রিক হতে পারে। এই প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে প্রোগ্রামের ইনস্ট্রাকশনগুলো ডাটা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। C^{++}, Java, Simula ইত্যাদি হলো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর উদাহরণ। মূলত ৬টি প্রাথমিক ধারণার দ্বারা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংকে উপস্থাপন করা হয়। যেমন –

১। অবজেক্ট (Object)
২। ক্লাস (Class)
৩। মেসেজ (Message)
৪। পলিমারফিজম (Polymorphism)
৫। ইনহেরিটেন্স (Inheritance) ও
৬। এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation)

১। **অবজেক্ট ঃ** অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ভাষায় কোনো বস্তু কিংবা ঘটনার প্রোগ্রামিং সংস্করণ হলো অবজেক্ট। যেমন – একটি ব্যাংক একাউন্টকে একাউন্ট নম্বর, একাউন্ট টাইপ এবং ব্যালেন্স দ্বারা নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক একাউন্ট হলো একটা অবজেক্ট।

২। **ক্লাস ঃ** ক্লাস হলো একই ধরনের অনেকগুলো বস্তু কিংবা ঘটনার logical representation এবং অবজেক্ট হলো প্রোগ্রামে তার physical representation. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এ কোনো অবজেক্টকে প্রোগ্রামে উপস্থাপনের পূর্বে ক্লাস তৈরি করতে হয়।

৩। **মেসেজ ঃ** অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ে এক অবজেক্টের তথ্য আরেক অবজেক্টে পাঠানো যায়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অবজেক্টগুলোর ক্লাসকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে মেসেজ নিয়ে উভয় অবজেক্টই ঠিক মতো কাজ করতে পারে।

৪। **পলিমারফিজম ঃ** পলিমারফিজম মানে হলো অনেক ফর্মস। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের এই ফিচারের মাধ্যমে প্রোগ্রামে পলিমরফিক অবজেক্ট তৈরি করে। পলিমরফিক অবজেক্ট হলো এমন ধরনের অবজেক্ট যার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন গঠন পাওয়া সম্ভব।

৫। **ইনহেরিটেন্স ঃ** অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে একটা ক্লাসকে বর্ধিত করে নতুন আরেকটি ক্লাস সৃষ্টি করাকে ইনহেরিটেন্স বলে। এর ফলে নতুন ক্লাস এ পূর্বের ক্লাস এর গুণাবলি বজায় রেখে নতুন নতুন গুণাবলির সমন্বয় ঘটতে পারে। এখানে যে ক্লাসকে inherit করা হয় তাকে বলে base class এবং যে ক্লাস অন্য ক্লাসকে inherit করে তাকে বলে derived class।

৬। **এনক্যাপসুলেশন ঃ** অবজেক্ট এর attributes এবং behaviours কে একত্রিত করে ক্লাস তৈরি করাকে বলে এনক্যাপসুলেশন।

ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং

যে প্রোগ্রামিংয়ের বিভিন্ন নির্দেশ চিত্রের মাধ্যমে দেয়া হয় তাকে ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং বলে। অর্থাৎ চিত্রভিত্তিক প্রোগ্রামিংগুলোই হলো ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং। ভিজ্যুয়্যাল প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেলের গুরুত্বের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রোগ্রামের গঠন রীতিনীতিকে প্রোগ্রাম মডেল বলে। সঠিকভাবে প্রোগ্রাম লেখা এবং প্রোগ্রামকে সহজভাবে বুঝার জন্য প্রোগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি মডেল অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ একটি মডেল অনুসরণ করে প্রোগ্রাম লিখলে সহজে অনুধাবনযোগ্য হয়। স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং, ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং, অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং, ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং ইত্যাদি হলো জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ডিজাইন মডেল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) অবজেক্ট খ) ক্লাস
গ) পলিমারফিজম ঘ) সবগুলো

২। স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ের গঠন কত ধরনের হয়ে থাকে?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৮

ক. জ্ঞান দক্ষতা স্তর

১। প্রোগ্রাম কী?
২। প্রোগ্রামের ভাষা কী?
৩। মেশিন ভাষা বা যান্ত্রিক ভাষা কী?
৪। ডিবাগিং কী?
৫। অনুবাদক প্রোগ্রাম কি ?
৬। অ্যালগরিদম কী?
৭। ফ্লোচার্ট কী?

খ. অনুধাবন দক্ষতা স্তর

১। অ্যালগরিদম কোডিং এর পূর্বশর্ত-ব্যাখ্যা করুন।
২। ০, ১ দিয়ে লেখা ভাষা -ব্যাখ্যা করুন।
৩। অ্যালগরিদমের চেয়ে ফ্লোচার্টের মাধ্যমে সমস্যা সনাক্ত করা সহজ-ব্যাখ্যা করুন।
৪। অ্যাসেম্বলি ভাষা মেশিন ভাষার চেয়ে উন্নত কেন?
৫। "উচ্চস্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা সুবিধাজনক" - ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রোগ্রামের ত্রুটি সংশোধনের পদ্ধতিকে বলা হয়-

ক. Encoding খ. Debugging
গ. Amending ঘ. Correction

২। কোডিং করা প্রোগ্রামিং-এর কোন ধাপ?

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

৩। সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে একবারে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তর করে কোন প্রোগ্রাম?

ক. কম্পাইলার খ. ইন্টারপ্রেটার
গ. লিংকার ঘ. অ্যাসেম্বলার

৪। অনুবাদক প্রোগ্রাম কত প্রকার?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৫। Compiler একটি–

ক. ডেটাবেজ প্রোগ্রাম খ. স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম
গ. প্রোগ্রামিং ভাষা ঘ. অনুবাদক প্রোগ্রাম

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কম্পিউটারের উচ্চ স্তরের ভাষা হলো–

i. মেশিন
ii. প্যাস্কেল
iii. কোবল
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর বৈশিষ্ট্য কোনটি?

i. অবজেক্ট
ii. ক্লাস
iii. পলিমারফিজম
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১ ও ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষক মেহেদী সাহেব তার শিক্ষার্থীদের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্টের একটি ক্লাস নিয়েছেন। তিনি কোন সমস্যাকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং দ্বারা সমাধান করার পূর্বে কাগজে কলমে বিশেষ পন্থায় সমাধান করার কথা বলেন এবং চিত্রের সাহায্যে এরূপ পদ্ধতির প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১। উদ্দীপকের ২য় পদ্ধতিটি কয় প্রকার ?

ক. ১ খ. ২
গ.৩ ঘ. ৪

২। মেহেদী সাহেবের মতে উদ্দীপকের ১ম পদ্ধতিটি হবে-

i. সহজ বোধ্য
ii. প্রত্যেকটি ধাপ স্পষ্ট
iii. এক বা একাধিক ইনপুট যুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের উদ্দীপকগুলো পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যায়নরত অহনা মাহমুদ বাসায় ১০ + ২০ + ৩০ +---------- + ১০০ পর্যন্ত ধারার যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট তৈরি করল। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ অধ্যায়নরত তার বড় ভাই লাবিবকে দেখালো। লাবিব উক্ত অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্টের উপর ভিত্তি করে একটি বিশেষ স্তরের ভাষা ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করল। মজার বিষয় হল প্রোগ্রামটি রান করার জন্য কোন অনুবাদকের প্রয়োজন হল না।

ক. অ্যাসেম্বলার কী? ১
খ. 4GL ব্যবহারের সুবিধা- ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দিপকের ধারাটির জন্য একটি ফ্লোচার্ট তৈরি করুন। ৩
ঘ. লাবিবের ব্যবহারকৃত ভাষাটি সম্পর্কে আপনার বিস্তারিত মতামত দিন। ৪

২। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ

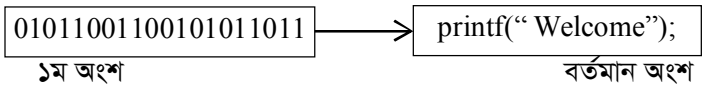

ক. প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল কী ? ১
খ. অনুবাদক প্রোগ্রাম হিসেবে কম্পাইল বেশি উপযোগি-ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের ১ম অংশ কোন প্রজন্মের প্রোগ্রামিং ভাষাকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বর্তমান অংশের জন্য ১ম অংশটিও জরুরি-বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দিন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠ - ৮.১	১	ঘ	২	ঘ
পাঠ - ৮.২	১	ক	২	ঘ
পাঠ - ৮.৩	১	ঘ	২	ঘ
পাঠ - ৮.৪	১	খ	২	ক
পাঠ - ৮.৫	১	গ	২	খ
পাঠ - ৮.৬	১	ক	২	ঘ
পাঠ - ৮.৭	১	ক	২	ঘ
পাঠ - ৮.৮	১	ঘ	২	খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৮

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নঃ

১ খ ২ গ ৩ ক ৪ ঘ ৫ ঘ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ খ ২ ঘ

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ খ ২ ঘ

সি প্রোগ্রামিং

ইউনিট ৯

ভূমিকা : সি হচ্ছে এক ধরনের উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা । এ ভাষা ব্যবহার করে সব ধরনের প্রোগ্রাম বা সফ্টওয়্যার রচনা করা যায়। কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম থেকে শুরু করে সব ধরনের সফ্টওয়্যার তৈরী করতে সি বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় একটি ভাষা। সি প্রোগ্রামিং ভাষার লাইব্রেরি ফাংশন, ব্রাঞ্চিং স্টেটমেন্ট ও কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহার অত্যন্ত সহজ ও বোধগম্য। এই ইউনিটে সি ভাষা ব্যবহার করে কিভাবে প্রোগ্রামিং করা যায় সেগুলো জানতে পারবেন। এছাড়া কম্পাইলারে প্রোগ্রাম রচনা, এডিট করা, প্রোগ্রাম নির্বাহ করার কৌশল শিখতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৯.১ : সি প্রোগ্রামিং এর ধারণা

পাঠ - ৯.২ : সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ও হেডার ফাইল

পাঠ - ৯.৩ : সি ভাষার প্রোগ্রামিং এর গঠন

পাঠ - ৯.৪ : সি ভাষার নমুনা প্রোগ্রাম ও প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ

পাঠ - ৯.৫ : প্রোগ্রাম কম্পাইলিং ও প্রোগ্রাম নির্বাহ করা

পাঠ - ৯.৬ : ডাটা টাইপ

পাঠ - ৯.৭ : ভ্যারিয়েবল বা চলক এবং এর টাইপ

পাঠ - ৯.৮ : অপারেন্ড, অপারেটর ও এক্সপ্রেশন এবং ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট

পাঠ - ৯.৯ : কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট

পাঠ - ৯.১০ : Switch স্টেটমেন্ট

পাঠ - ৯.১১ : Loop স্টেটমেন্ট

পাঠ - ৯.১২ : Break স্টেটমেন্ট ও Continue স্টেটমেন্ট

পাঠ - ৯.১৩ : Array (অ্যারে)

পাঠ - ৯.১৪ : Function (ফাংশন)

পাঠ - ৯.১৫ : ব্যবহারিক (Practical)

পাঠ-৯.১ সি প্রোগ্রামিং এর ধারণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সি প্রোগ্রামিং ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সি প্রোগ্রামিং ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সি ও সি++ প্রোগ্রামিং ভাষার তুলনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সি প্রোগ্রামিং ভাষা।

৯.১.১ 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা

সি একটি বহুল ব্যবহৃত উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা। এটি অন্যান্য উচ্চ স্তর ল্যাংগুয়েজগুলোর মধ্যে অনেক সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় ভাষা। আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরির ডেনিস রিচি ১৯৭০ সালে এ ভাষার উদ্ভাবন করেন। ভাষাটির নাম 'C' রাখা হয়েছে কারণ, B নামের অপর একটি ভাষা আগেই তৈরি হয়েছে। C যাতে তার গুণাগুণ না হারায় সেজন্য ১৯৮৩ সালে কম্পাইলার এবং সফ্টওয়্যার প্রস্তুতকারকদের একটি গ্রুপ আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট (ANSI)-কে C এর জন্য একটি নীতি নির্ধারণের আবেদন জানান। অতঃপর ১৯৮৯ সালের শেষের দিকে নির্ধারিত কমিটি C এর জন্য ANSI নীতি নির্ধারণ করে।

সিস্টেম প্রোগ্রামিং-এর ক্ষেত্রে এ ভাষা অধিক হারে ব্যবহৃত হয়। উপাত্ত সঞ্চালনের বর্ণনার জন্য এ ভাষার সুবিধা অনেক বেশি বলে ভাষাটি অন্যান্য ভাষার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। C ভাষাকে কম্পিউটার ভাষার জনক বলা হয়ে থাকে। এ ভাষারও অনেক সংস্করণ রয়েছে। যেমন– C, ANSI C, Visual C, Turbo C প্রভৃতি। বর্তমানকালের অধিকাংশ প্যাকেজ প্রোগ্রামই এ ভাষার মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে। যে কোনো সফ্টওয়্যার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ ভাষা ব্যবহার করা যায়।

৯.১.২ সি প্রোগ্রামিং ভাষার বৈশিষ্ট্য

প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে সি এর গুরুত্ব অনেক। নিচে সি এর কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল-

১। এটি একটি উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা ।

২। C ভাষা একটি স্ট্রাকচারড প্রোগ্রামিং ভাষা ।

৩। প্রতিটি C প্রোগ্রামিংয়ে একটি main () ফাংশন (Function) থাকে।

৪। প্রতিটি প্রোগ্রামিং স্টেটমেন্ট শেষ হয় সেমিকোলন দ্বারা।

৫। প্রতিটি চলক ব্যবহারের পূর্বেই তাদের ডাটা টাইপ উল্লেখ থাকে।

৬। Header ফাইলগুলো #include দ্বারা যুক্ত করা হয়।

৭। সি ভাষায় অনেক লাইব্রেরী ফাংশন, কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ইত্যাদির সুবিধা আছে।

৯.১.৩ সি ও সি++ এর তুলনা

সি ভাষা থেকে সি++ এর উৎপত্তি। মূলত সি++ একটি সি এর উন্নত ভার্সন। নিচে সি ও সি++ এর তুলনামূলক বর্ণনা দেয়া হল-

সি (C)	সি++(C++)
১. সি একটি প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিং ভাষা ।	১. সি++ একটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ভাষা।

২. সি প্রোগ্রামিং ভাষায় রিজার্ভড ওয়ার্ডের সংখ্যা কম।	২. সি++ প্রোগ্রামিং ভাষায় রিজার্ভড ওয়ার্ডের সংখ্যা বেশী।
৩. পলিমরফিজম ও ইনহেরিটেন্স এর সুবিধা নাই।	৩. পলিমরফিজম ও ইনহেরিটেন্স এর সুবিধা আছে।
৪. টপ-ডাউন এপ্রোচে প্রোগ্রাম ডিজাইন করা হয়।	৪. বটম-ডাউন এপ্রোচে প্রোগ্রাম ডিজাইন করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সি ভাষার ব্যবহারের ওপর একটি প্রতিবেদন লিখুন।

সারসংক্ষেপ

উচ্চ স্তরের ভাষা হিসেবে সি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সি ভাষার মধ্যে কিছু আলাদা বিশেষ ধরনের সুবিধা থাকার দরুন সি ভাষা দিয়ে উচ্চস্তর ও নিম্ন স্তরের ভাষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। যার ফলে সি দিয়ে তৈরি করা যায় সিস্টেম সফ্টওয়্যার ও এপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার। সি হল স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ যার নির্দেশাবলী গঠিত হয় ফাংশন, এক্সপ্রেশন, স্টেটমেন্ট আর কিছু কী-ওয়ার্ড (যেমন- if, else, for, do, while ইত্যাদি) এর সমন্বয়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি একটি সি এর উন্নত ভার্সন?

ক. জাভা খ. সি++
গ. পিএইচপি ঘ. সি শার্প

২। সি ভাষা কোন ধরনের প্রোগ্রামিং মডেল অনুসরণ করে?

ক. স্ট্রাকচার্ড খ. অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড
গ. ভিজুয়েল ঘ.ইভেন্ট ড্রাইভেন

পাঠ-৯.২ সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ফাংশন ও হেডার ফাইল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরির ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হেডার ফাইল কি তা বলতে পারবেন।
- সি প্রোগ্রামিং ভাষার প্রয়োজনীয় লাইব্রেরি ফাংশনের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ফাংশন, হেডার ফাইল।

৯.২.১ সি স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি ফাংশন

বিশেষ কিছু কার্য সম্পাদনের জন্য সি ভাষায় বিল্ট-ইন কিছু ফাংশন আছে তাদেরকে লাইব্রেরি ফাংশন (Library Function) বলে। প্রোগ্রামরা যাতে স্বল্প সময়ে ভালো প্রোগ্রাম লিখে দ্রুত ফলাফল পায় সেজন্য সি ভাষায় অনেক লাইব্রেরি ফাংশন আছে। যেমন কোন সংখ্যার ঘাত (power) নির্ণয় করার জন্য নিজে নিজে কোড লিখে বের করা যায়। কিন্তু সি ভাষায় pow() ফাংশন নামে লাইব্রেরি ফাংশন আছে যেটি ব্যবহার করলেই অনেক সহজে ও দ্রুত কোন সংখ্যার ঘাত পাওয়া যায়।

৯.২.২ সি হেডার ফাইল

কোন একটি সি প্রোগ্রাম লেখার সময় যে সকল ফাংশন ব্যবহার করা হয় এবং ফাংশনগুলো কিভাবে কাজ করে তা নির্দিষ্ট কিছু ফাইলে বর্ণনা করা থাকে। এই ফাইলকে হেডার ফাইল বলে। লাইব্রেরি ফাংশনগুলোর ঘোষণা তাদের হেডার (.h) ফাইলে এবং বিস্তারিত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি (.Lib) ফাইলে দেয়া থাকে। এজন্য সি প্রোগ্রামে কোন লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করলে প্রোগ্রামের শুরুতেই #include ডিরেক্টিভ স্টেটমেন্টের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট হেডার ফাইল সংযুক্ত হয়ে থাকে। প্রোগ্রামে কোন হেডার ফাইল সংযুক্ত করা হলে কম্পাইলার প্রোগ্রাম কম্পাইল করার সময় সংযুক্ত ফাইলের উপাদানগুলো সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি ফাইল থেকে কপি করে। কোন প্রোগ্রামের শুরুতে এসব ফাইল অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যেমন প্রোগ্রামের মধ্যে printf() ও scanf() এ দুটি ফাংশন ব্যবহার করার জন্য হেডার ফাইল হিসাবে stdio.h ফাইলকে অন্তর্ভুক্ত করতে #include<stdio.h> স্টেটমেন্টটি প্রোগ্রামের শুরুতে লিখতে হয়।

৯.২.৩ সি প্রোগ্রামিং ভাষার প্রয়োজনীয় লাইব্রেরি ফাংশন

প্রোগ্রামের শুরুতে #include স্টেটমেন্টের সাহায্যে কোন হেডার ফাইল সংযুক্ত করা হলে তা ঐ ফাইলে বর্ণিত সকল ফাংশনের জন্য কাজ করে। কোন লাইব্রেরি ফাংশনের হেডার ফাইল এবং ব্যবহারবিধি কি তা জানার জন্য ঐ লাইব্রেরি ফাংশনের উপর কার্সর রেখে বা সিলেক্ট করে Ctrl+F1 চাপলে হেল্প ফাইল থেকে তা জানা যায়।

সি প্রোগ্রামিং এর কয়েকটি লাইব্রেরি ফাংশনের নাম ও ব্যবহার

ফাংশন	ব্যবহার
printf()	মনিটরের পর্দায় আউটপুট প্রদর্শন করে।
scanf()	কী-বোর্ড থেকে ইনপুট নেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।
abs ()	কোন সংখ্যার মান নির্ণয় করে।
clock()	প্রোগ্রাম নির্বাহের শুরু থেকে সম্পাদিত ক্লক টিক্ রিটার্ণ করে।
exit()	প্রোগ্রামের নির্বাহের সমাপ্তি ঘটায়।

gettime(), settime()	কম্পিউটার সিস্টেমের সময় নির্ণয় ও পুনর্নির্ধারণ করে।
log(), log100	কোন সংখ্যার লগারদিম তথা $\log_e x$ ও $\log_{10} x$ নির্ণয় করে।
pow()	কোন সংখ্যার ঘাত (power) x^n, 10^n নির্ণয় করে।
rand(), srand()	দৈব (random) সংখ্যা নির্ণয় ও ইনিশিয়ালাইজ করে।
sprt()	কোন ধনাত্মক সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করে।
asin(), acos(), atan()	ত্রিকোণমিতিক কোণের Arc sine, Arc cosin এবং Arc tangent মান নির্ণয় করে।
sin(), cos(), tan()	ত্রিকোণমিতির কোণের sine, cosine এবং tangent মান নির্ণয় করে।
sinh, cos(), tanh()	ত্রিকোণমিতিক কোণের Hyperbolic sine, Hyperbolic cosine এবং Hyperbolic tangent মান নির্ণয় করে।
delay(), sleep()	নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (মিলিসেকেন্ডে) স্টেটমেন্টের নির্বাহ স্থগিত রাখে।
system()	ডস কমান্ড জেনারেট করে।
time(), stime()	কম্পিউটার সিস্টেমের সময়, দিন, তারিখ ইত্যাদি রিটার্ণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দলীয়ভাবে হেডার ফাইলের প্রয়োজনীতার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেকটি সি-প্রোগ্রাম এক বা একাধিক মডিউলের সমন্বয়ে গঠিত যেগুলোকে সাধারণত বলা হয় ফাংশন । এই ফাংশনগুলো একটি প্রধান বা মেইল ফাংশনের মাধ্যমে নির্বাহ হয়। অর্থাৎ সি প্রোগ্রামে একটি মেইন ফাংশনের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য ফাংশনগুলো নির্বাহিত হয়। প্রত্যেকটি ফাংশনের প্রোটোটাইপ যে ফাইলে বর্ণিত থাকে তাকে ফাংশনের হেডার ফাইল বলে। কোন ফাংশন ব্যবহারের পূর্বে হেডার ফাইল করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি (C) প্রোগ্রামের বিল্ট-ইন ফাংশনকে কি বলে?

ক) লাইব্রেরি খ) হেডার
গ) ইউজার ফাংশন ঘ) সবগুলো

২। printf() ফাংশনকে কি করে?

ক) ডস কামান্ড জেনারেট করে খ) মনিটরের পর্দা পরিষ্কার করে
গ) কোন সংখ্যার পরম মান নির্ণয় করে ঘ) মনিটরের পর্দায় আউটপুট প্রদর্শন করে

পাঠ-৯.৩ সি ভাষার প্রোগ্রামিং এর গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সি ভাষার প্রোগ্রামিং এর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নমুনা প্রোগ্রামের অংশসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মেইন ফাংশন, সাব রুটিন।

৬.৩.১ সি ভাষার প্রোগ্রামিং এর গঠন

সি প্রোগ্রাম কতকগুলো ফাংশন এর সমষ্টি। এই ফাংশনগুলোকে বলা হয় সাবরুটিন। সি প্রোগ্রাম লিখতে হলে প্রথমে এক বা একাধিক ফাংশন গঠন করতে হয়। তারপর ফাংশনগুলোকে একসাথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। একটি সি প্রোগ্রাম এক বা একাধিক সেকশন নিয়ে গঠিত। সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

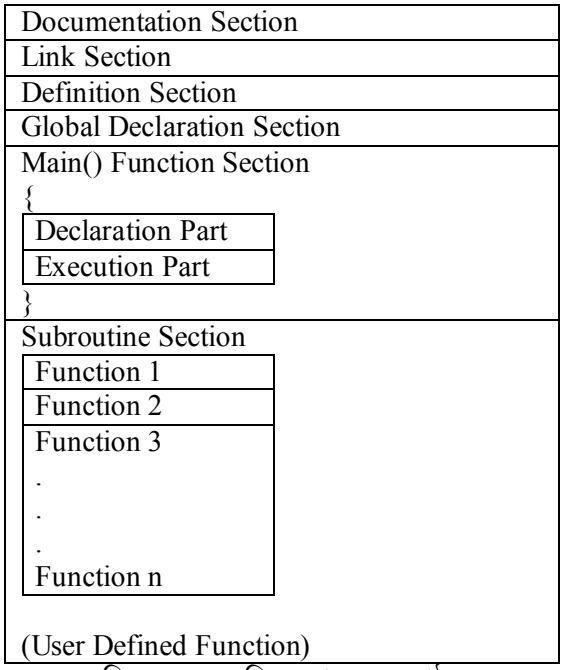

চিত্র ৯.৩.১ : সি প্রোগ্রামের সংগঠন

Documentation Section : এই সেকশনে এক বা একাধিক মন্তব্য, প্রোগ্রামের নাম, প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু, প্রোগ্রাম রচয়িতার নাম, প্রোগ্রাম ব্যবহারের নিয়ম ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়।

Link Section : এই সেকশনের দ্বারা কম্পাইলারের সাথে বিভিন্ন লাইব্রেরি ফাংশনের সংযোগ স্থাপন করা হয় এবং হেডার ফাইল সংযুক্ত করা হয়। Definition Section এ সমস্ত Symbolic Constant ঘোষণা করা হয়।

Global Declaration Section : Global Variable সমূহ এখানে ঘোষণা করা হয়।

main() Function : প্রতিটি C প্রোগ্রামে একটি main() Function থাকবেই। main() Function এর দুটি অংশ। একটি Declaration Part এবং অন্যটি Execution Part।

- **Declaration Part**-এ প্রয়োজনীয় চলক যা নির্বাহ অংশে ব্যবহার করা হবে তা ঘোষণা করতে হয় এবং
- **Execution Part** প্রোগ্রাম নির্বাহ করে।

Subprogramme Section: এখানে এক বা একাধিক ব্যবহারকারীর তৈরি ফাংশন থাকবে যা main() Function এ Call করা হবে।

উদাহরণের সাহায্যে সি প্রোগ্রামের এর বেসিক স্ট্রাকচার এর বিভিন্ন অংশ ঃ

ধরা যাক, একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার সি প্রোগ্রাম ।

```
/*A program to calculate the area of a circle*/ ⟶ Comment/Ducumentation section
#include<stdio.h>
#include<conio.h>  } Link section
#define PI 3.1416
float circle_area(int r); } Difinition section
int radius;  ⟶ Global declaration section
void main()  ⟶ Main function
    {⟶ Program start
    float area; ⟶ Declaration part
    printf("\n Enter value for radius : ");
    scanf("%d",&radius);
    area=circle_area(radious);
    printf("\n Area of a circle=%f",area);   } Executable part
    getch();
    } ⟶ Program close
float circle_area(int r) ⟶ Sub-program section or User defined function
{
float a;
a=3.1416*r*r;
return(a);
}
```

শিক্ষার্থীর কাজ	ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লিখুন এবং সি প্রোগ্রামের বিভিন অংশ সনাক্ত করুন।

সারসংক্ষেপ

সি প্রোগ্রাম কতকগুলো ফাংশন এর সমষ্টি। এই ফাংশনগুলোকে বলা হয় সাবরুটিন। সি প্রোগ্রাম লিখতে হলে প্রথমে এক বা একাধিক ফাংশন গঠন করতে হয়। তবে ফাংশন মেইন ফাংশনের অধীনেই নির্বাহ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি প্রোগ্রামে Documentation Section-এ কি থাকে?

ক) মন্তব্য খ) প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু

গ) প্রোগ্রামের নাম ঘ) সবগুলোই

২। main() Function এ কয়টি অংশ থাকে?

ক) ২ টি খ) ৩ টি

গ) ৪ টি ঘ) ৫ টি

পাঠ-৯.৪ সি ভাষার নমুনা প্রোগ্রাম ও প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সি ভাষার প্রোগ্রাম লেখা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নমুনা প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	এডিটর, ফরম্যাট স্পেসিফায়ার।

৯.৪.১ সি ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা

সি ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার জন্য এডিটর প্রয়োজন হয়। বেশীর ভাগ কম্পাইলারের সোর্স এডিটর থাকে, যেখানে প্রোগ্রাম লিখা যায় ও নির্বাহ করে ফলাফল দেখা যায়। যেমন- টারবো সি (Turbo C), কোডব্লকস (CodeBlocks) ইত্যাদি। এ পাঠে কোডব্লকস সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে নতুন প্রোগ্রাম কিভাবে লেখা যায় এবং নমুনা প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৯.৪.২ সি ভাষায় প্রোগ্রাম খোলা

কোডব্লকস ব্যবহার করে সি প্রোগ্রাম লেখার জন্য নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

১. প্রথমে Start→ All Programs→ CodeBlocks → CodeBlocks ক্লিক করলে কোডব্লকস প্রোগ্রাম চালু হবে।

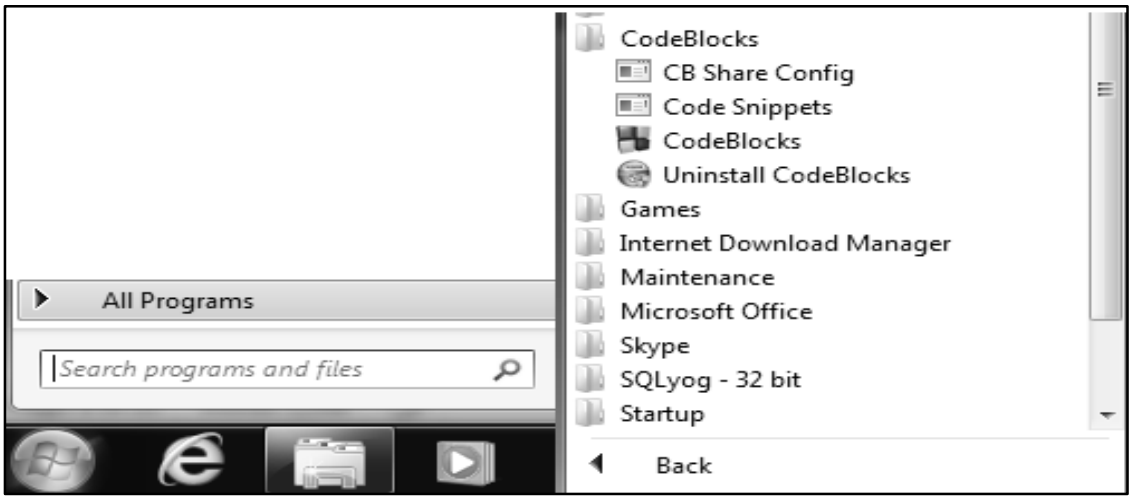

চিত্র ৯.৪.১: কোডব্লকস প্রোগ্রাম চালুকরণ

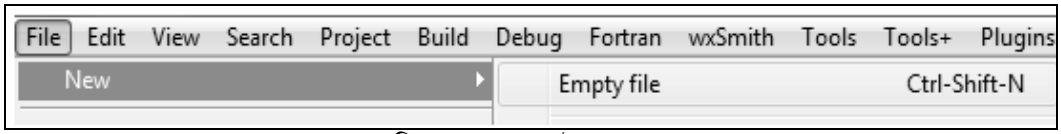

চিত্র ৯.৪.২: ফাইল খোলা

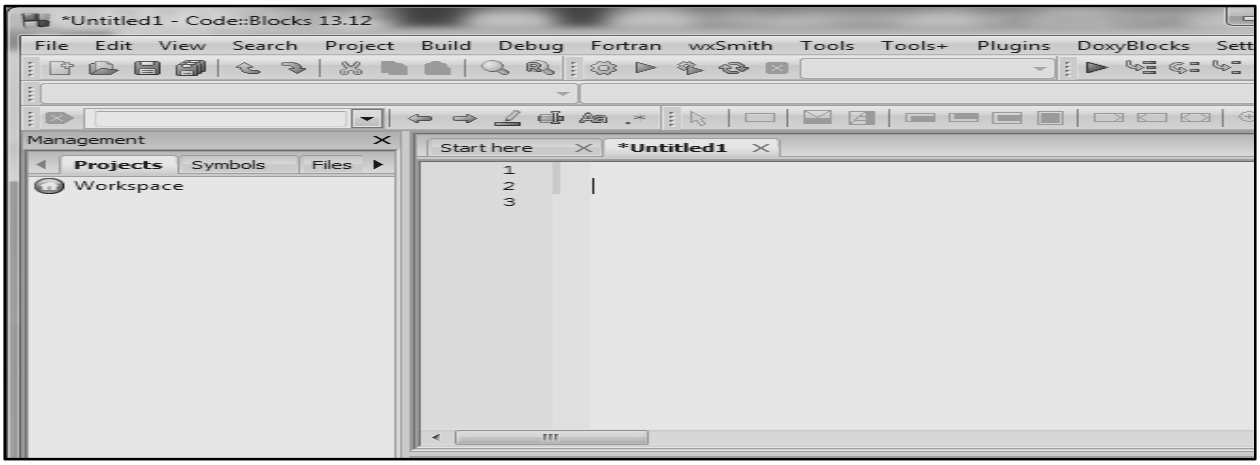

চিত্র ৯.৪.৩: নমুনা ফাইল

২. চিত্র ৯.৪.২ এর মত, File মেনু হতে New→ Empty File এ ক্লিক করলে চিত্র ৯.৪.৩ এর মত প্রোগ্রাম লেখার এডিটিং উইন্ডো আসবে। উপরের দিকে প্রোগ্রাম লেখার কার্সর দেখা যাবে।

৩. প্রয়োজনীয় কোড লিখতে হবে। নিচের প্রোগ্রামটি দুটি সংখ্যা যোগ করার একটি নমুনা প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int a,b,sum;
   printf("Enter first number:");
   scanf("%d",&a);
   printf("Enter Second number:");
   scanf("%d",&b);
   sum=a+b;
   printf("\nSum is: %d", sum);
}
```

চিত্র ৯.৪.৪: দুইটি সংখ্যা যোগ করার সি প্রোগ্রাম

৪. সি প্রোগ্রামের ফাইল সংরক্ষণ করার জন্য File মেনু হতে Save /Save as এ ক্লিক করলে ফাইল এর নাম লেখার ডায়ালগ বক্স আসবে। এক্ষেত্রে sum.c নাম দিয়ে এন্টার কী চাপলে ফাইল সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

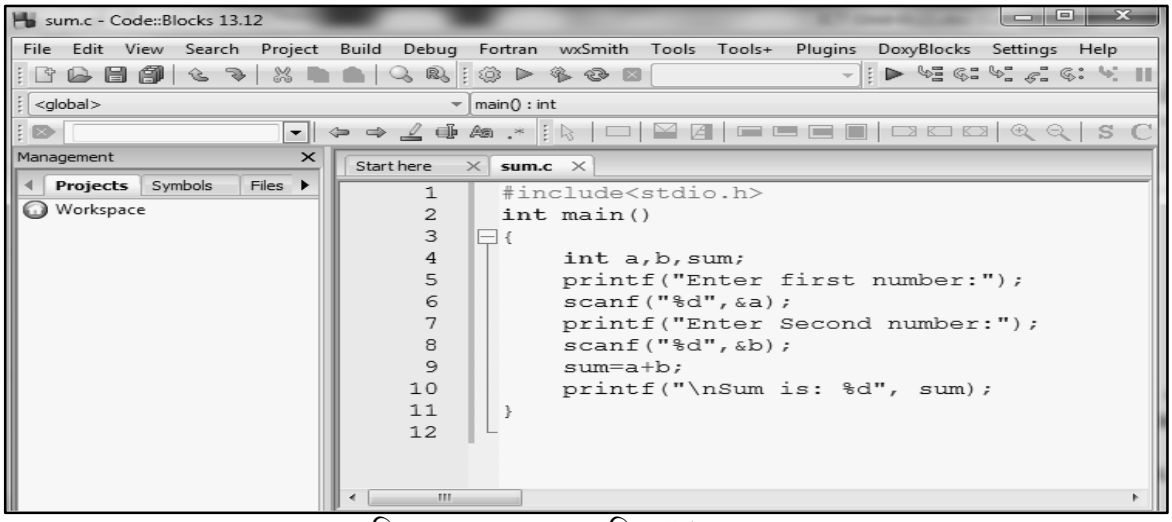

চিত্র ৯.৪.৫: নমুনাকৃত সি প্রোগ্রাম

৫. প্রোগ্রাম কম্পাইল করার জন্য Bulid→ Compile Current file এ ক্লিক করতে হবে।

৬. প্রোগ্রাম Run করার জন্য Bulid→ Run এ ক্লিক করতে হবে। ফলে আউটপুট উইন্ডো আসবে।

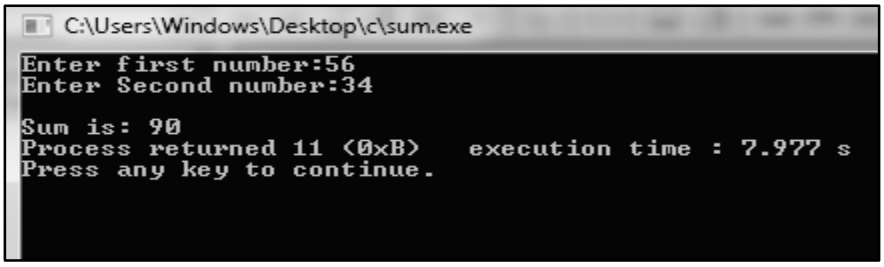

চিত্র ৯.৪.৫: আউটপুট উইন্ডো

৭. প্রথম সংখ্যা ৫৬ ও দ্বিতীয় সংখ্যা ৩৪ ইনপুট প্রবেশ করায় যোগফল ৯০ হয়েছে।

৯.৪.৩ প্রোগ্রাম বিশ্লেষণ

একটি প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণের জন্য উপরে বর্ণিত sum.c নমুনা প্রোগ্রামটির ব্যাখ্যা দেয়া হল-

১.	#include<stdio.h>	প্রোগ্রামের মধ্যে দুইটি লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করা হয়েছে। যথা- printf() এবং scanf()। এই ফাংশনগুলো কিভাবে কাজ করে, তা stdio.h নামক হেডার ফাইলে বর্ণিত আছে। হেডার ফাইল লেখার জন্য শুরুতেই #include এর মাধ্যমে সংযুক্ত করতে হবে।
২.	int main()	প্রত্যেকটি সি প্রোগ্রাম কম্পাইল ও নির্বাহ শুরু হয় main() ফাংশন থেকে। তাই প্রত্যেকটি সি প্রোগ্রাম লেখার সময় main() ফাংশন অবশ্যই লিখতে হয়।
৩.	{ }	এটি দ্বারা main() ফাংশনের শুরু ও শেষ সীমা বুঝানো হয়।
৪.	int a,b,sum;	প্রত্যেকটি সি প্রোগ্রামে সাময়িকভাবে ডাটা রাখার জন্য কিছু ভ্যারিয়েবল ব্যবহৃত হয়। এই উদাহরণে দুইটি সংখ্যার মান রাখার জন্য a ও b দুইটি এবং ফলাফল রাখার জন্য sum ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। একাধিক ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সময় দুটি ভ্যারিয়েবলের মাঝে কমা বসাতে হয় ও শেষে সেমিকোলন দিতে হয়।
৫.	printf("Enter first number:");	printf() ফাংশনের কাজ হল কোন কিছু মনিটরে প্রদর্শন করা। এটা ইনভার্টেড কমার ভেতরের অংশ প্রদর্শন করে। নমুনা প্রোগ্রামে এই লাইনটি নিচের মত করে আউটপুট দেখায়- Enter first number:
৬.	scanf("%d",&a);	scanf() ফাংশনের কাজ হল কোন কি-বোর্ড থেকে কোন ভ্যালু নিয়ে কোন ভ্যারিয়েবলে রাখা। %d কে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার বলে। ভ্যারিয়েবলে কোন ধরণের মান থাকবে যেমন- দশমিক, পূর্ণসংখ্যা, ক্যারেকটার তা নির্ধারণ করতে ফরম্যাট স্পেসিফায়ার ব্যবহৃত হয়। আমাদের উদাহরণে, পূর্ণসংখ্যার জন্য %d ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে ব্যবহারকারী প্রদত্ত পূর্ণসংখ্যার ইনপুট a ভ্যারিয়েবলে সংরক্ষিত হবে।
৭.	printf("Enter Second number:");	নমুনা প্রোগ্রামে এই লাইনটি নিচের মত করে আউটপুট প্রদর্শন করে- Enter Second number:
৮.	scanf("%d",&b);	ইউজার প্রদত্ত ইনপুট b ভ্যারিয়েবলে সংরক্ষিত হবে।
৯.	sum=a+b;	a ও b এর মান যোগ করে যোগফল sum ভ্যারিয়েবলে সংরক্ষিত হবে।
১০.	printf("\n Sum is:	নমুনা প্রোগ্রামের ফলাফল প্রদর্শন করে।

	%d", sum);	\n নতুন লাইনে আউটপুট প্রদর্শন করার জন্য কার্সর পরের লাইনে নিয়ে যায়। আর %d এর স্থানে sum ভ্যারিয়েবলের মান প্রদর্শিত হবে। অর্থাৎ- Sum is : 90

শিক্ষার্থীর কাজ	তিনটি সংখ্যা যোগ করার সি প্রোগ্রাম লিখুন ও ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে হলে একটি এডিটরের প্রয়োজন হয়। তবে বেশীর ভাগ কম্পাইলারের সোর্স এডিটর থাকে, যেখানে প্রোগ্রাম কোডিং করা যায় ও নির্বাহ করে ফলাফল দেখা যায়। যেমন- টারবো সি (Turbo C), কোডব্লকস (CodeBlocks) ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি প্রোগ্রামে হেডার ফাইল লেখার জন্য শুরুতেই কিভাবে লিখতে হয়?

ক) #include এর মাধ্যমে
খ) #conclude এর মাধ্যমে
গ) #main এর মাধ্যমে
ঘ) সবগুলোই

২। পূর্ণ সংখ্যার ফরম্যাট স্পেসিফায়ার কোনটি?

ক) % b
খ) % x
গ) % d
ঘ) % f

পাঠ-৯.৫ প্রোগ্রাম কম্পাইলিং ও প্রোগ্রাম নির্বাহ করা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- একটি নমুনা প্রোগ্রাম সেইভ ও কম্পাইল করতে পারবেন।
- একটি নমুনা প্রোগ্রাম রান করতে ও ফলাফল দেখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কম্পাইলার, সোর্স প্রোগ্রাম, অবজেক্ট প্রোগ্রাম।

৯.৫.১ সি ভাষায় নমুনা প্রোগ্রাম সেইভ করা

সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখার জন্য কোডব্লকস খুলতে হবে। ধরা যাক নিচের মত করে একটি প্রোগ্রাম লিখতে হবে।

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int a,b,c,sum;
   printf("Enter first number:");
   scanf("%d",&a);
   printf("Enter Second number:");
   scanf("%d",&b);
   printf("Enter Third number:");
   scanf("%d",&c);
   sum=a+b+c;
   printf("\nSum is: %d", sum);
}
```

চিত্র ৯.৫.১ : তিনটি সংখ্যা যোগ করার সি প্রোগ্রাম

১. প্রথমে Start→ All Programs→ CodeBlocks → CodeBlocks ক্লিক করলে কোডব্লকস প্রোগ্রাম চালু হবে।

২. প্রয়োজনীয় কোড লিখতে হবে (চিত্র ৯.৫.২)।

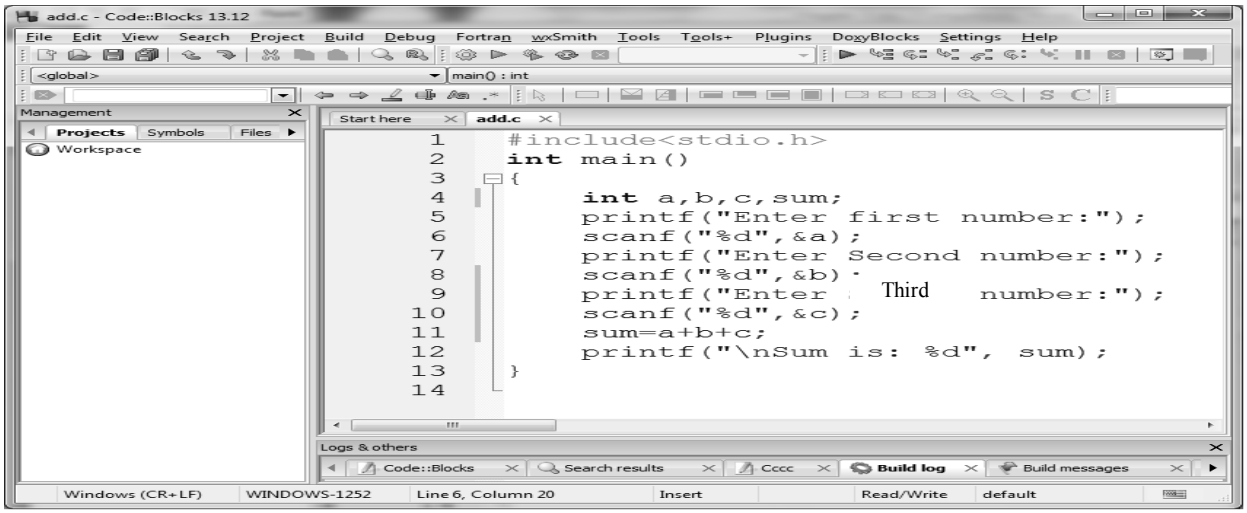

চিত্র ৯.৫.২: লিখিত প্রোগ্রাম

৩. প্রোগ্রামের ফাইল সেইভ করার জন্য File মেনু হতে Save /Save as এ ক্লিক করলে ফাইল এর নাম লেখার ডায়ালগ বক্স আসবে যে কোন একটি নাম দিয়ে প্রোগ্রামটি সেইভ করতে হবে। ধরা যাক, এক্ষেত্রে add.c নাম দিয়ে প্রোগ্রামটি করা হয়েছে।

৯.৫.২ প্রোগ্রাম কম্পাইলিং

কম্পাইলার সোর্স প্রোগ্রামকে একসাথে সম্পূর্ণরূপে মেশিনের ভাষায় অনুবাদ করে একটি অবজেক্ট প্রোগ্রাম এবং একটি এক্সিকিউশন ফাইল তৈরি করে। ফলে প্রোগ্রামিং প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুততর হয় এবং প্রোগ্রামারকে নিজ হাতে কোনো অনুবাদকের কাজ করতে হয় না। এই কম্পাইল করার জন্য Compile মেনু হতে Compile সাব মেনু সিলেক্ট করতে হয় বা Alt+F9 কী একত্রে চাপতে হয়। অবশ্য শুধু F9-কী press করেও কম্পাইল করা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতর ভাষায় প্রোগ্রামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার ব্যবহৃত হয়। কারণ কোনো নির্দিষ্ট কম্পাইলার একটি মাত্র উচ্চতর ভাষার প্রোগ্রামকে কম্পাইল করতে পারে। যেমন- যে কম্পাইলার C প্রোগ্রামকে কম্পাইল করতে পারে সেই কম্পাইলার বেসিক প্রোগ্রাম কম্পাইল করতে পারে না।

কম্পাইলিংয়ের কাজসমূহ

১। উৎস প্রোগ্রামকে অনুবাদ করে অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করা।

২। প্রোগ্রামকে লিংক করা। অর্থাৎ প্রোগ্রামের সঙ্গে প্রয়োজনীয় রুটিন যোগ করা। রুটিন হলো প্রোগ্রামের ছোট অংশ যাতে কোনো নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয়া থাকে।

৩। প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা প্রকাশ করা।

৪। প্রধান মেমোরিতে প্রোগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় মেমোরির অবস্থান তৈরি করা।

৫। প্রয়োজনে Source বা উৎস প্রোগ্রামকে ছাপিয়ে বের করা।

৯.৫.৩ সি ভাষায় নমুনা প্রোগ্রাম কম্পাইল করা ও রান করা

১. প্রোগ্রাম কম্পাইল করার জন্য Bulid→ Compile Current file এ ক্লিক করতে হবে।

২. প্রোগ্রাম Run করার জন্য Bulid→ Run এ ক্লিক করতে হবে। ফলে আউটপুট উইন্ডো আসবে।

৩. এক্ষেত্রে নমুনা প্রোগ্রামে বিভিন্ন ভ্যারিয়েবল এর মান a=5, b=6 এবং c=44 ইনপুট করলে আউটপুট হিসেবে sum=55 পাওয়া যাবে এবং ফলাফল চিত্র ৯.৫.২ তে দেখানো হয়েছে।

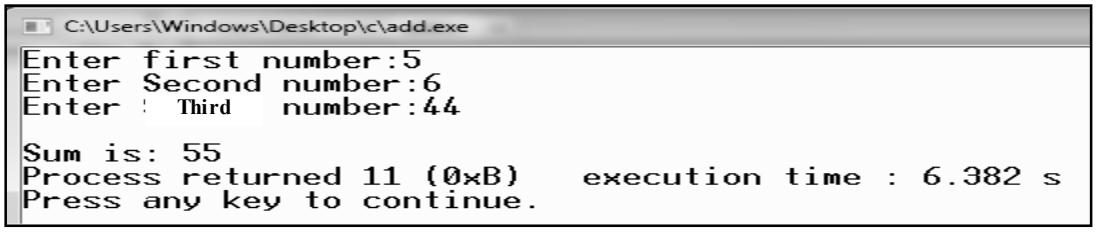

চিত্র ৯.৫.৩: ফলাফল

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রোগ্রাম কম্পাইলিং করার প্রয়োজনীতা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

কম্পাইলার হলো এক ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম যা সোর্স প্রোগ্রামকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করে অবজেক্ট প্রোগ্রামে পরিণত করে। অর্থাৎ কম্পাইলার সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে পরিণত করে এবং একটি এক্সিকিউশন ফাইল তৈরি করে। ফলে প্রোগ্রামিং প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুততর হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি প্রোগ্রামের ফাইল সেইভ করার জন্য File মেনু হতে কোথায় ক্লিক করতে হয়?

ক. Save /Save as খ. New/ Save
গ. open/ Save ঘ. সবগুলোই

২। নিচের কোন কমান্ডের সাহায্যে সি প্রোগ্রাম কম্পাইল করা যায়?

ক. Alt + F7 খ. Alt + F8
গ. Alt + F9 ঘ. Alt + F10

পাঠ-৯.৬ ডাটা টাইপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ডাটা টাইপ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সি প্রোগ্রামিং ভাষার ডাটা টাইপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডাটা টাইপ ।

৯.৬.১ ডাটা টাইপ

যে সকল ঘটনা বা ফ্যাক্ট প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংগ্রহ করা হয় তাকে বলা হয় ডাটা বা উপাত্ত। যেমন– ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট প্রস্তুত করার জন্য সংগৃহীত নাম, রোল নং, বিভিন্ন বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর হলো এক একটি ডাটা। আর বিভিন্ন ধরনের ডাটার বিন্যাসই হলো ডাটা টাইপ। সি প্রোগ্রামিং ভাষা ডাটা টাইপের জন্য বেশ সমৃদ্ধ। সাধারণত ডাটা টাইপ মেশিনের উপর নির্ভরশীল। ANSI C তে চার ধরনের ডাটা ব্যবহৃত হয়। যথা–

(১) মৌলিক বা প্রাইমারী বা ফান্ডামেন্টাল ডাটা টাইপ (Primary or Fundamental data type)

(২) ব্যবহারকারী কর্তৃক সংজ্ঞায়িত বা ইউজার ডিফাইন ডাটা টাইপ (User define data type)

(৩) ডিরাইভড ডেটা টাইপ (Derived data type) এবং

(৪) ফাঁকা বা এ্যামটি ডাটা টাইপ (Empty data type)

সাধারণত ডাটা টাইপ বলতে Primary (or fundamental) data type কেই বোঝানো হয়। প্রাইমারী ডাটা টাইপকে আবার নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায় :

1. Integer data
2. Floating data
3. Character data
4. Double data

Integer Data

Integer হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা। এ ডাটার ব্যাপ্তি মেশিনের উপর নির্ভর করে। সাধারণত Integer মেমোরিতে একটি শব্দ ধারণ করে মেশিন ভেদে যা ১৬ বিট বা ৩২ বিট জায়গা দখল করে। যদি আমরা ১৬ শব্দ দৈর্ঘ্যের মেশিন ব্যবহার করি তাহলে Integer এর ব্যাপ্তি হবে -32,768 (-2^{15}) হতে +32,267 ($+2^{15}-1$) পর্যন্ত। অর্থাৎ একটি ডাটার মান যদি -32,768 থেকে +32,767 এর মধ্যে হয় তবে আমরা ঐ ডাটাকে Integer হিসেবে ঘোষণা করতে পারি।

Integer ডাটার ব্যাপ্তি নির্ধারণের জন্য সি ভাষায় Integer ডাটাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হলো, short int, int এবং long int। প্রতিটি ভাগকে আবার signed এবং unsigned এ ভাগ করা হয়েছে। চলক ঘোষণা করার সময় signed ঘোষণা না করলেও তা নিজে নিজেই signed হিসেবে কাজ করে। কোন ডাটাকে Integer হিসেবে ঘোষণা করতে int শব্দটি ব্যবহার করতে হয়। যেমন- int x, int y, int sum ইত্যাদি।

Floating Point Data

দশমিকযুক্ত সংখ্যাকে Floating Point বা প্রকৃত সংখ্যা বলা হয়। এই ধরনের সংখ্যা মেমোরিতে ৩২ বিট (১৬ বিট বা ৩২ বিট মেশিনের) জায়গা দখল করে যার মধ্যে দশমিকের পরের অংশের জন্য ৬ বিট। এই ধরনের সংখ্যা float এর মাধ্যমে ঘোষণা করতে হয়। যেমন- float a, float b, float sum ইত্যাদি।

Character Data
Character Type ডাটার মাধ্যমে কোনো চিহ্ন (গাণিতিক বর্ণ, বর্ণ বা কোনো বিশেষ বর্ণ) প্রকাশ করা হয় । এই ধরনের সংখ্যা মেমোরিতে ৮ বিট (১ বাইট) জায়গা দখল করে। signed এবং unsigned এই দুইভাবে Character Type ডাটা প্রকাশ করা হয়। signed ঘোষণা করলে -১২৮ থেকে +১২৭ এবং unsigned ঘোষণা করলে ০ থেকে ২৫৫ মানের মধ্যে ডাটা প্রকাশ করা যায়। এই ধরনের ডাটা বোঝানোর জন্য চলকের নামের আগে char ব্যবহার করা হয়। যেমন- char p।

Double Data
অনেক বেশী মানের দশমিক সংখ্যার জন্য Double ব্যবহার করা হয়। যেমন-৫.১২১৩১৪১৫৪৫৭৬। Double সংখ্যা মেমোরিতে ৬৪ বিট জায়গা দখল করে যার মধ্যে ১৪ বিট দশমিকের পরের অংশের জন্য সংরক্ষিত থাকে। Long Double সংখ্যা মেমোরিতে ৮০ বিট জায়গা দখল করে। এই ধরনের সংখ্যা double এর মাধ্যমে ঘোষণা করতে হয়। যেমন- double p, double bb, double sum ইত্যাদি।

User Defined Data
প্রয়োজনে প্রোগ্রামার বা ব্যবহারকারী তার নিজের মত করে ইচ্ছানুযায়ী ডাটা তৈরী করতে পারে। এদেরকে User Defined Data বলে। User Defined Data কয়েক ধরনের হয়। যেমন-স্ট্রাকচার, ইউনিয়ন, ইনিউমারেশন ইত্যাদি।

Derived Data
ডিরাইভড ডাটা হিসেবে সাধারণত অ্যারে, ফাংশন, স্ট্রাকচার, পয়েন্টার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Empty Data
এমটি ডাটা সেট হিসেবে সাধারণত ভয়েড (Void), ভ্যালুলেস (Value less) বা নাল (null) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ছকের মাধ্যমে সি ভাষায় ব্যবহৃত ডাটা টাইপের শ্রেণিবিভাগ তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

ইনপুটকৃত ডাটার প্রক্রিয়াকরণের ফলেই আউটপুট পাওয়া যায়। আর বিভিন্ন ধরনের ডাটার সমন্বয়ে গঠিত ডাটার বিন্যাসই হলো ডাটা টাইপ। সি ভাষা ডাটা টাইপের জন্য বেশ সমৃদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ANSI C-তে কত ধরনের ডাটা ব্যবহৃত হয়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

২। সি ভাষায় পূর্ণ সংখ্যার ডাটা টাইপ কোনটি?
ক. ক্যারেক্টার খ.ইন্টিজার
গ. স্ট্রিং ঘ.ফ্লোটিং

পাঠ-৯.৭ ভ্যারিয়েবল বা চলক এবং এর টাইপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভ্যারিয়েবল বা চলক কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভ্যারিয়েবল বা চলকের নামকরণের নিয়মাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভ্যারিয়েবল বা চলক এর ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ভ্যারিয়েবল বা চলক।

৯.৭.১ ভ্যারিয়েবল বা চলক

ভ্যারিয়েবল শব্দের অর্থ পরিবর্তনশীল। চলক বা ভ্যারিয়েবল হলো মেমোরী লোকেশনের নাম বা ঠিকানা যাতে পরিবর্তনশীল মান সংরক্ষণ করা যায়। তবে প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় যার মান পরিবর্তিত হয় তাকে চলক বলে।

৯.৭.২ ভ্যারিয়েবল বা চলকের নামকরণের নিয়মাবলী

ভ্যারিয়েবল বা চলকের নামকরণের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। যেমন-

১। চলকের প্রথম অক্ষরটি অবশ্যই আন্ডারস্কোর (–) অথবা a থেকে z এর মধ্যে এক বা একাধিক বর্ণ হতে হবে।
২। চলকের দ্বিতীয় অক্ষর থেকে পরবর্তী অক্ষরগুলো যে কোনো বর্ণ বা অংক কিংবা বর্ণ ও অংক উভয়ই থাকতে পারে।
৩। চলকের নামের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক ৩১টি অক্ষর হতে পারে।
৪। চলকের মধ্যে বিশেষ কোনো চিহ্ন বা প্রতীক যেমন +, -, *, @ = ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। তবে আন্ডারস্কোর ব্যবহার করা যাবে।
৫। প্রোগ্রামের কোনো রিজার্ভড ওয়ার্ড বা সংরক্ষিত শব্দ যেমন for, while, break,continue, include ইত্যাদি চলক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
৬। প্রোগ্রামের কোনো স্টেটমেন্ট বা ফাংশন যেমন printf(), scanf() ইত্যাদি নামের চলকের নামকরণ করা যাবে না।
৭। চলকের নামে ছোট হাতের বা বড় হাতের কিংবা উভয় হাতের অক্ষর ব্যবহার করা যাবে।

৯.৭.২ ভ্যারিয়েবল বা চলকের ধরণঃ ডাটা টাইপের উপর ভিত্তি করে বা ডাটার ধরন বা প্রকৃতি অনুসারে সি প্রোগ্রামে তিন ধরনের চলক আছে। যথা–

১। ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল (Integer Variable)
২। ফ্লোটিং পয়েন্ট ভ্যারিয়েবল (Floating Point Variable)
৩। ক্যারেক্টার ভ্যারিয়েবল (Character Variable)

ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল ঃ যে চলকের মান পূর্ণ সংখ্যা হয় তাকে পূর্ণ সংখ্যা চলক বা ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল বলে। এ চলকের মান প্রোগ্রামার দিতে পারে অথবা প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কম্পিউটারও এর মান নির্ধারণ করতে পারে। যেমন-২৩, -৪৫ ৯ ইত্যাদি। এ ধরনের চলকের নামের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য চলকের নামের আগে int ব্যবহার করা হয়। এই int লিখাকে টাইপ ডিক্লারেশন বা ঘোষণা বলা হয়। সংখ্যার ব্যাপ্তি অনুসারে int, short বা long int ব্যবহার করা হয়। পূর্ণ সংখ্যা চলকের উদাহরণ : Int a, int qw23, short id, long salary ইত্যাদি।

ফ্লোটিং পয়েন্ট ভ্যারিয়েবল ঃ যে চলকের মান প্রকৃত সংখ্যায় অর্থাৎ দশমিক যুক্ত সংখ্যায় হয় তাকে প্রকৃত সংখ্যা চলক বা ফ্লোটিং পয়েন্ট ভ্যারিয়েবল বলে। এ ধরনের চলকের মান প্রোগ্রামার দিতে পারে অথবা প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কম্পিউটারও এর মান নির্ধারণ করতে পারে। যেমন- ১০.৫৬৭, ৪.৭৬৫ ইত্যাদি। চলকের নামের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য চলকের নামের আগে float ব্যবহার করা হয়। সংখ্যার ব্যাপ্তি অনুসারে float, double বা long double ব্যবহার করা হয়।

প্রকৃত সংখ্যা চলকের উদাহরণ : float a, double id ইত্যাদি।

ক্যারেকটার ভ্যারিয়েবল ঃ যে চলক শুধু বর্ণ এবং শব্দ দিয়ে গঠিত তাকে বর্ণবাচক চলক বা ক্যারেক্টার ভ্যারিয়েবল বলে। যেমন– নাম, ঠিকানা বা যে কোনো বর্ণের ক্ষেত্রে বর্ণবাচক ভ্যারিয়েবল ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে চলকের নামের আগে char ব্যবহৃত হয়। যেমন– char n, char address, char des ইত্যাদি।

ফাংশন ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ভ্যারিয়েবলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১। লোকাল ভ্যারিয়েবল (Local Variable) এবং
২। গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল (Global Variable)

লোকাল ভ্যারিয়েবল : যে ভ্যারিয়েবল ফাংশনের ভিতরে ঘোষণা করা হয় তাকে লোকাল ভ্যারিয়েবল বলে।
উদাহরণ :

```
main ()
{
int a = 5 ;
---------------
}
```

এখানে a = 5 হলো লোকাল ভ্যারিয়েবল.

২। **গ্লোবাল চলক :** যে চলক main () এর পূর্বে ঘোষণা করা হয় তাকে গ্লোবাল চলক বলে। **উদাহরণ :**

```
int a = 10 ;
main ()
{
-----------------
}
```

এখানে a = 10 হলো গ্লোবাল চলক.

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ধরনের চলক ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার গড় নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যে সকল রাশির মান প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় পরিবর্তন হয় তাদেরকে ভ্যারিয়েবল বা চলক বলা হয়। চলক ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্যই হল প্রোগ্রামিং কাজকে সহজ করা। চলকের নাম ইচ্ছামত দেয়া যায়। তবে সংগতিপূর্ণ নাম ব্যবহার করারই ভাল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ডাটা টাইপের উপর ভিত্তি করে বা ডাটার ধরন বা প্রকৃতি অনুসারে সি প্রোগ্রামে কত ধরনের চলক আছে?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

২। সি চলক ঘোষণায়-

ক. ফাঁকা স্থান রাখা যাবে না খ. প্রথম অক্ষর সংখ্যা বাচক হবে
গ. সংরক্ষিত চলক ব্যবহার করা যাবে ঘ. ছোট ও বড় হাতের বর্ণের অর্থ একই

পাঠ-৯.৮ অপারেটর, অপারেন্ড ও এক্সপ্রেশন এবং ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অপারেটর, অপারেন্ড ও এক্সপ্রেশন কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের অপারেটর সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।
- ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অপারেটর, অপারেন্ড, এক্সপ্রেশন ।

৯.৮.১ অপারেটর, অপারেন্ড ও এক্সপ্রেশন

গাণিতিক বা যৌক্তিক কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের ক্যারেক্টারকে (যেমন ঃ +, -, *, /, <, >, <=, >= ইত্যাদি) বলা হয় অপারেটর (Operator)। আরও সহজভাবে, এক্সপ্রেশন বা রাশিমালা তৈরি করার জন্য যে সমস্ত চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাদেরকে অপারেটর বলে। যেমন a=b+c; এখানে =,+ এই দুটি অপারেটর।

অপারেটর যে সকল ডাটা নিয়ে কাজ করে তাদেরকে অপারেন্ড বলে। যেমন Multi=z*y; এখানে Multi , z, y এই তিনটি অপারেটর।

বিভিন্ন রাশির সমন্বিত প্রক্রিয়াকে এক্সপ্রেশন বা রাশিমালা বলে। অর্থাৎ কতকগুলো অপারেন্ড, অপারেটর, ভ্যারিয়েবল ও কনস্ট্যান্টের সামঞ্জস্যপূর্ণ গাণিতিক উপস্থাপনাকে এক্সপ্রেশন বলে। নিচে কিছু এক্সপ্রেশনের উদাহরণ দেয়া হল-

a=b+c;
Multi=z*y;
res=v+p+m-8 ইত্যাদি।

সি প্রোগ্রামে অপারেটরকে আট ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–

১। গাণিতিক অপারেটর (Arithmetic Operator)
২। যুক্তিমূলক অপারেটর (Logical Operator)
৩। তুলনামূলক অপারেটর (Relational Operator)
৪। অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর (Assignment Operator)
৫। বৃদ্ধি বা হ্রাসকরণ অপারেটর (Increment and Decrement Operator)
৬। শর্তমূলক অপারেটর (Conditional Operator)
৭। বিটওয়াইজ অপারেটর (Bitwise Operator) এবং
৮। বিশেষ অপারেটর (Special Operator)

গাণিতিক অপারেটর

প্রোগ্রামে গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করার জন্য যে অপারেটর ব্যবহৃত হয় তাকে গাণিতিক অপারেটর বলে। নিম্নে বর্ণিত অপারেটরগুলো সি প্রোগ্রামে গাণিতিক অপারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয় :

অপারেটর	যে কাজে ব্যবহৃত হয়	উদাহরণ	ফলাফল
+	যোগ করার জন্য	5.5+8.5	14
-	বিয়োগ করার জন্য	6.3-2.1	4.2

*	গুণ করার জন্য	5*4	20
/	ভাগ করার জন্য	10/3	3.333
%	ভাগশেষ নির্ণয়ের জন্য	10%3	1

যুক্তিমূলক অপারেটর

সাধারণত দুই বা ততোধিক এক্সপ্রেশনের তুলনার ক্ষেত্রে যুক্তিমূলক অপারেটর ব্যবহৃত হয়। সি প্রোগ্রামে সাধারণত ৩ ধরনের যুক্তিমূলক অপারেটর ব্যবহৃত হয়। যথা-

১. Logical AND (&&)
২. Logical OR(||) ও
৩. NOT(!) ইত্যাদি।

এদের মধ্যে NOT(!) অপারেটরটি দুটি এক্সপ্রেশনের তুলনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। এটি শুধুমাত্র একটি এক্সপ্রেশনের ফলাফলকে পরিবর্তন (0 কে 1 এবং 1 কে 0 অর্থাৎ মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা) করতে সাহায্য করে। AND (&&) অপারেটরের ক্ষেত্রে দুটি এক্সপ্রেশনের মানই ১ (সত্য) হলে ফলাফল ১ (সত্য) আসবে এবং OR(||) অপারেটরের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি এক্সপ্রেশনের মান বা উভয়টির মানই ১ (সত্য) হলে ফলাফল ১(সত্য) আসবে। নিচে উদাহরণ দেয়া হলো–

ধরি, দুইটি ভ্যারিয়াবলের মান- p=5, q=10.

অপারেটর	চিহ্ন	উদাহরণ	ফলাফল
AND	&&	(p>1) && (q<11)	1(সত্য)
OR	||	(p>10) || (q<10)	1(সত্য)
NOT	!	!p	0(মিথ্যা)

তুলনামূলক অপারেটর

প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় দুটি চলকের মধ্যে তুলনার ক্ষেত্রে তুলনামূলক অপারেটর ব্যবহৃত হয়। যেমন– 80 বা তার বেশি নম্বর পেলে A+, 70 এর বেশি বা সমান এবং 80 এর কম হলে A ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য তুলনামূলক অপারেটর ব্যবহৃত হয় । সি প্রোগ্রামে সাধারণত 6 ধরনের তুলনামূলক অপারেটর ব্যবহৃত হয়। যথা -

তুলনামূলক অপারেটর	Meaning বা অর্থ	ব্যবহার
= =	Equal to	সমান সমান ব্যবহৃত হয়।
! =	Not equal to	সমান নয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
<	Less than	ছোট বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
>	Greater than	বড় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
<=	Less than or equal	ছোট বা সমান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।
>=	Greater than or equal	বড় বা সমান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর

যখন কোনো রাশিমালার বা কোনো ধ্রুবকের মান কোনো চলকে রাখতে হয় তখন অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর ব্যবহার করা হয়। সাধারণত অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর হিসেবে "=" চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। সচরাচর ব্যবহার হয় এমন কিছু গাণিতিক Expression ও তাদের shorthand assignment operator নিচের ছকে দেয়া হলো :

Statement with simple assignment operator	Statement with shorthand operator
a = a + 1	a + = 1
a = a - 1	a- = 1
a = a* (n+1)	a*=n + 1

a = a/(n+1)	a/=n+1
a = a%b	a% = b

বৃদ্ধি বা হ্রাসকরণ অপারেটর

সি প্রোগ্রামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেটর ব্যবহার করা হয় যা সাধারণত অন্য ভাষায় ব্যবহার করা হয় না। অপারেটর দুটি হচ্ছে Increment and Decrement Operator এবং এদের গঠন নিম্নরূপ-

++ এবং ——

অপারেটর ++ অপারেন্ডের সাথে ১ যোগ করে এবং —— অপারেন্ড হতে ১ বিয়োগ করে। এরা প্রত্যেকেই unary অপারেটর এবং এদের গঠন নিম্নরূপ :

++x ; or x++ যা x = x+1 বা x + = 1 এর সমান।

- - x or x-- যা x- 1বা x- = 1এর সমান।

কোনো চলকের আগে ++ ব্যবহার করলে আগে চলকের মান বৃদ্ধি পাবে এবং পরে চলক অপারেশনে অংশ নিবে। পক্ষান্তরে কোনো চলকের ++ ব্যবহার করলে আগে চলক অপারেশনে অংশ নিবে এবং পরে চলকের মান বৃদ্ধি পাবে।

উদাহরণ :

```
main ()
{
      int x, y;
      y = 10;
      x = ++y;
}
```

এক্ষেত্রে আগে y এর মান এক (১) বৃদ্ধি পাবে। তাহলে y এর মান হলো 11; তারপর x = 11 হবে।

উদাহরণ :

```
main ()
{
      int x, y;
       y = 10;
       x = y++;
}
```

এক্ষেত্রে প্রথমে x = 10 হবে, তারপর y এর মান ১ (এক) বৃদ্ধি পেয়ে 11 হবে।

শর্তমূলক অপারেটর

সি প্রোগ্রামে শর্ত সাপেক্ষে কোন ভ্যারিয়েবল বা এক্সপ্রেশনের মান নির্ধারণ করার জন্য শর্তমূলক অপারেটর ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এক জোড়া অপারেটর "? ঃ" সি প্রোগ্রামে conditional expression গঠন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই অপারেটরের গঠন নিম্নরূপ :

```
exp1 ? exp2 : exp3
```

এখানে exp1, exp2, এবং exp3 হচ্ছে expression।

উদাহরণ ১ :

```
x = 20;
y = 15;
z = (x > y) ? x : y;
```

এখানে, (x > y) যদি সত্য হয় তাহলে z = x, অন্যথায় (x > y) মিথ্যা হলে z = y,
শর্ত অনুযায়ী z এর মান হবে 20

উদাহরণ ২ : Conditional Operator ব্যবহার করে দুইটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটি নির্ণয় করার প্রোগ্রাম :

```
# include <stdio.h>
void main ()
{
      int a, b;
      printf ("Enter the first number : ");
      scanf ("% d", &a);
      printf ("\n Enter the second number :");
```

```
        scanf ("% d", &b);
        printf (" Maximum = % d", (a > b) ? a : b);
}
```

প্রোগ্রামটি রান করার পর ফলাফল হবে নিম্নরূপ :

```
Enter the first number : 60
Enter the second number : 50
Maximum = 60
```

বিটওয়াইজ অপারেটর

সি প্রোগ্রামে বিট লেভেলে ডাটা ব্যবহার করার জন্য বিটওয়াইজ অপারেটর ব্যবহার করা হয়। এই সকল অপারেটর ব্যবহার করা হয় কোনো বিট পরীক্ষা করার জন্য বা কোনো বিট ডানে বা বামে সরানোর জন্য। তবে Float বা Double টাইপের ডেটার ক্ষেত্রে বিটওয়াইজ অপারেটর ব্যবহার করা যায় না। নিচে কিছু বিটওয়াইজ অপারেটর ও তাদের অর্থ দেয়া হলো ঃ

বিটওয়াইজ অপারেটর	অর্থ
&	bitwise AND
|	bitwise OR
^	bitwise exclusive OR
<<	shift left
>>	shift right
~	One's complement

বিশেষ অপারেটর

C প্রোগ্রামে কিছু বিশেষ অপারেটর ব্যবহার করা হয় বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য। যেমন– The comma operator, The size of operator, pointer operator (& and *), member selection operator (. and ->) ইত্যাদি।

- **ফরমেট স্পেসিফিয়ার**

ফরমেট স্পেসিফিয়ার (format specifier) হল এক ধরনের Control String যা নির্দেশ করে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কোন টাইপের ডাটা নেয়া হবে অথবা কোন ধরনের ডাটা আউটপুটে দেয়া হবে। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের ফরমেট স্পেসিফিয়ার এর ব্যবহার দেয়া হলো ঃ

format specifier	use
%d	decimal integer টাইপের ডাটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%f	floating point টাইপের ডাটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%c	সিঙ্গেল character টাইপের ডাটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%o	octal integer টাইপের ডাটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%x	hexadecimal integer টাইপের ডাটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%i	integer, octal বা hexadecimal integer টাইপের ডাটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
%s	string টাইপের ডাটা ইনপুট বা আউটপুট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৯.৮.২ ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট (Input Statement and Output Statement)

সি ভাষাতে অনেক ধরনের লাইব্রেরি ফাংশন আছে। তার মধ্যে অন্যতম হল Standard I/0 লাইব্রেরি ফাংশন যা সকল ধরনের ইনপুট/আউটপুট এর কাজ সম্পন্ন করে। যে সকল স্টেটমেন্টের সাহায্যে সি প্রোগ্রামে ডাটা নেয়া বা ইনপুট করা হয় তাদেরকে বলা হয় ইনপুট স্টেটমেন্ট। যেমন- scanf(), getchar() ইত্যাদি।

আর যে সকল স্টেটমেন্টের সাহায্যে প্রোগ্রামের ফলাফল মনিটরের পর্দায় প্রদর্শন করা হয় তাকে আউটপুট স্টেটমেন্ট বলে। যেমন- printf(), putchar() ইত্যাদি।

- **ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্টের শ্রেণীবিভাগ**

ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্টকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ (১) scanf() ও (২) printf()
এছাড়াও কী বোর্ড হতে কোন ডাটা ইনপুটের জন্য বা মনিটরের পর্দায় কোন ডাটা প্রদর্শনের জন্য আরও দু'ধরনের স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথাঃ (১) getchar() ও (২) putchar()

আবার কিবোর্ড হতে স্ট্রিং জাতীয় ডাটা ইনপুটের জন্য বা মনিটরের পর্দায় প্রদর্শনের জন্য আরও দুই ধরনের স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। যথাঃ (১) gets() ও (২) puts()

scanf() ফাংশন ঃ প্রোগ্রাম চলার সময় ব্যবহারকারীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ডাটা নেয়ার জন্য বহুল ব্যবহৃত ইনপুট স্টেটমেন্ট হল scanf() যার সাহায্যে int, float, char ইত্যাদি টাইপের ডাটা ইনপুট করা যায়। scanf() এর জন্য লাইব্রেরী ফাইল stdio.h প্রোগ্রামে সংযোগ করতে হয়। scanf() এর সাধারণ গঠন হলোঃ

```
scanf("Control String",&variable);
```

অথবা,

```
scanf(" Control String", &variable1, &variable2,....., variable n);
```

এখানে Control String হল ফরমেট স্পেসিফিয়ার যা নির্দেশ করে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কোন টাইপের ডাটা নেয়া হবে। আর &variable নির্দেশ করে address of variable অর্থাৎ ব্যবহারকারী যে ডাটা ইনপুট করবে, তা উক্ত ভ্যারিয়াবলের জন্য নির্ধারিত মেমরি অ্যাড্রেসে সংরক্ষিত হবে। অবশ্য variable1, variable2,....., variable n একই টাইপের ডাটার জন্য হতে পারে অথবা ভিন্ন ভিন্ন টাইপের ডাটার জন্যও হতে পারে।

getchar() ফাংশন ঃ কিবোর্ডের সাহায্যে একটি করে ক্যারেক্টার বা অক্ষর ইনপুট করে তা কম্পিউটারের মেমরিতে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত ফাংশন হল getchar()। আর getchar() ফাংশনের জন্য লাইব্রেরি ফাইল হল ctype.h যা getchar() ফাংশন ব্যবহারের পূর্বে প্রোগ্রামে সংযোজন করতে হয়। getchar() ফাংশনের সাধারণ গঠন (General Syntex) হলোঃ

```
variable-name= getchar();
```

variable-name হল সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত গ্রহণযোগ্য বা সঠিক char type এর variable.

printf() ফাংশন ঃ আউটপুট স্টেটমেন্ট হিসেবে সি ভাষায় বহুল ব্যবহৃত ফাংশন হল printf() যার সাহায্যে স্ট্রিং বা স্ট্রিংসহ বিভিন্ন টাইপের (যেমন int, float, char ইত্যাদি) ডাটার মান মনিটরের স্ক্রিনে প্রদর্শন করা যায়। অর্থাৎ printf() ফাংশনের ভিন্ন ধরণের গঠন লক্ষ্য করা যায়। যথাঃ

(১) শুধুমাত্র স্ট্রিং প্রদর্শন করার জন্য printf() ফাংশনের সাধারণ গঠন (General Syntex) হলঃ

```
printf("String" );
```

এখানে String হিসেবে যেকোন word বা character বা sentence হতে পারে। অর্থাৎ printf() ফাংশন এর প্রথম বন্ধনীর ( ) ভিতর ডবল কোটেশনের মধ্যে যা লেখা হয় printf() ফাংশনটি মনিটরের পর্দায় তাই প্রদর্শন করে।

(২) স্ট্রিংসহ বিভিন্ন টাইপের ডাটার ভেরিয়াবলের মান প্রদর্শন করার জন্য printf() ফাংশনের সাধারণ গঠন (General Syntex) হল ঃ

```
printf("String format specifier", variable );
```

অথবা,

```
printf(" String format specifier", variable 1, variable 2, .....variable n);
```

putchar() ফাংশন ঃ সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত আরেকটি আউটপুট ফাংশন হল putchar() যা at a time একটি ক্যারেক্টার মনিটরের পর্দায় প্রদর্শন করে এবং যার জন্য প্রয়োজনীয় লাইব্রেরি ফাইল হল ctype.h। putchar() ফাংশনের সাধারণ গঠন হলঃ

variable name= putchar();

যেখানে variable name হল সি প্রোগ্রামে ব্যবহৃত গ্রহণযোগ্য একটি ভ্যারিয়েবল যার টাইপ অবশ্যই char হবে।

উদাহরণ : ইনপুট ও আউটপুট স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম:

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main ()
{
        int r;
        float area, pi = 3.142;
        printf("Radius : ");
        scanf ("%d", &r);
        area = pi*r*r;
        printf ("Area = %f", area);
}
```

ফলাফল বা Output:

```
Radius : 3
Area : 28.278
```

শিক্ষার্থীর কাজ	রিলেশনাল অপারেটর ব্যবহার করে একটি সি প্রোগ্রাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কতকগুলো অপারেন্ড, অপারেটর, ভ্যারিয়েবল ও কনস্ট্যান্টের সামঞ্জস্যপূর্ণ গাণিতিক উপস্থাপনাকে এক্সপ্রেশন বলে। আবার এক্সপ্রেশন বা রাশিমালা তৈরি করার জন্য যে সমস্ত চিহ্ন বা প্রতীক ব্যবহার করা হয় তাদেরকে অপারেটর বলা হয়। অপারেটর যে সকল ডাটা নিয়ে কাজ করে তাদেরকে অপারেন্ড বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি লজিক্যাল অ্যান্ড অপারেটর?

ক) && খ) !

গ) & ঘ) !!

২। putchar() কি করে?

ক) মনিটরে একটি করে বর্ণ প্রিন্ট করে খ) মনিটরে অনেক গুলো বর্ণ প্রিন্ট করে

গ) মনিটরে ২টি করে বর্ণ প্রিন্ট করে ঘ) মনিটরে ৩টি করে বর্ণ প্রিন্ট করে

পাঠ-৯.৯ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট বর্ণনা করতে পারবেন ও প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	if স্টেটমেন্ট, if else স্টেটমেন্ট, switch স্টেটমেন্ট ।

৯.৯.১ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট

সাধারণত সি ভাষায় লেখা প্রোগ্রামে স্টেটমেন্টগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে যা একের পর এক সিকোয়েন্স অনুযায়ী নির্বাহ হয়। এক্ষেত্রে স্টেটমেন্টগুলো পুনরাবৃত্তি অনুযায়ী নির্বাহের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু স্টেটমেন্টগুলো পুনরাবৃত্তি অনুযায়ী নির্বাহের প্রয়োজন হলে কিছু শর্তযুক্ত করা হয়। এগুলোকে কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট বলা হয়। স্টেটমেন্ট নির্বাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লেখা হলে প্রোগ্রামের আকার ছোট হয় এবং প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় কম লাগে। সি ভাষায় কন্ট্রোল স্টেটমেন্টকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

১। কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট (Conditional Statements) ও

২। লুপ স্টেটমেন্ট (Loop Statements)

৯.৯.২ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট

সি প্রোগ্রামে শর্তসাপেক্ষে কোন স্টেটমেন্ট সম্পাদনের জন্য কন্ডিশনাল কন্ট্রোল ব্যবহৃত হয়। কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টে ব্যবহৃত শর্ত সত্য হলে প্রোগ্রামে এক ধরনের ফল পাওয়া যায় আর সত্য না হলে অন্য ধরনের ফল পাওয়া যায়। অন্যতম কন্ডিশনাল স্টেটমেন্টসমূহ হলো ঃ

- if স্টেটমেন্ট
- if else স্টেটমেন্ট
- Nested if..else স্টেটমেন্ট
- if else ladder স্টেটমেন্ট
- switch স্টেটমেন্ট

if Statement

সাধারণ কোন সিদ্ধান্তমূলক কাজ করার উপযোগী প্রোগ্রাম তৈরির জন্য if Statement ব্যবহৃত হয়।
এর সাধারণ গঠন (Syntax) হলো-

```
if (test expression)
        {
        statement-block;
        }
statement-x;
```

Statment-block একটি স্টেটমেন্ট হতে পারে আবার একাধিক স্টেটমেন্ট হতে পারে। একটি স্টেটমেন্ট হলে দ্বিতীয় বন্ধনী দেবার প্রয়োজন নেই। যদি test expression সত্য হয় তাহলে statment-block কার্যকরী হবে অন্যথায় এটিকে বাদ দিয়ে statment x কার্যকরী হবে।

উদাহরণ :

```
# include <stdio.h>
void main ()
{
int mark;
printf (''Enter any mark:'');
scanf ('' % d'', &mark);
if (mark > = 90)
printf (''you have A+'');
}
```

ফলাফল বা Output:

```
Enter any mark : 90
You have A+
```

if...else স্টেটমেন্ট

if স্টেটমেন্টের সাথে ''অন্যথায়'' অর্থে else স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়, এর সাধারণ গঠন (syntax) হলো-

```
if (test expression)
        {
        True-Block statement;
        }
else
        {
        False-Block statement;
        }
statements-x;
```

এখানে test expression যদি সত্য হয় তাহলে True-Block statement সম্পাদিত হবে অন্যথায় False-Block statement সম্পাদিত হবে।

উদাহরণ : যে কোন পূর্ণসংখ্যা জোড় অথবা বিজোড় তা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম:

```
<# include <stdio.h>
void main ( )
        {
        int n;
        printf(''Enter any number : '');
        scanf('' % d'', & n);
        if (n% 2 = = 0)
        printf (''Even number'');
        else
        print (''Odd number'');
        }
```

ফলাফল বা Output:

```
Enter any number : 50
Even number
```

Nested if...else স্টেটমেন্ট

যখন সিদ্ধান্ত একাধিক থাকে সেক্ষেত্রে একাধিক if...else ব্যবহৃত হয়। এই একাধিক if...else ব্যবহার করাকেই নেস্টেড if...else বলে। Nested if...else এর সাধারণ গঠন (general form) হলো-

```
if (test condition-1)
        {
        if (test condition-2)
                {
                        statement-1;
                }
        else
                {
                        statement-2;
                }
        }
else
        {
                statement-3;
        }
statement-x;
```

যদি test condition-1 মিথ্যা হয় তাহলে statement-3 সম্পাদিত হবে। আর যদি test condition-1 সত্য হয় তাহলে test condition-2 কে test করা হবে, এটি সত্য হলে statment-1 সম্পাদিত হবে আর যদি এটি মিথ্যা হয় তাহলে statment-2 সম্পাদিত হবে। তারপর control statment-x এ যাবে।

if else ladder স্টেটমেন্ট

যখন অনেকগুলো শর্তের মধ্যে যেকোন একটি শর্ত সত্য হয় সেক্ষেত্রে else if ladder স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : ইনপুটকৃত মার্কের সাহায্যে রেজাল্ট গ্রেড প্রদর্শনের প্রোগ্রাম:

```
# include < stdio.h>
void main ( )
        {
            int mark;
            printf (“Enter mark”,)
            scanf (“% d”, & mark);
            if (mark>=80)
            printf (“result is A+”);
            else if (mark>=70)
            print (“Result is A”);
            else if (mark > = 60)
            printf (“Result is A-”)
            else if (mark > 50)
            printf (“Result is B”);
            else if (mark > = 40)
            printf (“Result is C”);
            else printf (“Result is Fail”);
        }
```

ফলাফল বা Output:

```
Enter mark : 90
Result is A+
```

শিক্ষার্থীর কাজ	Nested if...else স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা বের করার প্রোগ্রাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সি প্রোগ্রাম সাধারণত এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট ও ফাংশনের সমন্বয়ে গঠিত। সাধারণত স্টেটমেন্টগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকে যা একের পর এক সিকোয়েন্স অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে স্টেটমেন্টগুলোর পুনরাবৃত্তি অনুযায়ী সম্পাদনের প্রয়োজন হয় না। যদি স্টেটমেন্টগুলোর পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয় যা নির্ভর করে কোন শর্তের ওপর তাহলে এক ধরনের সিস্টেম বা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় যাকে বলা হয় কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট। if স্টেটমেন্ট, if else স্টেটমেন্ট, switch স্টেটমেন্ট ইত্যাদি হলো কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট। সাধারণত প্রোগ্রামে কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি ভাষায় কন্ট্রোল স্টেটমেন্টকে সাধারণত কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

২। একটি if এর ভেতরে যদি একাধিক if Statement ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলে?

ক.if খ.if- else
গ.switch ঘ.nested if

পাঠ-৯.১০ Switch স্টেটমেন্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- Switch স্টেটমেন্ট কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- Switch স্টেটমেন্ট দিয়ে নমুনা প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	Switch স্টেটমেন্ট।

৯.১০.১ Switch স্টেটমেন্ট

এই স্টেটমেন্টের সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট চলক বা এক্সপ্রেশনের ওপর ভিত্তি করে একাধিক কাজ নির্বাহ করা হয়। যখন অনেকগুলো if-else থাকে তখন if-else স্টেটমেন্ট ব্যবহার করার চেয়ে switch স্টেটমেন্ট ব্যবহার করাই উত্তম। অনেক বিকল্পের ক্ষেত্রে if স্টেটমেন্ট ব্যবহার করলে প্রোগ্রাম অনেক জটিল হয়ে যায়। মূল প্রোগ্রাম ছাড়া প্রোগ্রাম সম্পাদনা করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। এই সমস্ত জটিলতা পরিহার করার জন্য switch স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

switch স্টেটমেন্ট এর সাধারণ গঠন (Syntax) হলো-

```
switch (n)
{
   case constant 1:
      // code to be executed if n is equal to constant1;
      break;
   case constant 2:
      // code to be executed if n is equal to constant2;
      break;
      .
      .
   default:
      // code to be executed if n doesn't match any constant
}
```

switch স্টেটমেন্টে ৪ টি কী-ওয়ার্ড থাকে। যথা-

i) switch
ii) case
iii) break
iv) default

switch- switch স্টেটমেন্টের মাধ্যমে কম্পাইলারকে নির্দেশ দেয়া হয় কোন জায়গা থেকে switch স্টেটমেন্ট এর কাজ শুরু করতে হবে।

case- switch কে যদি if এর সাথে তুলনা করতে হয় তবে case কে else if এর সাথে তুলনা করা যায়। n এর যে মানের সাথে যে case এর constant ভ্যালুর সাথে মিলে যাবে তার স্টেটমেন্টগুলো ফলাফলে দেখাবে।

break-case এর সাথে যে সকল স্টেটমেন্ট থাকে সেগুলো এক্সিকিউট হওয়ার পর break কী-ওয়ার্ড পেলে কম্পাইলার **switch** থেকে বের হয়।

default- switch এর ভিতর কোন case এর সাথে শর্ত না মিললে default এর ভিতরের স্টেটমেন্টগুলো ফলাফল দেখাবে ।

উদাহরণ : switch স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কোন একটি অক্ষর বা লেটার vowel না consonant তা নির্ণয়ের প্রোগ্রাম।

```
#include<stdio.h>
void main()
{
char ch;
printf("\n Enter any letter :");
ch=getchar();
        switch(ch)
                {
                        case 'a': printf("\n The letter is a vowel."); break;
                        case 'A': printf("\n The letter is a vowel."); break;
                        case 'e': printf("\n The letter is a vowel."); break;
                        case 'E': printf("\n The letter is a vowel."); break;
                        case 'i': printf("\n The letter is a vowel."); break;
                        case 'I': printf("\n The letter is a vowel."); break;
                        case 'o': printf("\n The letter is a vowel."); break;
                        case 'O': printf("\n The letter is a vowel."); break;
                        case 'u': printf("\n The letter is a vowel."); break;
                        case 'U': printf("\n The letter is a vowel."); break;
        default:
        printf("\n The letter is a consonant.");
          }
}
```

প্রোগ্রামটি রান করলে নিম্নোক্ত নমুনা ফলাফল পাওয়া যাবে-

```
Enter any letter: U
The letter is a vowel.
```

শিক্ষার্থীর কাজ	if- else স্টেটমেন্টের চেয়ে switch statement ব্যবহারের সুবিধা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

কন্ট্রোল স্টেটমেন্টসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি স্টেটমেন্ট হলো switch স্টেটমেন্ট। এই স্টেটমেন্টের সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট চলক বা এক্সপ্রেশনের ওপর ভিত্তি করে একাধিক কাজ নির্বাহ করা হয়। যখন অনেকগুলো if-else থাকে তখন if-else স্টেটমেন্ট ব্যবহার করার চেয়ে switch স্টেটমেন্ট ব্যবহার করাই উত্তম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অনেকগুলো স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে if-else স্টেটমেন্টের পরিবর্তে কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা উত্তম?

ক) switch খ) if
গ) continue ঘ) for

২। switch এর অংশ কয়টি?

ক) 1 খ) 2
গ) 3 ঘ) 4

পাঠ-৯.১১ Loop স্টেটমেন্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- Loop (লুপ) কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সি প্রোগ্রামিং ভাষার বিভিন্ন ধরনের Loop দিয়ে নমুনা প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	Loop, for লুপ স্টেটমেন্ট, while লুপ স্টেটমেন্ট, do-while লুপ স্টেটমেন্ট।

৯.১০.১ Loop (লুপ) স্টেটমেন্ট

সাধারণত কোন স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিকবার সম্পাদিত করার জন্য লুপ স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় কোন একটি কাজ একাধিকবার করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে স্টেটমেন্টসমূহ বার বার না লিখে Loop (লুপ) স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। সি ভাষায় ব্যবহৃত লুপ স্টেটমেন্টগুলো হলো-

- for লুপ স্টেটমেন্ট
- while লুপ স্টেটমেন্ট
- do...while লুপ স্টেটমেন্ট

for লুপ স্টেটমেন্ট

প্রোগ্রামে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট অনেকবার সম্পাদনের জন্য for লুপ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। সাধারণত কোন একটি ভ্যারিয়েবল দিয়ে এ লুপের আবর্তন সংখ্যা গণনা করা হয়। এই ভ্যারিয়েবলকে লুপ কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল বা কন্ট্রোল চলক বলে। for স্টেটমেন্ট এর সাধারণ গঠন নিম্নরূপ ঃ

```
for (initialization; test-condition; increment/decrement)
{
body of loop
}
```

for loop প্রথমে এর initialize অংশ নিয়ে কাজ করে। এই অংশে কন্ট্রোল চলকের জন্য একটা প্রাথমিক মান নির্ধারণ করা হয়। এরপর test-condition অংশ কাজ করে। test-condition সত্য হলে body of the loop সম্পাদিত হয়। তারপর increment/decrement অংশ কাজ করে। এই অংশে কন্ট্রোল চলকের মান বৃদ্ধি করা হয়। test-condition মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত body of the loop সম্পাদিত হতে থাকে।

উদাহরণ : 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যা যোগ করার প্রোগ্রাম অথবা (1 + 2+ 3 + 4 + - - - - - -+ 100 ধারার যোগফল) নির্ণয় করার প্রোগ্রাম :

```
# include < stdio.h>
  void main ( )
      {
          int i, sum = 0;
          for  (i = 1; i < = 100; i + + )
                sum = sum + i;
          printf (“The sum is % d”, sum);
      }
```

ফলাফল বা Output:

```
The sum is: 5050
```

while লুপ স্টেটমেন্ট

লুপ স্টেটমেন্টের মধ্যে সবচেয়ে সরলতম লুপ হলো while লুপ স্টেটমেন্ট। while লুপের পরে লিখিত শর্ত (condition) যতক্ষণ সত্য থাকে ততক্ষণ while লুপের বডি সম্পাদিত হতে থাকবে। আর শর্ত মিথ্যা হলেই লুপ শেষ হয়ে যাবে।

উদাহরণ : 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যা যোগ করার প্রোগ্রাম:

```
# include <stdio.h>
  void main ( )
      {
          int i, sum = 0;
          i = 1;
          while (i < = 100)
          {
              sum + = i;
              i + + ;
      }
      printf ("The sum is:  % d ", sum);
  }
```

ফলাফল বা Output:

```
The sum is : 5050
```

do-while লুপ স্টেটমেন্ট

while loop স্টেটমেন্ট এ প্রথমে শর্ত যাচাই করা হয়। তারপর যদি শর্ত সত্য হয় তাহলে লুপের বডি সম্পাদিত হয়। অনেক সময় আগে লুপের মধ্যে কাজ করে তারপর শর্ত যাচাই করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে do-while লুপ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়। do-while লুপ স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে প্রথমে লুপের কাজ করবে তারপর শর্ত যাচাই করবে। শর্ত পূরণ করলে পুনরায় লুপের কাজ করবে। প্রতিবার কাজ শেষে শর্ত যাচাই করবে। শর্ত মিথ্যা হলে কন্ট্রোল loop থেকে বের হয়ে যাবে। do-while লুপ স্টেটমেন্টের সাধারণ গঠন (general form) নিম্নরূপ :

```
do
{
    body of loop
}
while (test-condition);
```

উদাহরণ : 1 থেকে 10 এর মধ্যে জোড় সংখ্যা বের করা :

```
# include < stdio.h>
void main ( )
    {
        int i = 0;
        do
        {
            i + = 2;
            printf(" % d", i);
        }
        while (i < = 10);
    }
```

ফলাফল বা Output:

```
2    4    6    8    10
```

শিক্ষার্থীর কাজ	আলাদা আলাদাভাবে তিনটি লুপ ব্যবহার করে 1 থেকে 100 পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যাগুলো বের করার প্রোগ্রাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

শর্ত সাপেক্ষে এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট বার বার সম্পাদিত করার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় লুপ স্টেটমেন্ট। অনেক সময় কোন একটি কাজ একাধিকবার করার প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে স্টেটমেন্টসমূহ বার বার না লিখে Loop (লুপ) স্টেটমেন্ট ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি ভাষায় লুপ স্টেটমেন্টকে সাধারণত কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৬

২। কোন স্টেটমেন্ট দুই বা ততোধিকবার সম্পাদিত করার জন্য কোন লুপ স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়?

ক) for খ) while
গ) do-while ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৯.১২ Break স্টেটমেন্ট ও Continue স্টেটমেন্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- Break স্টেটমেন্ট ও Continue স্টেটমেন্ট কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- Break স্টেটমেন্ট ও Continue স্টেটমেন্ট দিয়ে নমুনা প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	Break, Continue স্টেটমেন্ট।

৯.১২.১ Break স্টেটমেন্ট

অনেক সময় কোন কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে লুপ হতে বের হতে হয়। এক্ষেত্রে Break স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে হয়। কন্ডিশন সত্য হয়ে গেলে লুপের কাজ শেষ হয়ে যায়।

উদাহরণ : Break স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে 10 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্য থেকে 10 থেকে 15 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বের করার প্রোগ্রাম।

```
#include <stdio.h>
 void main ( )
{
  int a = 10;
  while( a < 100 )
  {
    printf("%4d", a);
    a++;
    if( a > 15)  break;
  }
  }
```

ফলাফল বা Output:

10	11	12	13	14	15

৯.১২.২ continue স্টেটমেন্ট

Continue স্টেটমেন্ট শর্ত সাপেক্ষে অথবা শর্তহীন ভাবে কোন স্টেটমেন্ট বা লুপের কাজ পুনরাবৃত্তি করে। Continue স্টেটমেন্ট প্রোগ্রাম পয়েন্টারকে পূর্ববর্তী স্টেটমেন্ট বা লুপের প্রারম্ভে নিয়ে যায়।

উদাহরণ : 10 থেকে 20 এর মধ্যে সকল সংখ্যা (১৫ ব্যতীত) বের করার প্রোগ্রাম:

```
#include <stdio.h>
 int main ( )
{
 int a = 10;
 do {
     if( a = = 15)
      {
        a = a + 1; continue;
```

```
        }
        printf("%4d", a);
        a++;
      }while( a <= 20 );
    }
```

ফলাফল বা Output:

10	11	12	13	14	16	17	18	19	20

উপরের উদাহরণে while (a <= 20) স্টেটমেন্টের মাধ্যমে ১০ থেকে ২০ পর্যন্ত সকল সংখ্যা প্রিন্ট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু while লুপের ভিতরে continue স্টেটমেন্টের মাধ্যমে বলা হয়েছে যদি a ভ্যারিয়েবলের মান ১৫ হলে লুপের পরবর্তী কাজ না করে লুপের শুরুতে গিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। ফলে প্রোগ্রাম ১৫ কে প্রিন্ট না করে a ভ্যারিয়েবলের মান ১৬ করে লুপের পুনরাবৃত্তি করে এবং ১৬ হতে ২০ পর্যন্ত a ভ্যারিয়েবলের মান প্রিন্ট করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	break স্টেটমেন্ট ও continue স্টেটমেন্টের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

for, while, do-while লুপগুলো শর্ত মিথ্যা না হওয়া পর্যন্ত তাদের লুপ বডিতে অন্তর্ভুক্ত এক বা একাধিক স্টেটমেন্ট সম্পাদিত করে। তবে শর্ত মিথ্যা হওয়ার আগেই ঐসব লুপগুলোর লুপ বডি থেকে বের হওয়ার জন্য break statement ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে continue statement লুপের সমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং এরপরের স্টেটমেন্ট বা স্টেটমেন্ট গুলোকে সম্পাদিত না করে পুনরায় লুপের পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শর্ত সাপেক্ষে অথবা শর্তহীন ভাবে কোন স্টেটমেন্ট বা লুপের কাজ পুনরাবৃত্তি করে?

ক) continue খ) break
গ) Switch ঘ) if

২। অনেক সময় কোন কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে লুপ হতে বের হতে হয়। এক্ষেত্রে কোন স্টেটমেন্ট ব্যবহৃত হয়?

ক) for খ) break
গ) do-while ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৯.১৩ Array (অ্যারে)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অ্যারে কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একমাত্রিক ও দ্বিমাত্রিক অ্যারে দিয়ে নমুনা প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অ্যারে, একমাত্রিক অ্যারে, দ্বিমাত্রিক অ্যারে।

৯.১৩.১ Array (অ্যারে)

অ্যারে হলো এমন এক ধরনের ভ্যারিয়েবল যা একই কাজে ব্যবহৃত একই ডাটা টাইপের একাধিক ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় প্রোগ্রামে একই ধরনের অনেক ডাটা নিয়ে নিয়ে কাজ করতে হয়। কিন্তু একই ধরনের অনেক ডাটার প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করা মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। এ সকল কাজে অ্যারে ব্যবহার করা হলে একটি অ্যারে ভ্যারিয়েবলে অনেক ডাটা রাখা যায় ও প্রসেস করা যায়। অ্যারে ঘোষণা করার সাধারণ নিয়ম হলো ঃ

```
data-type array-name [array-size];
```

উদাহরণ :

```
int num [10]; // num নামক ভ্যারিয়েবলে ১০ টি মান রাখতে পারি//
float add [20];
clear name [30];
```

৯.১৩.১ অ্যারের প্রকারভেদ

একটি অ্যারের ডাইমেনশন এক বা একাধিক হতে পারে। মাত্রা বা ডাইমেনশনের ওপর ভিত্তি করে অ্যারে নিম্নোক্ত দু' ধরনের হতে পারে। যথা-

১. একমাত্রিক অ্যারে (One dimensional array) ও

২. দ্বিমাত্রিক অ্যারে (Two dimensional array)

একমাত্রিক অ্যারে

যদি কোন অ্যারের ডাটাগুলো শুধুমাত্র একটি একক সারি বা কলাম আকারে উপস্থাপিত থাকে এবং একটি মাত্র সাবস্ক্রিপ্ট দ্বারা প্রকাশিত হয় তবে সেই অ্যারেকে একমাত্রিক অ্যারে বলা হয়। সি ল্যাংগুয়েজ একমাত্রিক অ্যারে তৈরির নিয়ম হলো-

```
data-type array-name [array-size]
```

যেমন, int roll [4]; এটি একটি একমাত্রিক অ্যারে। এখানে int হলো ডাটা টাইপ, roll হলো ভেরিয়েবলের নাম, এবং [4] হলো সাইজ। এই অ্যারের মধ্যে পাঁচটি উপাদান (০-৪) রাখা যাবে। এই ৫ টা মান roll [0], roll [1], roll [2], roll [3], roll [4] এই পাঁচটি ঘরে থাকে। এক্ষেত্রে ০-৪ সংখ্যাগুলোকে ইনডেক্স (index) বলে। কোন একটি মান পেতে হলে তার ইনডেক্স ব্যবহার করতে হয়। যেমন roll [2] অ্যারে তিন নম্বর ঘরের মান দেখাবে।

দ্বিমাত্রিক অ্যারে

যদি কোন অ্যারের ডাটাগুলো একক সারি এবং কলাম আকারে উপস্থাপিত থাকে এবং দুইটি সাবস্ক্রিপ্ট দ্বারা প্রকাশিত হয় তবে সেই অ্যারেকে দ্বিমাত্রিক অ্যারে বলা হয়। যেমন-

```
int marks [2] [3];
```

সি ভাষায় দ্বিমাত্রিক অ্যারে ঘোষণার সাধারণ নিয়ম হলো-

Data Type Array Name [RowSize] [ColumnSize];

যেমন- int num [3] [3];

উদাহরণ : কিবোর্ড থেকে কতগুলো সংখ্যা ইনপুট নেয়া এবং তাদের যোগফল প্রদর্শন করার প্রোগ্রাম:

```
# include < stdio.h>
void main ( )
    {
        int i n, a[20], sum = 0;
        printf ("How many numbers:")
        scanf (" % d", &n);
        printf (" Enter the % d numbers:", n)
        for (i = 0; i <n; i++)
            scanf ("% d ", &n[i]);
        for (i = 0; i < n; i ++)
        sum = sum + a [i] ;
        printf ("Sum = % d", sum);
}
```

ফলাফল বা Output :

```
How many numbers : 5
Enter the 5 numbers : 20 20 30 40 50
sum = 160
```

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রথম ১০টি জোড় সংখ্যার যোগফল প্রদর্শনের জন্য অ্যারে ব্যবহার করে একটি প্রোগ্রাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

অ্যারে হলো বহুল বাবহৃত এক ধরনের ডাটা স্ট্রাকচার। এটি এক ধরনের ডাটা স্ট্রাকচার যাতে একই ধরনের ডাটা সংরক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ একটি চলকের মাধ্যমে মেমরিতে একই টাইপের ডাটা সংরক্ষণের পদ্ধতিই হলো অ্যারে। এই ডাটা টাইপ ইন্টিজার, ক্যারেকটার বা ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বারের যে কোন একটি হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। অ্যারে ঘোষণা করার সাধারণ নিয়ম কোনটি?

ক) data-type array-name [array-size] খ) array-name data-type [array-size]
গ) array-name [array-size] ঘ) কোনটাই নয়

২। সঠিক অ্যারে ঘোষণা কোনটি?

ক) int a [20] খ) int f [20]
গ) int ax [20] ঘ) সবগুলোই

পাঠ-৯.১৪ Function (ফাংশন)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- Function (ফাংশন) কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লাইব্রেরি ফাংশন ও ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একটি ফাংশনের বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফাংশন দিয়ে নমুনা প্রোগ্রাম রচনা করতে পারবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ফাংশন, লাইব্রেরি ফাংশন ও ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন।

৯.১৪.১ Function (ফাংশন)

ফাংশন হলো ব্লক অব কোড (block of code) যা নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে। ফাংশন চেনার সহজ উপায় হলো ফাংশনের নামের শেষে এক জোড়া প্রথম বন্ধনী ( ) থাকে। সি প্রোগ্রামে ফাংশনকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

১। লাইব্রেরি ফাংশন (Library Function) ও

২। ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরিকৃত ফাংশন (User Defined Function)

লাইব্রেরি ফাংশন

যে সকল ফাংশন বিশেষ কিছু কার্য সম্পাদনের জন্য সি ভাষায় বিল্ট-ইন আছে তাকে লাইব্রেরি ফাংশন (Library Function) বলে। লাইব্রেরি ফাংশনগুলোর ঘোষণা তাদের হেডার (.h) ফাইলে এবং বিস্তারিত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি (.Lib) ফাইলে দেয়া থাকে। এজন্য সি প্রোগ্রামে কোন লাইব্রেরি ফাংশন ব্যবহার করলে প্রোগ্রামের শুরুতেই #include ডিরেক্টিভ স্টেটমেন্টের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট হেডার ফাইল সংযুক্ত হয়ে থাকে। প্রোগ্রামে কোন হেডার ফাইল সংযুক্ত করা হলে কম্পাইলার প্রোগ্রাম কম্পাইল করার সময় সংযুক্ত ফাইলের উপাদানগুলো সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি ফাইল থেকে কপি করে। যেমন- sqrt() ফাংশনটি কোন ধনাত্মক সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করে।

ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরিকৃত ফাংশন

সি ভাষায় অনেক বিল্ট-ইন/লাইব্রেরি ফাংশন থাকা সত্ত্বেও প্রোগ্রাম রচনার সময় প্রয়োজন অনুযায়ী সব রকম ফাংশন পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে প্রোগ্রামার তার নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী যে সকল ফাংশন তৈরি করে প্রোগ্রাম তথা main() ফাংশনে ব্যবহার করেন সেগুলোকে ইউজার-ডিফাইন্ড (User defined) বা ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরিকৃত ফাংশন বলা হয়।

৯.১৪.৩ ফাংশনের উপাদান

সি প্রোগ্রামে কোনো লাইব্রেরি কিংবা ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ব্যবহার করতে গেলে সাধারণত নিম্নলিখিত চারটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে :

- ফাংশন বর্ণনা (Function Definition)
- ফাংশন কল (Function Call)
- ফাংশন প্রোটোটাইপ (Function Prototype)
- ফাংশন রিটার্ণ টাইপ ও রিটার্ণ স্টেটমেন্ট (Function's Return Type and Return Statement)।

এগুলোকে ফাংশনের উপাদান বা অংশ বলা হয়।

৯.১৪.৪ ফাংশন বর্ণনা

ফাংশন বর্ণনার মাধ্যমে কম্পাইলারকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, কাজ কি হবে এবং এবং কিভাবে করবে। একটি ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশন কতগুলো স্টেটমেন্ট নিয়ে গঠিত হয়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া ফাংশনের প্রতিটি স্টেটমেন্ট সেমিকোলন দ্বারা শেষ হয়। ইউজার-ডিফাইন্ড ফাংশনের বর্ণনা তার ব্যবহারকারী বা main () ফাংশনের উপরে কিংবা নিচে থাকে কিন্তু ভেতরে নয়। ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ঘোষণার নিয়ম হলো :

```
Return Type Function Name (Argument List)
// Function Body
// Retun Statment (Depends on ReturnType)
}
```

এখানে Return Type যে কোন বৈধ ডাটা টাইপ, Function Name ব্যবহারকারী কর্তৃক দেয়া ফাংশনের নাম এবং ArgumentList ফাংশনে ব্যবহৃত আরগুমেন্টের তালিকা। FunctionBody তে ফাংশনের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে। Function Body- কেমন হবে তা ফাংশনের ধরন অর্থাৎ সমস্যার উপর নির্ভর করে। উল্লেখ্য ফাংশনের প্রথম বন্ধনির মধ্যে কোন ভ্যারিয়েবল ঘোষণা করা হলে তাকে আরগুমেন্ট ভ্যারিয়েবল বলা হয়।

৯.১৪.৫ ফাংশন কল

যখন একটি ফাংশন অপর কোন ফাংশনকে ব্যবহার করে, তাকে ব্যবহাকারী বা মূল ফাংশন এবং যে ফাংশনটি ব্যবহার করা হয় তাকে ব্যবহৃত বা কল্ড ফাংশন বলা হয়। আর এই প্রক্রিয়ার নাম ফাংশন কল। নিচের উদাহরণে main ( ) ফাংশন হতে add (); স্টেটমেন্টের দ্বারা add () কে কল করা হয়েছে।

```
int add ( )
{
//.....
return 0;
}
void main ( )
{
//.....
add (); // Function call
}
```

উদাহরণ ঃ একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ইউজার ডিফাইন ফাংশনের সাহায্যে তৈার করে মেইন ফাংশনে রিটার্ন করবে এমন একটি সি প্রোগ্রাম তৈরিকরণ:

```
/* A simple program for return value of function*/
#include<stdio.h>
int rectangle(int x, int y);
int a,b;
void main()
{
int area;
printf("\n Enter integer value for height: ");
scanf("%d",&a);
printf("\n Enter integer value for base :" );
scanf("%d",&b);
area=rectangle(a,b);
```

argument

Function Prototype

Function Call

```
printf("\n Area of a ractangle is :%d ",area);
}
int rectangle(int x, int y)
{
int area1;
area1=x*y;
return (area1);
}
```

প্রোগ্রামটি রান করলে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যাবেঃ

Enter integer value for height:10
Enter integer value for base :15
Area of a ractangle is : 150

শিক্ষার্থীর কাজ	তিনটি সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যা বের করার জন্য একটি ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ব্যবহার করে প্রোগ্রাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সি ভাষার একটি অন্যতম সুবিধা হলো ফাংশনের ব্যবহার। সাধারণত main() ফাংশনের ভিতরে কতকগুলো স্টেটমেন্ট, ফাংশন, গাণিতিক এক্সপ্রেশন ইত্যাদির সমন্বয়ে সি প্রোগ্রাম তৈরী হয়। নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য কতকগুলো স্টেটমেন্টের সমষ্টিই হল ফাংশন (Function) যা main প্রোগ্রাম এর ভিতরে বা বাইরে অবস্থান করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি প্রোগ্রামের ফাংশন কত ধরনের?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৩ ঘ) ৪

২। ফাংশনের উপাদান বা অংশ কয়টি?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

পাঠ-৯.১৫ ব্যবহারিক (Practical)

ব্যবহারিক ১ ঃ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার প্রোগ্রাম ।

তত্ত্ব ঃ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য scanf() ব্যবহার কীবোর্ড হতে প্রথমে ত্রিভুজের ভূমি এবং ত্রিভুজের উচচতা গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর ক্ষেত্রফল = ১/২ × ভূমি × উচচতা সূত্র ব্যবহার করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্বাচন বা সিলেক্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার এবং প্রোগ্রামিং ভাষাও নির্বাচন করতে হয়।

হার্ডওয়্যার ঃ একটি কম্পিউটার।
সফটওয়্যার ঃ অপারেটিং সিস্টেম : উইন্ডোজ XP বা উইন্ডোজ 7 ।
প্রোগ্রামিং ভাষা ঃ Borland Turbo C++ বা Turbo C++ বা TCWIN

উপরিউক্ত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

১. Computer এর Power Connection ভাল ভাবে Check করে CPU এর Power ON করতে হবে।
২. Microsoft Windows এর ডেস্কটপ চলে আসবে।
৩. সি প্রোগ্রামিং ভাষাটির যে কোন কম্পাইলার (Borland Turbo C++ বা Turbo C++ বা TCWIN) ইনস্টল আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
৪. বর্ণিত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য ইনস্টলকৃত সি কম্পাইলার এর এডিটরটি চালু করতে হবে।
৫. পরীক্ষণটির কার্যক্রম সম্পন্ন হলে চালুকৃত প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামসমূহ বন্ধ করতে হবে এবং যথানিয়মে কম্পিউটারটি বন্ধ বা শাট ডাউন করতে হবে। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন করতে হবে।

ফলাফল উপস্থাপন ঃ

(১) প্রক্রিয়া অনুসরণ ঃ

পরীক্ষণটির কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে -

১. ডেস্কটপে অবস্থিত সি কম্পাইলার এর এডিটরটিতে ডবল ক্লিক করে চালু করতে হবে। অথবা প্রয়োজনীয় লোকেশন থেকে সি কম্পাইলার এর এডিটরটি চালু করতে হবে।
২. File মেনু থেকে New নির্বাচন করতে হবে।
৩. অতঃপর নিম্নলিখিত প্রোগ্রাম কোডসমূহ লিখতে হবে -

```
/* A program to calculate the area of a triangle. */
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
float base, height, area;
printf("\n Enter base of the triangle (in cm)= ");
scanf("%f", &base);
printf("\n Enter height of the triangle (in cm)= ");
scanf("%f", &height);
area= (base*height)/2;
printf("\n Area of the triangle is = %.2f square cm", area);
```

```
getch();
}
```

৪. কোডিং শেষে File মেনুর Save অপশনে ক্লিক করতে হবে । Save as ডায়লগ বক্স আসবে। File Name এর জায়গায় যে কোন একটি নাম লিখে Save/Ok তে ক্লিক করলে উক্ত নামে ফাইলটি সংরক্ষিত হবে। যা মূলত C: \TC বা Turbo C \ BIN লোকেশনে সংরক্ষিত হবে।

(২) ব্যাখ্যা ঃ

১. প্রোগ্রামটিতে ইনপুট গ্রহণ করার জন্য লাইব্রেরি ফাংশন scanf()ব্যবহৃত হয়েছে। যার হেডার ফাইল হল stdio.h ।

২. ফলাফল প্রর্দশন করার জন্য লাইব্রেরি ফাংশন printf() ব্যবহৃত হয়েছে। যার হেডার ফাইল হলো stdio.h ।

৩. clrscr() ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়েছে আউটপুট পরিস্কার করার জন্য। যার হেডার ফাইল হলো conio.h ।

৪. getch() ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়েছে আউটপুট ধরে রাখার জন্য। যার হেডার ফাইল হলো conio.h ।

৫. প্রোগ্রামটিতে ব্যবহৃত সকল ভ্যারিয়েবলই হলো floting point বা দশমিকযুক্ত। তাই format specifier হিসেবে %f ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. গাণিতিক ক্যালকুলেশনের ফলাফল দশমিকের পর দুই ঘর নেওয়ার জন্য %.2f ব্যবহার করা হয়েছে।

(৩) ফলাফল ঃ পূর্বের তৈরিকৃত প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট লোকেশন হতে ওপেন করে অথবা প্রোগ্রাম কোডিং শেষ করার পর প্রোগ্রাম কম্পাইল (Alt +F9 বা Compile মেনু থেকে Compile কমান্ড) করে প্রোগ্রাম রান বা নির্বাহ করার জন্য Run মেনু থেকে Run কমান্ড নির্বাচন করলে প্রোগ্রামটি রান হবে অথবা Ctrl+F9 কী দুইটি একত্রে চাপ দিলেও প্রোগ্রাম রান হবে এবং নিম্নোক্ত ফলাফল প্রদর্শন করবে-

```
Enter base of the triangle (in cm)  =10
Enter height of the triangle (in cm) =5
Area of the triangle is = 25.00 square cm
```

ব্যবহারিক ২ ঃ $1^2+2^2+3^2+.....+n^2$ সিরিজটির মান নির্ণয়ের প্রোগ্রাম। n এর মান কীবোর্ড থেকে গ্রহণ করতে হবে।
তত্ত্ব ঃ এরূপ ধারার যোগফল নির্ণয়ের জন্য শূন্য মানবিশিষ্ট একটি প্রারম্ভিক সংখ্যার সাথে ১, ২, ৩ এভাবে ক্রমিক সংখ্যাগুলোর বর্গের যোগফল নির্ণয় করতে হবে এবং প্রতিবার আবর্তনের সময় লুপ কাউন্টারের মান ১ করে বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য একটি উপযুক্ত লুপ স্টেটমেন্ট ব্যবহার করতে হবে।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্বাচন বা সিলেক্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যার এবং প্রোগ্রামিং ভাষাও নির্বাচন করতে হয়।

হার্ডওয়্যার ঃ একটি কম্পিউটার।
সফটওয়্যার ঃ অপারেটিং সিস্টেম : উইন্ডোজ XP বা উইন্ডোজ 7 ।
প্রোগ্রামিং ভাষা ঃ Borland Turbo C++ বা Turbo C++ বা TCWIN

উপরিউক্ত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

১. Computer এর Power Connection ভাল ভাবে Check করে CPU এর Power ON করতে হবে।

২. Microsoft Windows এর ডেস্কটপ চলে আসবে।

৩. সি প্রোগ্রামিং ভাষাটির যে কোন কম্পাইলার (Borland Turbo C++ বা Turbo C++ বা TCWIN) ইনস্টল আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।

৪. বর্ণিত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য ইনস্টলকৃত সি কম্পাইলার এর এডিটরটি চালু করতে হবে।

৫. পরীক্ষণটির কার্যক্রম সম্পন্ন হলে চালুকৃত প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামসমূহ বন্ধ করতে হবে এবং যথানিয়মে কম্পিউটারটি বন্ধ বা শাট ডাউন করতে হবে। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন করতে হবে।

ফলাফল উপস্থাপন ঃ

(১) প্রক্রিয়া অনুসরণ ঃ

পরীক্ষণটির কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে -

১. ডেস্কটপে অবস্থিত সি কম্পাইলার এর এডিটরটিতে ডবল ক্লিক করে চালু করতে হবে। অথবা প্রয়োজনীয় লোকেশন থেকে সি কম্পাইলার এর এডিটরটি চালু করতে হবে।

২. File মেনু থেকে New নির্বাচন করতে হবে।

৩. অতঃপর নিম্নলিখিত প্রোগ্রাম কোডসমূহ লিখতে হবে -

/* A program to calculate summation of the series $1^2+2^2+3^2+.....+n^2$.*/

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
        {
        clrscr();
        int I=1,Sum=0, N;
        printf("\n Enter last number of the series= ");
        scanf("%d",&N);
            while( I <= N)
            {
            Sum = Sum + I* I;
            I = I+1;
            }
        printf("\n Summation=%d",Sum);
        getch();
        }
```

৪. কোডিং শেষে File মেনুর Save অপশনে ক্লিক করতে হবে । Save as ডায়লগ বক্স আসবে। File Name এর জায়গায় যে কোন একটি নাম লিখে Save/Ok তে ক্লিক করলে উক্ত নামে ফাইলটি সংরক্ষিত হবে। যা মূলত C: \TC বা Turbo C \ BIN লোকেশনে সংরক্ষিত হবে।

(২) ব্যাখ্যা ঃ

১. প্রোগ্রামটিতে ইনপুট গ্রহণ করার জন্য লাইব্রেরি ফাংশন scanf()ব্যবহৃত হয়েছে। যার হেডার ফাইল হল stdio.h ।

২. ফলাফল প্রর্দশন করার জন্য লাইব্রেরি ফাংশন printf() ব্যবহৃত হয়েছে। যার হেডার ফাইল হলো stdio.h ।

৩. clrscr() ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়েছে আউটপুট পরিস্কার করার জন্য। যার হেডার ফাইল হলো conio.h ।

৪. getch() ফাংশনটি ব্যবহৃত হয়েছে আউটপুট ধরে রাখার জন্য। যার হেডার ফাইল হলো conio.h ।

৫. প্রোগ্রামটিতে ব্যবহৃত সকল ভ্যারিয়েবলই হলো integer বা পূর্ণসংখ্যার। তাই format specifier হিসেবে %d ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. প্রোগ্রামটিতে কাঙ্খিত ফলাফলের জন্য While লুপ ব্যবহার করা হয়েছে।

(৩) ফলাফল ঃ পূর্বের তৈরিকৃত প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট লোকেশন হতে ওপেন করে অথবা প্রোগ্রাম কোডিং শেষ করার পর প্রোগ্রাম কম্পাইল (Alt +F9 বা Compile মেনু থেকে Compile কমান্ড) করে প্রোগ্রাম রান বা নির্বাহ করার জন্য Run মেনু থেকে Run কমান্ড নির্বাচন করলে প্রোগ্রামটি রান হবে অথবা Ctrl+F9 কী দুইটি একত্রে চাপ দিলেও প্রোগ্রাম রান হবে এবং নিম্নোক্ত ফলাফল প্রদর্শন করবে-

```
Enter the last number of the series: 10
Summation: 385
```

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৯

ক. জ্ঞান দক্ষতা স্তর

১। সি প্রোগ্রামিং ভাষা কী ?
২। ভ্যারিয়াবল বা চলক কী ?
৩। অ্যারে কী ?
৪। সাবস্ক্রিপটেড ভ্যারিয়াবল কী ?
৫। ফাংশন কী ?

খ. অনুধাবন দক্ষতা স্তর

১। সি++ বলতে কি বুঝায়?
২। সি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজের সুবিধা ব্যাখ্যা করুন।
৩। সি ভাষার প্রোগ্রামে কোন ধরনের ফাইল আবশ্যক-ব্যাখ্যা করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সি হচ্ছে-

ক. অপারেটিং সিস্টেম খ. প্যাকেজ প্রোগ্রাম
গ. উচ্চতর প্রোগ্রামিং ভাষা ঘ. নিম্নস্তর প্রোগ্রামিং ভাষা

২। For লুপ এর শুরুতে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে?

ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. ছয়

৩। সি ভাষার সাহায্যে কোন ধরনের প্রোগ্রাম লিখা যায়?

ক) Operating System খ) Compiler
গ) Text editor ঘ) সবগুলোই

৪। কোনটি লজিক্যাল অপারেটর?

ক) && খ) = =
গ) + ঘ) সবগুলোই

৫। কোনটি লুপ স্টেটমেন্ট?

ক) if-else খ) switch
গ) for ঘ) break

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। সি প্রোগ্রামিং ভাষা হলো-

i. কেস সেনসিটিভ
ii. চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা
iii. মধ্যম স্তরের ভাষা
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ.i, ii ও iii

২। হেডার ফাইল হলো–

i. stdio.h
ii. math.h
iii. input.h
নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ.i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের প্রোগ্রামটি পড়ে ১ ও ২ এর উত্তর দিনঃ

```
for (c=1; c<=10: c=c+2)
{
printf("ICT");
if ( c= = 5) break;
}
```

১। ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক. 1 খ. 2
গ. 3 ঘ. 4

২। লুপের ভিতরের শর্তটি বাদ দিলে ICT লেখাটি কতবার প্রদর্শিত হবে?

ক. 2 খ. 3
গ. 4 ঘ. ৫

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের প্রোগ্রামটি লক্ষ্য করুন ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

```
# include <stdio.h>
# include <conio.h>
void main( )
{
int i,sum;
sum = 0;
for (i =2; i <=10; i+= 2)
sum = sum + i ;
printf (" Summation = % d", sum);
getch( ) ;
}
```

ক. ডাটা টাইপ কী ? ১
খ. সার্বজনীন ভাষা হিসেবে পরিচিত ভাষাটির ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দিপকের প্রোগ্রামটিতে ব্যবহৃত লুপটির বর্ণনা করুন । ৩
ঘ. উদ্দিপকের প্রোগ্রামে কি বলা হয়েছে এবং নির্বাহ করলে কি ধরনের ফলাফল পাওয়া যাবে–বিশ্লেষণসহ মতামত দিন ।৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন ঃ

```
#include<stdio.h>
# include<conio.h>
main()
{ int c,s;
s=0;
for(c=1;c<=50;c=c+1)
```

```
{
s=s+c*c;
}
printf("sum=%d",s);
getch(); }
```

ক. সাবস্ক্রিপটেড ভ্যারিয়াবল কী? ১

খ. কোন ফাংশনটি সি প্রোগ্রামের জন্য অত্যাবশ্যকীয়? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামে কি বলা হয়েছে এবং প্রোগ্রামটি ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রোগ্রামটি for এর পরিবর্তে do ব্যবহার করে লিখুন এবং প্রোগ্রামটি নির্বাহ করলে কি ধরনের ফলাফল পাওয়া যায়- বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ৯

পাঠ - ৯.১	১	খ	২	খ	৩	খ	
পাঠ - ৯.২	১	ক	২	ঘ			
পাঠ - ৯.৩	১	ঘ	২	ক			
পাঠ - ৯.৪	১	ক	২	গ			
পাঠ - ৯.৫	১	ক					
পাঠ - ৯.৬	১	গ	২	খ			
পাঠ - ৯.৭	১	খ	২	ক			
পাঠ - ৯.৮	১	খ	২	ক			
পাঠ - ৯.৯	১	ক	২	ঘ			
পাঠ - ৯.১০	১	ক	২	ঘ			
পাঠ - ৯.১১	১	খ	২	ঘ			
পাঠ - ৯.১২	১	ক	২	খ			
পাঠ - ৯.১৩	১	ক	২	ঘ			
পাঠ - ৯.১৪	১	ক	২	গ			

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ গ ২ খ ৩ ঘ ৪ ঘ ৫ গ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্নঃ

১ খ ২ ক

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ গ ২ ঘ

ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

ইউনিট ১০

ভূমিকা

বর্তমান যুগ তথ্য ব্যবস্থাপনার যুগ। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ হয়ে থাকে। গৃহকর্তার বাজার থেকে শুরু করে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যবসাকেন্দ্র সবখানেই তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজ হয়ে থাকে। আর এই তথ্যকে সুন্দর ও ঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ব্যবহৃত হয়। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডাটা টেবিল বা ফাইলের সমষ্টি হচ্ছে ডাটাবেজ। ডাটাবেজকে বলা হয় তথ্য ভান্ডার। কোন বিষয়ের উপর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাত্তসমূহ কম্পিউটারে সুগঠিত করে সংরক্ষণ করা হলে তাকে ডাটাবেজ বলে। এই ইউনিটে ডাটাবেজ কি, কিভাবে ডাটাবেজ তৈরি করতে হয়, কর্পোরেট ডাটাবেজ, রিলেশনাল ডাটাবেজের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ।**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১০.১ : ডাটাবেজের ধারণা, ডাটাবেজের ব্যবহার ও ডাটাবেজের বিভিন্ন উপাদান

পাঠ - ১০.২ : এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল, এনটিটি, এনটিটি সেট, ভ্যালু, এট্রিবিউট ও বিভিন্ন ধরনের কী

পাঠ - ১০.৩ : ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

পাঠ - ১০.৪ : ডাটাবেজ তৈরি, ডাটা টাইপ ও কোয়েরি

পাঠ - ১০.৫ : ডাটাবেজ সর্টিং ও ডাটাবেজ ইনডেক্সিং

পাঠ - ১০.৬ : ডাটাবেজ রিলেশন, রিপোর্ট তৈরি ও ব্যবহার

পাঠ- ১০.৭ : কর্পোরেট ডাটাবেজ

পাঠ - ১০.৮ : ডাটা সিকিউরিটি ও ডাটা এনক্রিপশন

পাঠ - ১০.৯ : ব্যবহারিক

পাঠ-১০.১ ডাটাবেজের ধারণা, ডাটাবেজের ব্যবহার ও ডাটাবেজের বিভিন্ন উপাদান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ডাটাবেজ কি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডাটাবেজের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।
- ডাটাবেজের বিভিন্ন উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডাটাবেজ, ফিল্ড, রেকর্ড, ডাটা টেবিল।

১০.১.১ ডাটাবেজ

ডাটাবেজ হলো সংগৃহীত ডাটা যা একই সময়ে ডাটা সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অনেক এ্যাপ্লিকেশন কিংবা নির্দিষ্ট কোন এ্যাপ্লিকেশনকে সেবা প্রদানের জন্য সংগঠিত হয়।

আমাদের চারপাশে অজস্র তথ্য ও উপাত্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে এ সমস্ত তথ্যের সমাবেশকে ডাটাবেজ বলা যাবে না। কারণ ডাটাবেজ হচ্ছে সেই সকল ডাটা বা তথ্যের সমষ্টি যাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। যেমন- ভোটার তালিকায় সংরক্ষিত ভোটারদের তথ্যসমূহ, কোন কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ফাইলের রেকর্ডসমূহ ইত্যাদি ডাটাবেজ ফাইলে সংরক্ষণ করা যায়। অর্থাৎ ডাটাবেজ হচ্ছে ডাটাসমৃদ্ধ এক বা একাধিক ফাইলের সমষ্টি।

১০.১.২ ডাটাবেজ এর ব্যবহার

বর্তমানে কম্পিউটারের ব্যাপক প্রচলনের ফলে ব্যক্তিগত তথ্যাবলি থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় তথ্যাবলি, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি কম্পিউটারে ডাটাবেজ আকারে সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং সমস্ত ডাটাবেজ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়। নিম্নে ডাটাবেজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারসমূহ দেয়া হলোঃ

- অতি দ্রুত ডাটা উপস্থাপন করা যায়।
- অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ডাটা পরিচালনা করা যায়।
- সংরক্ষিত ডাটাকে পরবর্তীতে আপডেট করা যায়।
- ডাটাবেজের তথ্যসমূহকে প্রয়োজনে অ্যাসেন্ডিং (Ascending) ও ডিসেন্ডিং (Descending) অর্ডারে সাজানো যায়।
- অল্প সময়ে ডাটার বিন্যাস ঘটানো যায়।
- বিভিন্ন শিল্প কারখানায় পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, পরিমান, মজুদ, লেনদেনের হিসাব ইত্যাদি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণে ডাটাবেজ ব্যবহার করা হয়।
- বৈজ্ঞানিক গবেষণা কর্মের জন্য এবং পরবর্তীতে ফলাফল বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য আরো অনেক কাজে ডাটাবেজ ব্যবহৃত হয়।

১০.১.২ ডাটাবেজ এর বিভিন্ন উপাদান

ডাটাবেজের বিভিন্ন উপাদানসমূহ হলো—

১. ডাটা (Data)
২. রেকর্ড (Record)
৩. ফিল্ড (Field) ও
৪. ডাটা টেবিল (Data Table)

ডাটা ঃ Data শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Datum -এর বহুবচন । Datum অর্থ হচ্ছে তথ্যের উপাদান । তথ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর অংশসমূহ হচ্ছে ডাটা বা উপাত্ত। ডাটা টেবিলের বিভিন্ন ফিল্ডে আমরা যা কিছু ইনপুট করি তাই ডাটা। উদাহরণস্বরূপ নিচের টেবিলের Tareq একটি ডাটা যা Name ফিল্ডের অধীনে আছে। Dhaka অন্য একটি ডাটা যা Address ফিল্ডের অধীনে আছে এবং Officer আরেকটি ডাটা যা Job Title ফিল্ডের অধীনে আছে। ডাটা টেবিলের বিভিন্ন ফিল্ডের অধীনে এন্ট্রিকৃত সব তথ্যই হলো ডাটা।

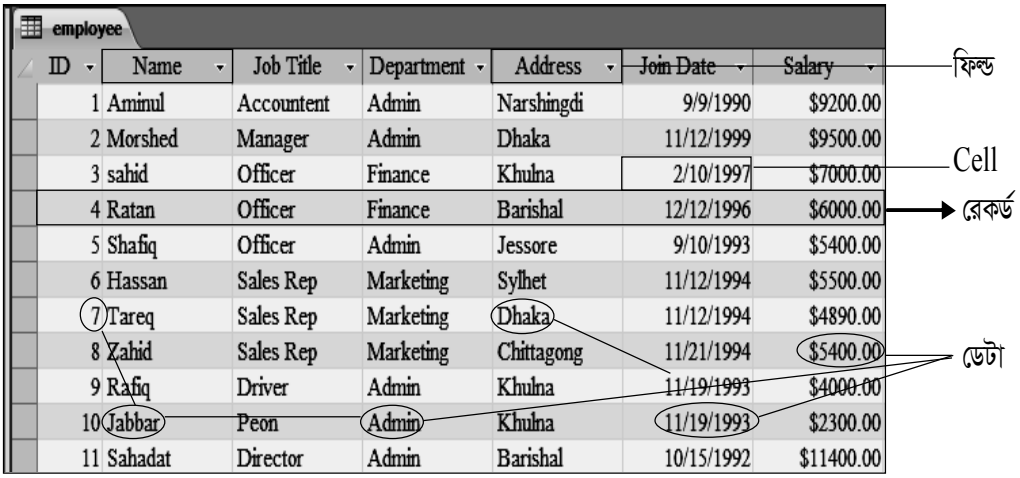

ID	Name	Job Title	Department	Address	Join Date	Salary
1	Aminul	Accountent	Admin	Narshingdi	9/9/1990	$9200.00
2	Morshed	Manager	Admin	Dhaka	11/12/1999	$9500.00
3	sahid	Officer	Finance	Khulna	2/10/1997	$7000.00
4	Ratan	Officer	Finance	Barishal	12/12/1996	$6000.00
5	Shafiq	Officer	Admin	Jessore	9/10/1993	$5400.00
6	Hassan	Sales Rep	Marketing	Sylhet	11/12/1994	$5500.00
7	Tareq	Sales Rep	Marketing	Dhaka	11/12/1994	$4890.00
8	Zahid	Sales Rep	Marketing	Chittagong	11/21/1994	$5400.00
9	Rafiq	Driver	Admin	Khulna	11/19/1993	$4000.00
10	Jabbar	Peon	Admin	Khulna	11/19/1993	$2300.00
11	Sahadat	Director	Admin	Barishal	10/15/1992	$11400.00

রেকর্ড ঃ অনেকগুলো ফিল্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি রেকর্ড। সাধারণভাবে পুরো একটি সারিকেই আমরা রেকর্ড হিসেবে বিবেচনা করি। যদি কোন টেবিলে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ থাকে তবে সে গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা মিলে হবে একটি রেকর্ড। এরকম যতজন গ্রাহকের নাম-ঠিকানা একটি টেবিলে লিপিবদ্ধ থাকবে সে টেবিলে ততগুলো রেকর্ড আছে বলে ধরা হবে।

ফিল্ড ঃ রেকর্ডের ক্ষুদ্রতম অংশ হলো ফিল্ড। রেকর্ডের প্রতিটি উপাদান যেমন- নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদিকে এক একটি ফিল্ড হিসেবে ধরা হয়। প্রতিটি ফিল্ড সাধারণত কলাম হেডিং হিসেবে থাকে। কলামের একটি সেলের (Cell) ডাটাকে আমরা একটি ফিল্ড হিসেবে ধরি এবং পুরো কলামটিতে থাকে একই ধরনের ডাটা।

ডাটা টেবিল ঃ সমজাতীয় সকল ডাটাকে এক একটি টেবিলে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। ধরা যাক, একটি অফিসের তিনটি শাখা আছে, যথা- প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা ও বিক্রয় শাখা। প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জন্য একটি টেবিল নির্দিষ্ট করা আছে যেখানে ঐ শাখার সকল উপাত্ত সংরক্ষিত আছে। হিসাব শাখার জন্য আবার আলাদা একটি টেবিলে অফিসের আয়-ব্যয় বা কর্মচারীদের বেতন-ভাতার হিসাব সংরক্ষিত আছে এবং বিক্রয় শাখার জন্য আর একটি টেবিলে দৈনন্দিন বিক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র লিপিবদ্ধ আছে। তিনটি টেবিলই থাকবে একটি মূল ফাইল বা ডাটাবেজের অধীনে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার ক্লাশের শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ডাটা টেবিল তৈরি করে ডাটাবেজের বিভিন্ন উপাদানসমূহ সনাক্ত করুন।

সারসংক্ষেপ

ডাটাবেজ হলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর ব্যাপক তথ্য বা উপাত্তের সমারোহ। আরও সহজভাবে, ডাটাবেজ বলতে বিপুল পরিমান তথ্য মজুদ রাখার ব্যবস্থাকেই বুঝায়। যেমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ। ডাটা, ফিল্ড, রেকর্ড, ডাটা টেবিল ইত্যাদি হলো ডাটাবেজের উপাদান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ডাটা (Data) শব্দের অর্থ হলো-

ক) উপাত্ত খ) তথ্য

গ) ফিল্ড ঘ) রেকর্ড

২। ডাটাবেজের উপাদান হতে পারে-

i. ফিল্ড

ii. রেকর্ড

iii. ডাটা টেবিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১০.২ এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল, এনটিটি, এনটিটি সেট, ভ্যালু, এট্রিবিউট ও বিভিন্ন ধরনের কী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- এনটিটি রিলেশনশীপ মডেলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এনটিটি, এনটিটি সেট, ভ্যালু ও এট্রিবিউট কি তা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের কী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	এনটিটি, এট্রিবিউট, কী (Key) ।

১০.২.১ এনটিটি

এনটিটি (Entity) হচ্ছে সত্তা যা দিয়ে অবজেক্টকে চিহ্নিত করা যায়। কোন ডাটা টেবিলকে চিহ্নিত করার জন্য টেবিলের যে নাম দেওয়া হয় তাই হএছ ডাটার এনটিটি। যেমন- একজন কর্মচারীর নাম, পদবী, বয়স, ঠিকানা ইত্যাদির সমন্বয়ে এনটিটি গঠিত হয়। এনটিটির বাস্তব উপস্থিতি থাকতে পারে অথবা এটি শুধুমাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে হতে পারে। নিচের চিত্রের মাধ্যমে এনটিটি দেখানো হলো-

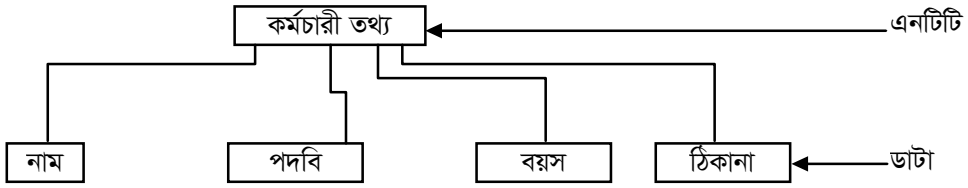

চিত্র ১০.২.১ : এনটিটি

এনটিটি সেট (Entity Set)

একই জাতীয় এনটিটিকে এনটিটি সেট (Entity Set) বলা হয়। একটি ডাটাবেজকে এনটিটি সেট বলা যেতে পারে।

এট্রিবিউট (Attribute)

প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ যখন কোন এনটিটিকে বর্ণনা করে তখন তাকে এট্রিবিউট বলে। অর্থাৎ এনটিটির অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি ফিল্ডকে এট্রিবিউট বলে। চিত্র ১০.২.২ এনটিটিতে চারটি ফিল্ড রয়েছে। এগুলো হলো নাম, পদবি, বয়স এবং ঠিকানা। এর প্রত্যেকটি এক একটি এট্রিবিউট। কোন একজন কর্মচারীর উল্লিখিত চারটি ফিল্ডের যে তথ্য পাওয়া যাবে, সেই চারটি তথ্যের সমষ্টিকে বলা হয় এনটিটি সেট বা রেকর্ড। যেমন- সজীব আহমেদ, অপারেটর, ৩১, পরিবাগ এ চারটি ফিল্ড একটি এনটিটি সেট।

নাম	পদবি	বয়স	ঠিকানা
সজীব আহমেদ	অপারেটর	৩১	পরিবাগ
আশরাফুল	শ্রমিক	২৮	শ্যামলী
আবুল হোসেন	সহকারি	২৭	ফার্মগেট
সিরাজ আহমেদ	সহকারি	২৬	রামপুরা

চিত্র ১০.২.২ : এনটিটি সেট

ভ্যালু (Value)

প্রত্যেকটি এট্রিবিউট এর যে মান থাকে তাকে বলা হয় ভ্যালু। যেমন- নাম এট্রিবিউট এর ভ্যালু হচ্ছে সজীব আহমেদ,

বয়স এট্রিবিউট এর ভ্যালু হচ্ছে ৩১ (চিত্র ১০.২.২)।

১০.২.২ এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল

অনেকগুলো এনটিটি সেটের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশের পদ্ধতিকে এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল বলে। এটা ডাটাবেজ ডিজাইনে বহুল ব্যবহৃত একটি মডেল। উদাহরণ হিসেবে নিচে একটি এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল দেখানো হলো-

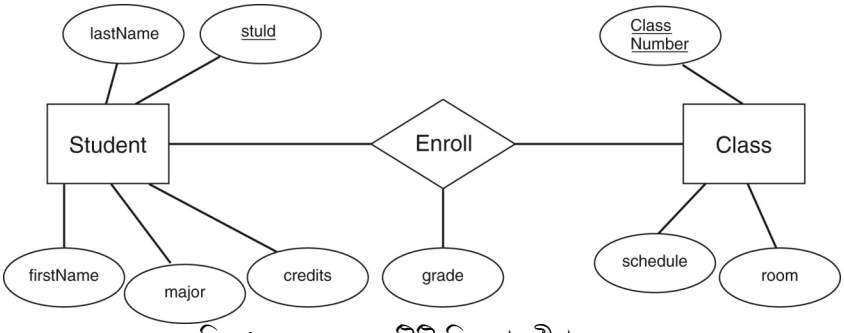

চিত্র ১০.২.৩ : এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল

এখানে দুইটি এনটিটি রয়েছে স্টুডেন্ট (student)ও ক্লাশ (class)। স্টুডেন্ট টেবিলের চারটি ফিল্ড-আইডি, প্রথম নাম, শেষ নাম, মেজর, ক্রেডিট ইত্যাদি এবং ক্লাশ টেবিলের তিনটি ফিল্ড- ক্লাশ নম্বর, সিডিউল, রুম ইত্যাদি। দুই টেবিলের মধ্যে একটি রিলেশনশীপ এনরোল (Enroll) তৈরি করে দেখানো হয়েছে।

১০.২.৩ কী

সাধারণত কোন একটি ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে ফাইলের রেকর্ড সনাক্তকরণ, অনুসন্ধান, সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি কাজগুলো করা হয়। এই ফিল্ডকে কী ফিল্ড বলে। যেমন ক্লাশে ছাত্রদের রোল নম্বরের ভিত্তিতে শনাক্তকরণ, ফলাফল ঘোষণা ও স্কলারশীপ বিতরণ করা হয়, তাই রোল নম্বরকে কী ফিল্ড বলা যায়। কী ফিল্ড প্রধানত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১. প্রাইমারি কী (Primary Key)
২. কম্পোজিট প্রাইমারি কী (Composite Primary Key) ও
৩. ফরেন কী (Foreign Key)

প্রাইমারি কী

যে ফিল্ড কোন একটি রেকর্ডকে অদ্বিতীয়ভাবে সনাক্ত করে তাকে প্রাইমারি কী বলে। কোন ফাইলে সাধারণত এক বা একাধিক ফিল্ড থাকে। এই ফিল্ডগুলোর মধ্যে কমপক্ষে একটি ফিল্ড থাকবে যার ডাটাগুলো অদ্বিতীয় অর্থাৎ ঐ ফিল্ডের প্রতিটি ডাটা ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেমন- একটি শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের রোল নম্বর একটিই থাকে। তাই রোল নম্বরটিই হলো প্রাইমারি কী। নিম্নে ছাত্রদের ভর্তি ফাইলে প্রাইমারি কী ফিল্ড দেখানো হলো -

প্রাইমারি কী ◄

রোল	নাম	বয়স	শিক্ষাবর্ষ
১১৮০০২	আবদুর রহমান	২২	২০১০-১১
১১৮০২২	আমির হোসেন	২৩	২০১০-১১
১০৮০২০	তানিয়া	২৪	২০০৯-১০
১০৮০২১	সাইফুল হক	২১	২০১২-১৩
১০৮০২৭	আমির হোসেন	২৩	২০১০-১১

চিত্র ১০.২.৪ : প্রাইমারি কী ফিল্ড

রোল নম্বর ছাড়া অন্য কোন ফিল্ডকে প্রাইমারি কী বলা যাবে না কারণ নাম ফিল্ডে একই নাম একাধিকবার থাকতে পারে কিংবা বয়স বা অন্যান্য ফিল্ডের একই ডাটা বার বার থাকতে পারে। প্রাইমারি কী এর সাহায্যে একাধিক ফাইলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে রিলেশনাল ডাটাবেজ তৈরি করা হয়।

কম্পোজিট প্রাইমারি কী

যখন কোন ডেটাবেজ ফাইলে কোন সুনির্দিষ্ট প্রাইমারি কী থাকে না, তখন একটি ফিল্ডকে প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। সে সব ক্ষেত্রে একাধিক ফিল্ডকে একত্রে প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের প্রাইমারি কী ফিল্ডকে বলা হয় কম্পোজিট প্রাইমারি কী ফিল্ড। নিম্নের ডাটা ফাইলে ছাত্রের নাম ও পিতার নাম উভয় ফিল্ডের সমন্বয় ছাড়া প্রাইমারী কি ফিল্ড গঠন করা সম্ভব হয় না। এ জন্য ছাত্রের নাম ও পিতার নাম একত্রে ব্যবহার করে কম্পোজিট প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

কম্পোজিট প্রাইমারি কী

ছাত্রের নাম	পিতার নাম	গ্রেড পয়েন্ট	লেটার গ্রেড
রহমান	রায়হান আলী	4.00	A
মামুন	ইসলাম	4.50	A
মামুন	সাজু ইসলাম	5.00	A+
সাইফুল	রায়হান আলী	5.00	A+

চিত্র ১০.২.৫ : কম্পোজিট প্রাইমারি কী

উপরের ডাটা ফাইলে ২ জন ছাত্রের পিতার নামই রায়হান আলী কিন্তু ছাত্রের নাম ভিন্ন। আবার ২ জন ছাত্রের নামই মামুন কিন্তু পিতার নাম ভিন্ন। এজন্য ছাত্রের নাম ও পিতার নাম একত্রে প্রাইমারি কী ফিল্ড হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

ফরেন কী

অনেক সময় দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে হয়। কোন একটি টেবিলের প্রাইমারি যদি অন্য টেবিলে ব্যবহৃত হয় তখন ঐ কী-কে ফরেন কী বলে। ফরেন কীর সাহায্যে একটি টেবিলের সাথে অন্য টেবিলের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। যেমন : ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তি ফাইল এবং রেজাল্ট ফাইলের মধ্যে ফরেন কী ফিল্ড দেখানো হলো-

প্রাইমারি কী ফিল্ড

ছাত্রের নাম	রোল	রেজিস্ট্রেশন
লাবিব	1001	7181470
জুনায়েদ	1002	7181471
শাহরিয়ার	1003	7181472
শেহজাদ	1004	7181473

ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তি ফাইল

ফরেন কী ফিল্ড

রোল	গ্রেড পয়েন্ট	লেটার গ্রেড
1001	5.00	A+
1002	4.25	A
1003	5.00	A+
1004	5.00	A+

রেজাল্ট ফাইল

চিত্র ১০.২.৬ : ফরেন কী

ছাত্রদের ভর্তি ফাইলে রোল হচ্ছে প্রাইমারি কী ফিল্ড যা রেজাল্ট ফাইলেও বিদ্যমান আছে। ছাত্রদের রেজাল্ট ফাইলে রোল হচ্ছে ফরেন কী ফিল্ড।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাইমারি কী ও ফরেন কী ফিল্ড এর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

ডাটাবেজের গুরুত্বপূর্ণ টার্মসমূহ হলো এনটিটি, এনটিটি সেট, এট্রিবিউট, ভ্যালু, কী ইত্যাদি। কোন ডাটাবেজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে রেকর্ড ব্যবহার করা হয় তাকে এনটিটি বলে। একই জাতীয় এনটিটিকে এনটিটি সেট বলা হয়। আবার একটি এনটিটি এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশের যে সমস্ত ফিল্ড বা আইটেম বা উপাদান ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় এট্রিবিউট। প্রত্যেকটি এট্রিবিউট এর যে মান থাকে তাকে বলা হয় ভ্যালু।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ডাটাবেজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে রেকর্ড ব্যবহার করা হয় তাকে কি বলে?

ক) এট্রিবিউট খ) এনটিটি
গ) ফিল্ড ঘ) সবগুলো

২। যে ফিল্ড কোন একটি রেকর্ডকে অদ্বিতীয়ভাবে সনাক্ত করে তা হলো-

ক) প্রাইমারি কী খ) ফরেন কী
গ) কী ঘ) সবগুলো

পাঠ-১০.৩ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কাজসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

১০.৩.১ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তথ্য এবং সে তথ্য পর্যালোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের সমষ্টি। ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম থাকে। ডিবিএমএস ডাটাবেজ তৈরি, এ্যাকসেস করা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। ডিবিএমএস ব্যবহারকারী এবং ডাটাবেজের মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরুনের ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়। যেমন- ওরাকল (Oracle), মাইএসকিউএল (MySQL), মাইক্রোসফ্ট এ্যাকসেস(Microsoft Access) ইত্যাদি।

১০.৩.২ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর প্রাথমিক কাজসমূহ

ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রাথমিক কাজগুলো হলো—

- প্রয়োজন অনুযায়ী ডাটাবেজ তৈরি করা
- নতুন ডাটা/ রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করা
- ডাটার বানান ও সংখ্যার ভুল অনুসন্ধান ও সংশোধন করা
- নির্দিষ্ট রেকর্ড অনুসন্ধান ও সংশোধন করা এবং অপ্রয়োজনীয় ডাটা/ রেকর্ড বাদ দেয়া
- ডাটা কুয়েরি করা
- রিপোর্ট তৈরি ও প্রিন্ট করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ ডাটাবেজকে যে কোন ফিল্ডের ভিত্তিতে সাজানো (sorting)
- প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ডাটাবেজ বা ডাটাবেজের অংশবিশেষ প্রিন্ট করা
- ডাটাবেজ হালনাগাদ (update) করা ও যথাসম্ভব ডাটা ডুপ্লিকেশন কমানো ।
- ডাটা সংরক্ষণ করা; ইত্যাদি।

১০.৩.৩ রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

একটি ডাটাবেজে একাধিক টেবিল থাকতে পারে। কোন একটি নির্দিষ্ট ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে দুই বা ততোধিক টেবিলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাকে রিলেশনশীপ বলা হয়। রিলেশন তৈরি করা টেবিল থেকে প্রয়োজনীয় ডাটা নিয়ে আলাদা ডাটা টেবিল তৈরি করা যায়। রিলেশন করা ডাটা টেবিলের সমন্বয়ে গঠিত ডাটাবেজকে রিলেশনাল ডাটাবেজ বলা হয়। আধুনিক ডাটাবেজ সফ্টওয়্যার বলতে সাধারণত রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকেই বুঝায়।

রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্ভারে ডাটাবেজ ইঞ্জিন ব্যবহার করার জন্য বাজারে অনেক ধরনের সফট্ওয়্যার রয়েছে। যথা– মাইক্রোসফ্ট এক্সিস, ওরাকল, মাইএসকিউএল, এসকিউএল সার্ভার, ইনফরমিক্স ইত্যাদি।

১০.৩.৪ রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ—

- সহজে টেবিল তৈরি করে ডাটা এন্ট্রি করা যায়।
- ডাটা টেবিলের সাথে অন্য এক বা একাধিক ডাটা টেবিলের মধ্যে রিলেশন তৈরি করা যায়।
- অসংখ্য ডাটার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় ডাটাকে খুঁজে বের করা যায়।
- সহজে এক ডাটাবেজ থেকে অন্য ডাটাবেজের সাথে তথ্য আদান প্রদান করা যায়।
- সংখ্যাবাচক ডাটাসমূহে সূক্ষ্ম গাণিতিক কাজ করা যায়।
- সহজে নানা ফরমেটের রিপোর্ট তৈরি করা যায় ও তা মুদ্রণ করা যায়।
- প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে লেবেল তৈরি করা যায় এবং ছাপানো যায়।
- এন্ট্রি ফর্ম তৈরি করা যায়।
- বিভিন্ন ধরনের চার্ট তৈরি করা যায়।
- আকর্ষণীয় ডাটা এন্ট্রি ফর্ম তৈরি করা যায়।
- অন্যান্য ডাটাবেজ প্রোগ্রাম (যেমন- ফক্সপ্রো, এক্সেল ইত্যাদি) থেকে তথ্য বা ডাটা এনে ব্যবহার করা যায়।
- সহজে এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার / প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বর্তমান সময়ে কোন ধরনের ডাটাবেজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? আপনার মতামত দিন।

সারসংক্ষেপ

ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তথ্য এবং সে তথ্য পর্যালোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের সমষ্টি। একটি ডাটাবেজে একাধিক টেবিল থাকতে পারে। ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সহজে এক ডাটাবেজ থেকে অন্য ডাটাবেজের সাথে তথ্য আদান প্রদান করা যায়। আর রিলেশন করা ডাটা টেবিলের সমন্বয়ে গঠিত ডাটাবেজকে রিলেশনাল ডাটাবেজ বলা হয়। আধুনিক ডাটাবেজ সফ্টওয়্যার বলতে সাধারণত রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকেই বুঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার কোনটি?

ক) Microsoft Access খ) MySQL
গ) Oracle ঘ) সবগুলোই

২। একটি ডাটাবেজে কতটি টেবিল থাকতে পারে?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ)সবগুলোই

পাঠ-১০.৪ ডাটাবেজ তৈরি, ডাটা টাইপ ও কোয়েরি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ডাটাবেজ ভাষা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডাটাবেজ ভাষার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ডাটা টাইপ ও কোয়েরি কি বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডাটাবেজ ভাষা, কোয়েরি ।

১০.৪.১ ডাটাবেজ ভাষা

যে ভাষার দ্বারা ডাটাবেজ সিস্টেমে ডাটাবেজ তৈরি, কুয়েরি, ডাটা মডিফিকেশন করা হয় তাকে ডাটাবেজ ভাষা বলে। ডাটাবেজ ভাষা দুই ধরনের। যথা:

১. ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ (Data Definition Language-DDL) ও
২. ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ (Data Manipulation Language-DML)

ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজঃ একটি ডাটাবেজ পরিকল্পনা করা হয় কতকগুলো বর্ণনার মাধ্যমে। এ বর্ণনাগুলো লেখার জন্য এক ধরনের বিশেষ ভাষা ব্যবহার করা হয়, যাকে ডাটা ডেফিনেশন ল্যাংগুয়েজ বলা হয়। ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ডাটা সংরক্ষণ ও ডাটা এ্যাকসেস করার জন্য ডাটা ডেফিনেশন ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করা হয়। ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এর কমান্ডগুলো হল-

- Create statement
- Drop statement
- Alter statement
- Rename statement

ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজঃ যে ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে রিলেশনাল ডাটাবেজ টেবিলে ডাটা ইনসার্ট, ডিলিট, আপডেট, মডিফাই করা যায় তাকে ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বলে। ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এর কমান্ডগুলো হল-

- Insert statement
- Delete statement
- Update statement

১০.৪.২ ডাটাবেজ তৈরি করা

একই জাতীয় ডাটাসমূহ নিয়ে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়। যেমন- কোন অফিসের কর্মচারীদের যাবতীয় তথ্যের সমন্বয়ে কোন ডাটাবেজ তৈরি করা যেতে পারে। রিলেশনাল ডাটাবেজ প্রোগ্রামে কতগুলো পরস্পর সম্পর্কিত অবজেক্টের সমন্বয়ে ডাটাবেজ গঠিত হয়। যে সকল অবজেক্টের সমন্বয়ে ডাটাবেজ গঠিত তা হচ্ছে টেবিল, কুয়েরি, ফর্ম, রিপোর্ট, ম্যাক্রো এবং মডিউল। রিলেশনাল ডাটাবেজ সিস্টেমে ডাটাবেজ তৈরি করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন, মাইক্রোসফ্ট এ্যাকসেস ডাটাবেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তিনভাবে ডাটাবেজ তৈরি করা যায়। যথা–

- Database Wizard থেকে
- মেনু থেকে
- ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে

১০.৪.৩ ডাটাবেজ উইন্ডো পরিচিতি

ডাটাবেজ একটি কন্টেনার বা উইন্ডো আকারে থাকে, তাতে ডাটাবেজের একই জাতীয় অবজেক্টগুলো গ্রুপ ভিত্তিতে অবস্থান করে। নিচে বহুল ব্যবহৃত মাইক্রোসফট এ্যাকসেস ডাটাবেজ উইন্ডোর চিত্র দেয়া হলো-

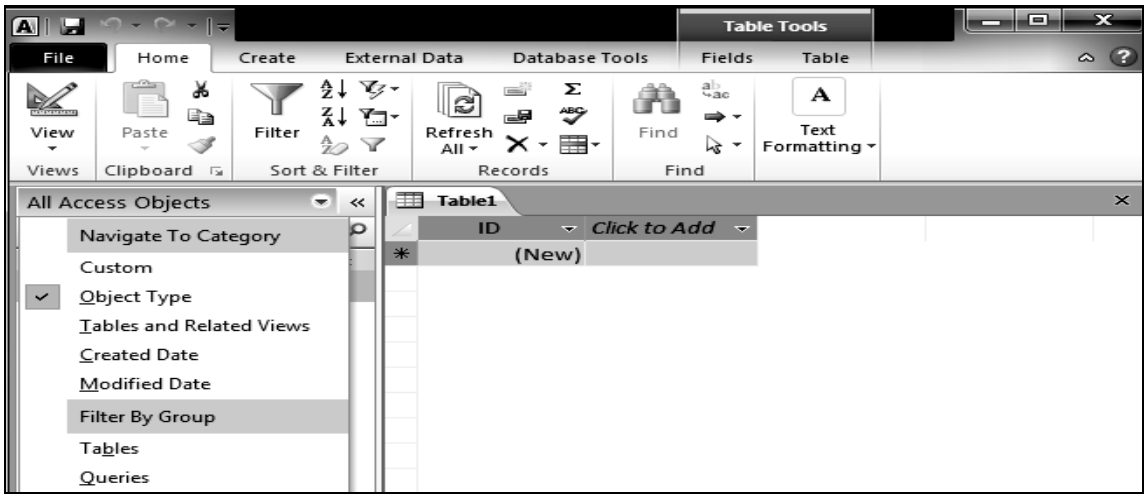

চিত্র ১০.৪.১ : মাইক্রোসফ্ট এ্যাকসেস ডাটাবেজ উইন্ডো

ডাটাবেজ উইন্ডোতে অনেকগুলো ট্যাব থাকে। বিভিন্ন ট্যাবের আওতায় ডাটাবেজ টেবিলসমূহ ও অন্যান্য অবজেক্টগুলো ধারণ করে যে জাতীয় অবজেক্ট তৈরি করা হবে, ডাটাবেজ উইন্ডো থেকে সে জাতীয় ট্যাব নির্বাচন করে নিতে হয়। নিচে ডাটাবেজ উইন্ডোর বিভিন্ন উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হলো-

- **Tables :** এ ট্যাবের আওতায় টেবিলগুলো সংরক্ষিত থাকে। এখান থেকে কোন টেবিল পরিবর্তন, সংশোধন, কিংবা নতুন টেবিল তৈরি করা যায়।
- **Queries :** এ ট্যাব থেকে বর্তমান ডাটাবেজের সকল কুয়েরির তালিকা পাওয়া যাবে। এখান থেকে কোন কুয়েরি পরিচালনা করা, কুয়েরি পরিবর্তন, সংশোধন বা নতুন কোন কুয়েরি তৈরি করা যায়।
- **Forms :** এ ট্যাব থেকে বর্তমান ডাটাবেজের সকল রিপোর্ট ও ফর্ম পাওয়া যাবে। রিপোর্ট হচ্ছে ব্যবহারকারীদের পছন্দ মতো ফর্মেট তথ্যাবলি প্রদর্শন বা মুদ্রণ করা। এখান থেকে কোন রিপোর্ট সংশোধন বা কোন নতুন রিপোর্ট তৈরি করা যায়।
- **Page :** ইন্টারনেট বা ইন্ট্রানেট এ মাইক্রোসফ্ট এ্যাকসেস বা SQL সার্ভারে সংরক্ষিত ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য ডাটাবেজ access page তৈরি করা যায়।
- **Macro :** ম্যাক্রো হচ্ছে এক ধরনের ছোট প্রোগ্রাম। এ ট্যাবে ক্লিক করলে বর্তমান ডাটাবেজের সকল ম্যাক্রো প্রোগ্রামগুলোর তালিকা আসবে। এখান থেকে কোন ম্যাক্রো সংশোধন বা নতুন ম্যাক্রো তৈরি করা যায়।
- **Module :** প্রোগ্রামের এক বা একাধিক প্রসিডিউরকে এক একটি মডিউল বলা হয়। মডিউল ট্যাবে ক্লিক করলে বর্তমান ডাটাবেজের প্রোগ্রামিং মডিউলগুলোর তালিকা পাওয়া যাবে। এখান থেকে প্রয়োজনীয় কোড লিখা যায় বা সংশোধন করা যায়। কোড লিখার জন্য ভিজুয়্যাল বেসিক এডিটর ব্যবহৃত হয়।

১০.৪.৪ ডাটা টাইপ

ডাটাবেজ ডিজাইন করার সময় ডাটাবেজের ফিল্ডের টাইপ অর্থাৎ ফিল্ডে এন্ট্রিকৃত ডাটার টাইপ বা প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হয়। ডাটাবেজ ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত ফিল্ডের নাম, ডাটা টাইপ, ডাটার ফরমেট ও ফিল্ডের দৈর্ঘ্য। ফিল্ডের টাইপ বা ডাটার টাইপ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। বিভিন্ন প্রকার ফিল্ড টাইপ বা ডাটা টাইপ সম্পর্কে

নিম্নে আলোচনা করা হলো—

- **Text/Character :** সাধারণত বর্ণভিত্তিক ডাটার ক্ষেত্রে এ ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। যেমন- Name, Father's Name, Designation, Address ইত্যাদি। এ ফিল্ডে বর্ণের সাথে সাথে সংখ্যাও লিখা যায়। তবে ঐ সব সংখ্যার উপর কোন গাণিতিক করা যায় না। এ ফিল্ডে সর্বোচ্চ ২৫৬ টি বর্ণ/অংক ব্যবহার করা যায়।

- **Number/Numeric :** সংখ্যাভিত্তিক বা সংখ্যা জাতীয় ডাটার ক্ষেত্রে এ ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। এ ফিল্ডে চিহ্নসহ পূর্ণসংখ্যা কিংবা দশমিক সংখ্যা লেখা যায়। এ ফিল্ডে কোন বর্ণ লেখা যায় না। এ ফিল্ড বিভিন্ন ফরমেটের হয়ে থাকে। যেমন– Byte, Integer, Long Integer, Single, Double, Replication ID ইত্যাদি।

- **Auto Number :** এটি একটি Number Data টাইপ ফিল্ড। এ ডাটা টাইপ সাধারণ ধারাবাহিক বা সিরিজ জাতীয় ডাটার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন– Sl No, ID No, Roll No ইত্যাদি। এ ডাটা টাইপের সুবিধা হচ্ছে এই ফিল্ডে ডাটা এন্ট্রি করতে হয় না, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারাবাহিক ডাটা এন্ট্রি হয়ে যায়।

- **Currency :** এটা Number Data টাইপ ফিল্ড। সংখ্যা ভিত্তিক ডাটা দ্বারা কোন দেশীয় মুদ্রা বা অর্থ জাতীয় ডাটার ক্ষেত্রে এ ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। যেমন– Tuition Fee, Salary, Exam Fee, Service Charge ইত্যাদি।

- **Date/Time :** তারিখ ও সময় জাতীয় ডাটার ক্ষেত্রে এ ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয়। যেমন– Date of Birth, Joining Date, Admission Date ইত্যাদি।

- **Logical :** যে সমস্ত ডাটা কেবলমাত্র হ্যাঁ বা না দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, ঐ জাতীয় ডাটার ক্ষেত্রে এ Data Type ব্যবহার করা হয়। যেমন– Present-Absent, Married-Unmarried, Skilled-Unskilled ইত্যাদি।

- **Memo :** এটা Conditional Data টাইপ অর্থাৎ এ জাতীয় ফিল্ডে বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন, তারিখ ইত্যাদি ব্যবহার করে লেখা যায়। সাধারণত মন্তব্য ফিল্ডে এ ডাটা টাইপ ব্যবহার করা হয়।

- **OLE Object :** এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Object Linking and Embedding। ফিল্ডের অধীনে টেক্সট, ছবি, গ্রাফ বা সাউণ্ড হিসেবে অন্য কোন প্রোগ্রাম যেমন- এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট, ফটোসপ ইত্যাদি থেকে অবজেক্ট দিতে হলে OLE Object হিসেবে দিতে হয়।

- **Hyperlink :** কোন ফিল্ডের অধীনে টেক্সট ও নম্বরের কম্বিনেশন ও অন্যান্য কোন প্রোগ্রামের তথ্যকে লিঙ্ক করে দিতে চাইলে এই ধরনের ফিল্ড টাইপ সিলেক্ট করতে হয়।

- **Look up wizard :** সরাসরি ডাটা এন্ট্রি না করে কোন লিস্ট থেকে পছন্দকৃত ডাটা ইনপুট করার জন্য এ জাতীয় ফিল্ড ব্যবহার করা হয়।

১০.৪.৫ ডাটাবেজে ডাটা ঢুকানো

ডাটাবেজ তৈরি করে এর অধীনে কোন ডাটা টেবিল তৈরি করে তাতে ডাটা এন্ট্রি করা যায়। ডাটা এন্ট্রি করে সেভ করে ডাটা টেবিল থেকে বের হয়ে পরবর্তীতে ইচ্ছে করলে ডাটা টেবিলে আবার ডাটা সন্নিবেশিত করা যায়। ডাটা সন্নিবেশিত করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নিতে হবে—

১. ডাটাবেজটি ওপেন করতে হবে।
২. Tables ট্যাবে ক্লিক করে প্রদর্শিত তালিকা থেকে ডাটা টেবিলটিতে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতে হবে।
৩. টেবিলটির সব শেষের রেকর্ডের নিচের সারির প্রথম ফিল্ডে ক্লিক করে নতুন ডাটা এন্ট্রি করতে হবে।
৪. ডাটা টেবিলটি ক্লোজ করে বের হয়ে গেলে এন্ট্রি করা ডাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হবে।

কোনো রেকর্ড ইনপুট বা সংশোধন করা সমাপ্ত হলেই রেকর্ডটি আপনা আপনি সেভ হয়ে যায়। এছাড়াও Record মেনু থেকে Save Record নির্বাচন করে অথবা টুল বার থেকে 🖫 Save টুলস-এ ক্লিক করে সেভ করা যায়।

১০.৪.৬ কুয়েরি

ডাটাবেজে ব্যাপক তথ্য সংগৃহীত থাকতে পারে। এই ব্যাপক আয়তনের তথ্যের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় রেকর্ড বা রেকর্ডসমূহ কোন শর্ত বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে খুঁজে বের করাকে কুয়েরি বলা হয়। কুয়েরিতে Expression, Operator, Filter ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। কোন ডাটা কুয়েরি করার জন্য যুক্তিমূলক এক্সপ্রেশন (Logical Expression) দিয়ে শর্ত নির্ধারণ করে দিতে হয়। যে সকল রেকর্ড শর্ত পূরণ করে সে রেকর্ডগুলোই কুয়েরির ফলাফল হিসেবে পাওয়া যাবে। যেমন– ধরা যাক, কোন ডাটা টেবিলে City নামক একটি ফিল্ডে বিভিন্ন শহরের নাম আছে। এক্ষেত্রে যে সকল রেকর্ডের City ফিল্ডের মান "Dhaka" আছে, সে রেকর্ডগুলো কুয়েরি করার জন্য City = "Dhaka" এ রকম এক্সপ্রেশন তৈরি করা যায়। কুয়েরিতে এক্সপ্রেশন তৈরি করার জন্য বিভিন্ন অপারেটর ব্যবহার করতে হয়।

Query বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যথা–

i. Select Query
ii. Parameter Query
iii. Crosstab Query
iv. Action Query ইত্যাদি।

১০.৪.৬ SQL

SQL এর পুরো অর্থ হচ্ছে Structured Query Language। এটি একটি অনন্য শক্তিশালী ডাটা মেনিপুলেশন ও ডেফিনেশন ল্যাংগুয়েজ। রিলেশনাল ডাটাবেজ এ্যাকসেস করার জন্য SQL হচ্ছে একটি হাতিয়ার। অতীতে SQL কেবল মেইনফ্রেম কম্পিউটারে ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে ডেস্কটপ কম্পিউটারেও রিলেশনাল ডাটাবেজ প্লাটফর্ম ব্যবহৃত হওয়ার ফলে SQL ব্যবহার শুরু হয়েছে। এগুলো এক বা একাধিক ডাটাবেজ, টেবিল, কলাম ইনডেক্স ইত্যাদিতে প্রয়োগ করা যায়। অধিকাংশ SQL স্টেটমেন্টই ফলাফল হিসেবে এক সেট রেকর্ড প্রদান করে। SQL কুয়েরি প্রয়োগ করার জন্য SQL উইন্ডো ওপেন করে নিতে হয়। ১৯৭৪ সালে IBM (International Business Machine) এর Research Center এ SQL তৈরি করা হয়।

SQL ফিচার সুবিধা

- SQL ইংরেজি ভাষার কাছাকাছি একটি কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ। এতে SELECT, INSERT, DELETE এ রকম শব্দ দ্বারা কমান্ডসেট তৈরি করা হয়েছে।
- SQL একটি non-procedural ল্যাংগুয়েজ। যে তথ্যাবলি দরকার কেবল তা বলে দিলেই হয়, কিভাবে কুয়েরি করা যাবে তা বলার দরকার হয় না।
- SQL একই সময়ে এক একটি রেকর্ডকে প্রসেস না করে বরং এক সেট রেকর্ড প্রসেস করে।
- SQL বিভিন্ন শ্রেণির ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে। যেমন– ডাটাবেজ এডমিনিস্ট্রেটর, প্রোগ্রামার, ম্যানেজমেন্ট বা বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহারকারী (End User) ইউজারগণ।
- SQL বিভিন্ন শ্রেণির কার্যসম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা যায়। যেমন–
  - —— ডাটা কুয়েরি করা।
  - —— ডাটা সন্নিবেশ, আপডেট বা মুছে ফেলা।
  - —— ডাটাবেজ অবজেক্ট তৈরি, সংশোধন বা মুছে ফেলা।
  - —— ডাটাবেজ অবজেক্ট এ্যাকসেস নিয়ন্ত্রণ।
  - —— ডাটাবেজ Consistency-এর নিশ্চয়তা প্রদান।

শিক্ষার্থীর কাজ	ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ও ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এর মধ্যে পার্থক্য তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

যে ভাষার দ্বারা ডাটাবেজ সিস্টেমে ডাটাবেজ তৈরি, কুয়েরি, ডাটা মডিফিকেশন করা হয় তাকে ডাটাবেজ ভাষা বলে। সাধারণত ডাটাবেজ ভাষা ডাটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ও ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এই দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটি ডাটাবেজ পরিকল্পনা করা হয় কতকগুলো বর্ণনার মাধ্যমে। এ বর্ণনাগুলো লেখার জন্য এক ধরনের বিশেষ ভাষা ব্যবহার করা হয়, যাকে ডাটা ডেফিনেশন ল্যাংগুয়েজ বলা হয়। আর যে ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে রিলেশনাল ডাটাবেজ টেবিলে ডাটা ইনসার্ট, ডিলিট, আপডেট, মডিফাই করা যায় তাকে ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ডাটা টাইপ কোনটি?

ক) Text/Character
খ) Date
গ) Integer
ঘ) সবগুলোই

২। SQL এর পুরো অর্থ হচ্ছে?

ক) Structured Query Language
খ) Secured Query Language
গ) Standard Query Language
ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-১০.৫ ডাটাবেজ সর্টিং ও ডাটাবেজ ইনডেক্সিং

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ডাটাবেজ সর্টিং কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডাটাবেজ ইনডেক্সিং কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডাটাবেজ সর্টিং ও ডাটাবেজ ইনডেক্সিং এর তুলনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডাটাবেজ সর্টিং, ডাটাবেজ ইনডেক্সিং ।

১০.৫.১ ডাটাবেজ সর্টিং

ডাটা টেবিল তৈরি করে তাতে অনেক ডাটা এন্ট্রি করে ডাটাবেজ তৈরি করা হয়। ডাটাবেজে ডাটা এন্ট্রি করার সময় সাধারণত ধারাবাহিকতা মানা হয় না। যেমন- পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের রেজাল্টশীট তৈরি করার জন্য ডাটা এন্ট্রি করার সময় যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে তার রেকর্ড প্রথমে, তারপর দ্বিতীয় বেশি নম্বর প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর রেকর্ড, তারপর তৃতীয় এভাবে অপারেটররা ডাটা এন্ট্রি করেন। এভাবে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীদের রেকর্ড সাজিয়ে (সর্ট) এন্ট্রি করা কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। কিন্তু কম্পিউটার ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ডাটাবেজ প্রোগ্রাম (যেমন- ফক্সপ্রো, এ্যাকসেস) এর সাহায্যে লক্ষ লক্ষ ডাটার ডাটাবেজ তৈরি করে সর্ট বা ইনডেক্স নির্দেশ দিয়ে এক বা একাধিক ফিল্ডের ভিত্তিতে রেকর্ডসমূহকে সর্ট বা ইনডেক্স করা যায়।

রেকর্ডসমূহকে দু'ভাবে সর্ট করা যায়। যেমন :

১। Ascending (উচ্চ ক্রমানুসারে) → ছোট থেকে বড় আকারে

২। Descending (নিম্ন ক্রমানুসারে) → বড় থেকে ছোট আকারে

১০.৫.২ এ্যাক্সেসে ডাটা সাজানো বা সর্টিং করা

ডাটা টেবিলের ডাটাগুলোকে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট আকারে সাজানো যায়। যে ফিল্ডের উপর সর্টিং করতে হবে সেটিকে সিলেক্ট করে –

- Record মেনু থেকে Sort → Ascending এ ক্লিক করলে ডাটাগুলো Ascending order এ সজ্জিত হবে।
- Record মেনু থেকে Sort → Descending এ ক্লিক করলে ডাটাগুলো Descending order এ সজ্জিত হবে।

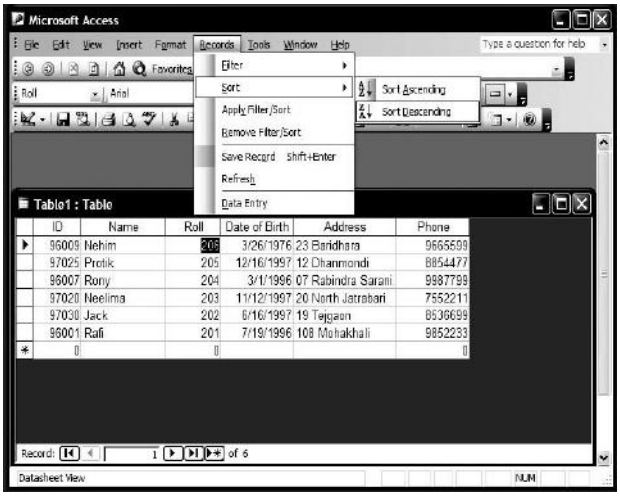

চিত্র ১০.৫.১: Descending

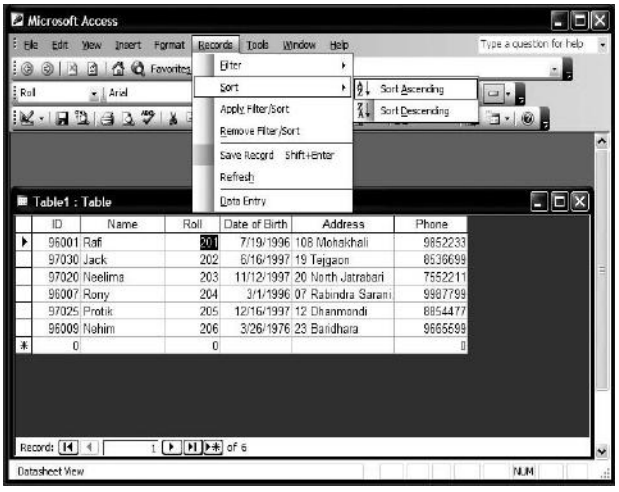

চিত্র ১০.৫.২: Ascending

১০.৫.৩ ইনডেক্সিং

ডাটা ফাইলে ইনপুটকৃত ডাটাকে নির্দিষ্ট নিয়মে সাজানোর পদ্ধতিকে বলা হয় ইনডেক্সিং। কোন ফাইলের ডাটা ইনডেক্স করার অর্থ হচ্ছে সেই ফাইলের রেকর্ডগুলোকে আরোহী (Ascending) বা অবরোহী (Descending) অনুসারে সাজানো। ডাটা ফাইল থেকে কোন নির্দিষ্ট ডাটাকে দ্রুত খুঁজে পাওয়ার জন্য ফাইলের রেকর্ডসমূহকে ইনডেক্স করে রাখতে হয়। সর্ট করে ডাটাবেজের রেকর্ডসমূহকে কোন ফিল্ডের ভিত্তিতে উচ্চক্রমানুসারে অথবা নিম্নক্রমানুসারে সাজানো যায়। তবে-

- সর্ট করা ফাইলকে অন্য নামে ডাটাবেজ ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।
- সাধারণ কী ফিল্ডের উপর ইনডেক্স করা হয়।
- পরবর্তীতে ডাটাবেজের কোন রেকর্ড সংশোধন বা সংযোজন করলে সর্ট করা ফাইলে তা আপডেট হয় না।

সর্ট করার ন্যায় ইনডেক্স করে ডাটাবেজের রেকর্ডসমূহকে উচ্চ বা নিম্নক্রমানুসারে সাজানো যায়। পরবর্তীতে ডাটাবেজের কোন রেকর্ড সংশোধন বা সংযোজন করলে ইনডেক্স করা ফাইলেও তা আপডেট হয়। তাছাড়া ইনডেক্স সর্টের চেয়ে দ্রুততর। সেজন্য বর্তমানে সর্ট না করে ইনডেক্স করেই ডাটাবেজের রেকর্ডসমূহ উচ্চ বা নিম্নক্রমানুসারে সাজানো হয়।

১০.৫.৪ ইনডেক্সিং-এর সুবিধাসমূহ

ইনডেক্সিং-এর মাধ্যমে রেকর্ড সাজানোর সুবিধাগুলো হলো :

১। ডাটা সাজানোর জন্য সময় কম লাগে।
২। ডাটা ফাইলকে ইনডেক্স করার পর নতুন রেকর্ড যুক্ত করা হলে তা নিজে থেকেই সাজানো হয়ে যায়।
৩। ডাটা ফাইলকে ইনডেক্স করার পর একটি ইনডেক্স ফাইল তৈরি হয় এবং মূল টেবিল ফাইল অপরিবর্তিত থাকে।
৪। একাধিক ফাইলের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি সহজ হয়।

১০.৫.৫ ইনডেক্সিং-এর অসুবিধা

ইনডেক্সিং-এর মাধ্যমে রেকর্ড সাজানোর সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও আছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো –

১। ইনডেক্সিং-এর মাধ্যমে রেকর্ডগুলোকে সাজানো হলে মূল টেবিল ফাইল অপরিবর্তিত থাকে ।
২। সর্টেড ডাটাগুলো নিয়ে ইনডেক্স ফাইল তৈরি হয়।
৩। ইনডেক্স ফাইলকে সংরক্ষণ করার জন্য কম্পিউটারের স্মৃতিতে অতিরিক্ত জায়গা লাগে।

১০.৫.৬ ইনডেক্সিং ও সর্টিং-এর পার্থক্যসমূহ

ইনডেক্সিং	সর্টিং
১। এলোমেলো ডাটাকে সুবিন্যস্তভাবে সাজানোর জন্য সময় তুলনামূলকভাবে কম লাগে।	১। এলোমেলো ডাটাকে সুবিন্যস্তভাবে সাজানোর জন্য ইনডেক্সিং-এর চেয়ে সময় বেশি লাগে।
২। এই পদ্ধতিতে ডাটা ফাইলকে ইনডেক্স করার পর নতুন রেকর্ড যুক্ত করা হলে তা নিজ থেকেই সঠিক অবস্থানে বসে।	২। এই পদ্ধতিতে ডাটা ফাইলকে সর্ট করার পর নতুন রেকর্ড যুক্ত করা হলে নতুন করে আবার ফাইলটিকে সর্ট করতে হয়।
৩। ইনডেক্সিং পদ্ধতিতে ডাটা ফাইলকে সর্ট করা হলে মূল টেবিলে ফাইলের রেকর্ডের সিরিয়াল ঠিক থাকে।	৩। সর্টিং পদ্ধতিতে ডাটা ফাইলকে সর্ট করা হলে মূল টেবিল ফাইলের রেকর্ডের সিরিয়াল ঠিক থাকে না।
৪। ডাটা ফাইলকে ইনডেক্স করা হলে নতুন ইনডেক্স ফাইল তৈরি হয় এবং মূল টেবিল ফাইল অপরিবর্তিত থাকে।	৪। ডাটা ফাইলকে সর্ট করা হলে মূল টেবিল ফাইলটিই সর্টেড অবস্থায় স্মৃতিতে জমা হয়।
৫। ইনডেক্সিং-এর মাধ্যমে সর্ট করা অতিরিক্ত ইনডেক্স ফাইল তৈরি হয় বলে স্মৃতিতে অতিরিক্ত জায়গা প্রয়োজন।	৫। সর্টিং-এর মাধ্যমে সর্ট করা হলে মূল টেবিল ফাইল পরিবর্তিত হয় বলে অতিরিক্ত জায়গার প্রয়োজন নেই।

শিক্ষার্থীর কাজ	সর্টিংয়ের চেয়ে কি ইনডেক্সিংয়ে বেশি মেমোরির প্রয়োজন হয়? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

সারসংক্ষেপ

ডাটা টেবিলের ডাটাগুলোকে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট আকারে সাজানো যায়। এই সাজানোর প্রক্রিয়াকে বলা হয় সর্টিং। আবার ডাটাবেজ থেকে ব্যবহারকারী যাতে তাড়াতাড়ি ডাটা খুঁজে বের করতে পারে সেজন্য ডাটাকে একটি বিশেষ অর্ডারে সাজিয়ে রাখা হয়। ডাটাবেজের টেবিলের রেকর্ডসমূহকে এরূপ লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকেই ইনডেক্সিং বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। **ডাটাবেজ টেবিলের রেকর্ডসমূহকে বিশেষ লজিক্যাল অর্ডারে সাজিয়ে রাখাকে কী বলে?**

ক. সর্টিং খ.এডিটিং

গ. ইনডেক্সিং ঘ. সার্চিং

২। **ডাটাবেজে কোনো রেকর্ড সংযোজন ও সংশোধন করলে কি হয়?**

ক. ইনডেক্স ফাইল আপডেট হয় খ. সর্ট করা ফাইল আপডেট হয়

গ. নতুন করে ইনডেক্স করতে হয় ঘ. রেকর্ডগুলোর অ্যাড্রেস সাজানো হয়

পাঠ-১০.৬ ডাটাবেজ রিলেশন, রিপোর্ট তৈরি ও ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ডাটাবেজ রিলেশন কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডাটাবেজের রিলেশন এর প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- রিপোর্ট কি এবং এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডাটাবেজ রিলেশন, রিপোর্ট।

১০.৬.১ ডাটাবেজ রিলেশন

ডাটাবেজের অন্তর্গত একাধিক ডাটা ফাইল থেকে ডাটা নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনে ডাটা ফাইলসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে নিতে হয়। বিভিন্ন ডাটা ফাইল থেকে ডাটা নিয়ে কাজ করার জন্য এরূপ সংযোগ স্থাপন করানোকে ডাটাবেজ রিলেশন বলা হয়। যে সকল ডাটাবেজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে তাতে অন্তত একটি কমন ফিল্ড থাকতে হবে। এ কমন ফিল্ডের উপর ভিত্তি করেই রিলেশন প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে ডাটাবেজের টেবিলসমূহের মধ্যে রিলেশন তৈরির জন্য কিছু শর্ত মেনে রিলেশন তৈরি করতে হয়। এই শর্তগুলো হলো-

১. ডাটা ফাইলগুলোর মধ্যে কমন প্রাইমারি কী ফিল্ড থাকতে হবে।
২. কমন প্রাইমারি কী ফিল্ডের নাম সকল ফাইলে একই হতে হবে।
৩. কমন প্রাইমারি কী ফিল্ডের সাইজ একই হতে হবে।
৪. প্রাইমারি কী ফিল্ডের ডাটা টাইপ সকল ফাইলে একই হতে হবে।

১০.৬.২ রিলেশনের প্রকারভেদ

একাধিক ডাটা ফাইলের মধ্যে উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজনে প্রাইমারি কী ফিল্ডের ভিত্তিতে রিলেশন স্থাপন করা যায়। ডাটাবেজের অন্তর্গত ডাটা ফাইলের মধ্যকার রিলেশনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

- One to One রিলেশন
- One to Many রিলেশন
- Many to One রিলেশন
- Many to Many রিলেশন

One to One রিলেশন

যদি কোন ডাটাবেজের কোন একটি ফাইলের একটি রেকর্ড অপর এক বা একাধিক ফাইলের একটি রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে তবে তাদের মধ্যে যে রিলেশন স্থাপন করা যায় তাকে বলা হয় One to One রিলেশন। যেমন : কলেজ ডাটাবেজের Exam ফাইলের একটি রেকর্ড Personal ফাইলের কেবল একটি রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। নিম্নে তা দেখানো হলো-

Exam File

Name	Roll No	Marks
Sony	1001	75
Jony	1002	85
Moni	1005	88
Rony	1006	81

Student info

Roll No	Phone no
1001	01711213141
1002	01811314151
1005	01911516171
1006	01551617181

চিত্র ১০.৬.১ : One to One রিলেশন

One to Many রিলেশন

যদি কোন ডাটাবেজের কোন একটি ফাইলের একটি রেকর্ড অন্য এক বা একাধিক ফাইলের একাধিক রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে তবে তাদের মধ্যে One to Many রিলেশন তৈরি করা সম্ভব। যেমন- Business Center নামক ডাটাবেজের বিক্রেতাদের তথ্যের জন্য Sales ফাইলের একটি রেকর্ড, ক্রেতাদের তথ্যের জন্য ব্যবহৃত Customer ফাইলের একাধিক রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। কারণ একজন বিক্রেতা একাধিক ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করে থাকে। নিম্নে Sales File এবং Customer ফাইলের মধ্যে One to Many রিলেশন দেখানো হলো :

Sales File

Sales Person Id. No	Name	Address
101	Tasif	U.K
102	Rume	Bangladesh
103	Joha	U.S.A

Customer File

Sales Person Id. No	Customer Name	Amount
101	Jakir	5000
102	Kalam	30000
101	Salim	5000
101	Abid	5000
102	Adil	10000

চিত্র ১০.৬.৩ : One to Many রিলেশন

Many to One রিলেশন

এই রিলেশন হচ্ছে One to Many রিলেশনের বিপরীত। যদি কোন একটি ফাইলের একাধিক রেকর্ড অপর এক বা একাধিক ফাইলের একটি রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তখন তাদের মধ্যকার রিলেশনকে Many to One রিলেশন বলা হয়। যেমন- Home ডাটাবেজের Child ফাইলের একাধিক রেকর্ড Parent ফাইলের একটি রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। ফলে Child এবং Parent ফাইলের মধ্যে প্রয়োজনে Many to One রিলেশন তৈরি করা যায়। নিম্নে তা দেখানো হলো-

Child File

Name	Id No.	Father's Id
Jarin	101	201
Mant	102	202
Tasif	103	201
Rukiga	104	201
Rahat	105	202

Parent File

Father's Id. No	Name	Address
201	Abul	Dhaka
202	Khayer	Rangpur

চিত্র ১০.৬.৪ : Many to One রিলেশন

Many to Many রিলেশন

যদি কোন ডাটাবেজের অন্তর্গত একাধিক ডাটা ফাইলের প্রত্যেকটির একটি রেকর্ড অপর কোন ফাইলের একাধিক রেকর্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তবে তাদের মধ্যে যে রিলেশন সৃষ্টি হয় তাকে Many to Many রিলেশন বলা হয়। Many to Many রিলেশন তৈরি করতে হলে তৃতীয় একটি টেবিল তৈরি করতে হয়। এই তৃতীয় টেবিলটিকে জাংশন টেবিল বলা যায়। জাংশন টেবিলটি One to Many এর মতো কাজ করে।

চিত্র ১০.৬.৫ এ শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট Table এবং বিষয় তথ্য Table এর মধ্যে Many to Many রিলেশন তৈরি করতে বিষয়ভিত্তিক রেজাল্ট Table নামে একটি জাংশন টেবিল তৈরি করা হয়েছে। এখানে জাংশন টেবিলের রিলেশন One to Many এর মত কাজ করবে।

রোল নম্বর	গ্রুপ	জিপিএ
১০০১	বাণিজ্য	৫
১০০২	বিজ্ঞান	৪.৫
১০০৩	বাণিজ্য	৪
১০০৪	মানবিক	৪

শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট

বিষয় কোড	বিষয়
১০১	বাংলা
২০১	ইংরেজি
২৭৫	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
১৩৭	হিসাববিজ্ঞান

বিষয় তথ্য

রোল নম্বর	বিষয় কোড	জিপিএ
১০০১	১০১	৪
১০০১	২০১	৩.৫
১০০২	১০১	৫
১০০২	১৩৭	৪

বিষয়ভিত্তিক রেজাল্ট

চিত্র ১০.৬.৫ : Many to Many রিলেশন

১০.৬.৩ রিপোর্ট তৈরি করা

ডাটাবেজ থেকে প্রয়োজনীয় ডাটাসমূহ প্রতিবেদন আকারে প্রদর্শনকে রিপোর্ট বলে। রিপোর্টে ডাটাসমূহকে আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা যায়।

রিপোর্টের ব্যবহার:

- ডাটাবেজ হতে প্রয়োজনীয় ডাটা প্রদর্শন।
- হিসাব নিকাশের ফলাফল দেখানো।
- চার্টে ফলাফল উপস্থাপন।

১০.৬.৪ অটো রিপোর্ট তৈরি করা

অটো রিপোর্ট তৈরি করতে নিচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে-

- প্রথমে প্রয়োজনীয় ডাটাবেজ Open করতে হবে। (এখানে Student নামক ডাটাবেজটি Open করা হয়েছে)
- Reports Tab- এ ক্লিক করে প্রয়োজনীয় টেবিল সিলেক্ট করতে হবে।
- Reports Tab- এ ক্লিক করে New বাটনে ক্লিক করতে হবে ।
- Report Wizard সিলেক্ট করে Table বক্সে Table 1 সিলেক্ট করে OK বাটনে ক্লিক করতে হবে ।



চিত্র ১০.৬.৬ : Reports Tab

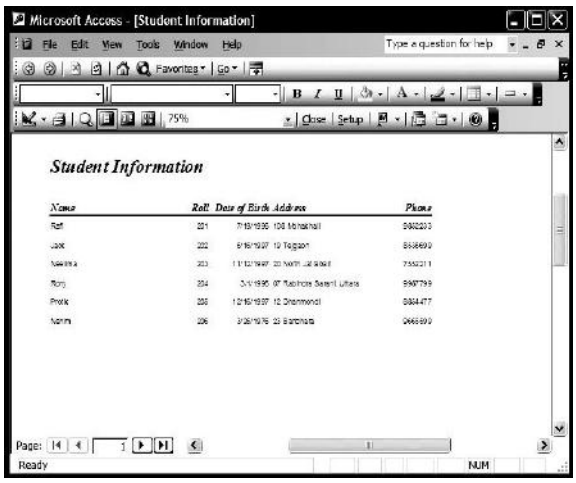

চিত্র ১০.৬.৭ : রিপোর্ট

- সবগুলো ফিল্ডে Selected Fields বক্সে এনে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে ।
- Next বাটনে ক্লিক করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না Report title বক্স না আসে।
- Report title বক্সে Student information টাইপ করতে হবে ।
- এখন Table 1-টেবিলের ডাটা নিয়ে Student information নামে একটি রির্পোট তৈরি হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জেনারেল হাসপাতাল ডাটাবেজে রোগীদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য দুটি ডাটা টেবিল ব্যবহার করে। একটিতে রোগীর নাম, মোবাইল নাম্বার, জন্মতারিখ এবং অন্যটিতে মোবাইল নাম্বার, রোগের বর্ণনা, ব্যবস্থাপত্র, ফিস সংরক্ষিত থাকে। টেবিল দুটির মধ্যে রিলেশন তৈরি সম্ভব কিনা-যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

সাধারণ অর্থে রিলেশন বলতে সম্পর্ক বুঝায়। একটি ডাটা টেবিলের সাথে অন্য এক বা একাধিক ডাটা টেবিলের ডাটার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করাকে রিলেশন বলে। একাধিক ডাটাবেস থেকে ডাটা নিয়ে কাজ করার প্রয়োজনে ডাটাবেস সমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে নিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ডাটাবেজের অন্তর্গত ডাটা ফাইলের মধ্যকার রিলেশনকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

২। ফরমেটেড রিপোর্টে কি কি থাকে?

ক) Report Header খ) Details
গ) Report Footer ঘ) সবগুলোই

পাঠ-১০.৭ কর্পোরেট ডাটাবেজ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কর্পোরেট ডাটাবেজের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজ এবং এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কর্পোরেট ডাটাবেজ

১০.৭.১ কর্পোরেট ডাটাবেজ

কর্পোরেট ডাটাবেজ হচ্ছে কোনো শিল্প/প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল ধরনের উদ্যোগ ও কাজ সম্পর্কিত তথ্য। এতে কোনো ব্যবসায়ের সমস্ত কার্যকলাপের তথ্য থাকে। এখানে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যও থাকে। বড় বড় ব্যাংক, শিল্প-কলকারখানা, সরকারে-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আন্ত:যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এক ধরনের ডাটাবেজ সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে। এ ধরনের ডাটাবেজ সফ্টওয়্যারকে কর্পোরেট ডাটাবেজ বলে। কর্পোরেট ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক ভিত্তিক হয়ে থাকে। ফলে সহজে প্রধান সার্ভার ডাটাবেজের সাথে সাব-অফিসগুলো যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে।

কর্পোরেট ডাটাবেজের ব্যবহার

- বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান যেমন শিল্প-কারখানায় উৎপাদন, মজুদ পরিমাণ, স্টোর ইত্যাদি বিশ্লেষণের জন্য এ ধরনের ডাটাবেজ ব্যবহার করা হয়।
- কলকারখানায় আয়-ব্যয় হিসেবের জন্যও ব্যবহার করা হয়।
- কলকারখানায় চাহিদা-অর্ডার বিশ্লেষণের জন্য ।
- বিভিন্ন দেশের বিমানের রির্জাভেশন ও সিডিউলিং ইত্যাদির তৈরির ক্ষেত্রে ।
- কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য; ইত্যাদি।

১০.৭.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডাটাবেজ

শক্তিশালী সরকার পরিচালনায় ডাটাবেজ ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সরকারের অনেক মন্ত্রণালয় থাকে। এসব মন্ত্রণালয় যাবতীয় কাজ ডাটাবেজ দ্বারা পরিচালনা করলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। এছাড়া তথ্য ব্যবস্থাপনাও অনেক সহজ ও সুন্দর হবে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ডাটাবেজ ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশও অনেক ব্যাংক অন লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা চালু করায় ডাটাবেজ ব্যবহারের গুরুত্ব বেড়েছে। অন লাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যে কেউ যে কোনো শাখা থেকে ATM (Autometted Tellen Machine) বুথের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করতে পারছে।

১০.৭.৩ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডাটাবেজের ব্যবহার:

সাধারণত সরকারি প্রতিষ্ঠানে যে সব কাজে ডাটাবেজ ব্যবহার করা হয় তা হলো-

- তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে নাগরিকদের ভোটার আইডি সংরক্ষণে।
- শিক্ষার হার, পাসের হার ইত্যাদি সংরক্ষণে।
- ভূমি জরিপ ও নানা ধরনের রেকর্ড সংরক্ষণে।
- দুর্ঘটনার জরিপ সংরক্ষণে।
- জন্মহার ও মৃত্যুহার রেকর্ড সংরক্ষণে।
- জেলা বা থানার বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণে।

- আয়কর, আমদানি, রপ্তানির হিসাব ইত্যাদি সংরক্ষণে।
- আদমশুমারি ও কৃষিশুমারির তথ্য সংরক্ষণে।
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তথ্য সংরক্ষণে; ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সংক্রান্ত ও পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্য অন-লাইনের মাধ্যমে প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এখানে কোন ধরনের ডাটাবেজের ব্যবহার করা হয়েছে-ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বলতে মূলত বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেমন-ব্যাংক, বীমা, মোবাইল কোম্পানি, সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং বা ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবস্থায় বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাদের কেন্দ্রিয় অফিসের সাথে শাখা অফিসসমূহের সমন্বয়, বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং ডাটা আদান প্রদানের জন্য যে বিশেষ ডাটাবেজ সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে তাকে কর্পোরেট ডাটাবেজ বলে। কর্পোরেট পর্যায়ের ডাটাবেজ তৈরির জন্য ব্যবহৃত জনপ্রিয় ডাটাবেজ সফ্টওয়্যারগুলো মধ্যে উল্ল্যেযোগ্য হলো: Oracle, SQl Server, MySQL, Teradata, FileMaker, MS-Access, Informix ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কর্পোরেট ডাটাবেজ এর ব্যবহার কোথায়?

ক) শিল্প-কারখানা
খ) কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান
গ) কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
ঘ) সবগুলোই

২। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডাটাবেজ এর ব্যবহার হতে পারে-

i. ভূমি জরিপে
ii. আদমশুমারিতে
iii. কৃষিশুমারিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১০.৮ ডাটা সেকিউরিটি ও ডাটা এনক্রিপশন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ডাটা সেকিউরিটি কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ডাটা এনক্রিপশন সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ডাটা এনক্রিপশন , ডাটা সেকিউরিটি ।

১০.৮.১ ডাটা সিকিউরিটি

অননুমোদিত ব্যক্তির (unauthorized) হাত থেকে ডাটাকে মুক্ত রাখার পদ্ধতিকে বলা হয় ডাটা সিকিউরিটি। ডাটা একদিকে যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্যদিকে এর গোপনীয়তা রক্ষা করাও জরুরি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের সময় অথবা অন-লাইন ব্যাংকিং-এর সময় কম্পিউটার হ্যাকাররা ব্যাংকের গ্রাহকদের একাউন্ট সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় জেনে নিতে পারে। ফলে অন-লাইন ব্যাংকিং-এ অনেক ব্যবহারকারী নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। অনেক সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানের ডাটা সুরক্ষা করা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যও একান্ত প্রয়োজন। ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডাটার গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। সর্বোপরি ই-কমার্সের সুবিধা বজায় রাখার জন্য ডাটা সিকিউরিটি অতীব জরুরি। ডাটা সিকিউরিটি দু প্রকার। যথা-

১। **সিস্টেম সিকিউরিটি :** ব্যবহারকারীর নাম ও পাসওয়ার্ড পরীক্ষা করা এবং তার জন্য বরাদ্দ জায়গা পরীক্ষা করা ইত্যাদি সিস্টেম সিকিউরিটির অংশ।

২। **ডাটা সিকিউরিটি :** একজন ব্যবহারকারী কোন কোন অবজেক্ট ব্যবহার করতে পারবে, তা পরীক্ষা করা ডাটা সিকিউরিটির অংশ। ডাটা সিকিউরিটিতে যে বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়, সেগুলো হচ্ছে–

ক. অনুমোদিত নয় এমন ব্যবহারকারী কর্তৃক ডাটাবেজ ব্যবহার রোধ করা।
খ. রিসোর্স ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
গ. ডিস্ক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
ঘ. ব্যবহারকারীর কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করা।

উপাত্ত স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে ডিস্ট্রিবিউটেড ডাটাবেজের ক্ষেত্রে যা বিভিন্ন ভৌগোলিক দূরত্বে অবস্থান করে।

১০.৮.২ ডাটা এনক্রিপশন

ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডাটাকে উৎস হতে গন্তব্যে প্রেরণের পূর্বে যে বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয় তাকে ডাটা এনক্রিপশন পদ্ধতি বলা হয়। ফলে প্রেরকের প্রেরিত ডাটা অন্য কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে সুবিধা পায় না। উৎস বা প্রেরক ডাটাকে এনক্রিপ্ট করে 'মাধ্যমের' ভেতর দিয়ে পাঠালে প্রাপক বা গন্তব্য ঐ এনক্রিপ্টেড ডাটা ব্যবহারের পূর্বে ডিক্রিপ্ট করে। প্রেরক কম্পিউটারে এনক্রিপ্ট করার নিয়ম বা প্রাপক কম্পিউটারে ডিক্রিপ্ট করার নিয়ম দেয়া থাকে। এনক্রিপ্ট এবং ডিক্রিপ্ট করার জন্য নির্দিষ্ট এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার ব্যবহৃত হয়। ডাটা এনক্রিপ্ট করার জন্য বহুল ব্যবহৃত দুটি স্ট্যান্ডার্ডের নাম নিম্নে দেয়া হল। যথা-

১। সিজার কোড (Caesar Code) ও
২। ডাটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড (Data Encryption Standard–DES)

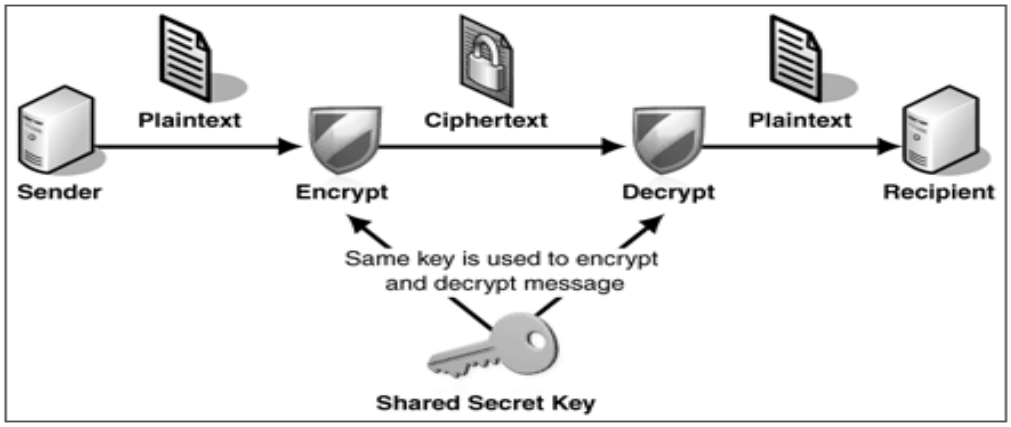

চিত্র ১০.৮.১ : ডাটা এনক্রিপশন ও ডিক্রিপশন

ডাটা এনক্রিপশনের মূল অংশ চারটি। যথা-

- প্লেইন টেক্সট: যে ডাটা সাধারণভাবে করা যায়।
- সাইফার টেক্সট: মূল মেসেজ কে এনক্রিপট করার পর প্রাপ্ত টেক্সট। এনক্রিপশনের ফলে টেক্সটটা দূর্বোধ্য হয়ে যায়।
- এনক্রিপশন এলগরিদম: গাণিতিক ফর্মূলা যা মেসেজ এনক্রিপট করার সময় ব্যবহার করা হয়।
- কী: গোপন কোড যা এনক্রিপট না ডিক্রিপট করার কাজে ব্যবহার করা হয়। সাইফার টেক্সটকে প্লেইন টেক্সটে ফিরিয়ে আনার একটি প্রক্রিয়া।

শিক্ষার্থীর কাজ	শাহরিয়ার সাহেবর অফিসে দেশে–বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে তাঁর তথ্যসমূহ সংরক্ষিত হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি যেন তার তথ্যগুলো দেখতে না পায় সেজন্য তিনি একটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শাহরিয়ার সাহেব কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপটির প্রয়োজনয়িতার ওপর আপনার মতামত তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

ডাটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডাটাকে উৎস হতে গন্তব্যে প্রেরণের পূর্বে যে বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয় তাকে ডাটা এনক্রিপশন পদ্ধতি বলা হয়। খুব সংবেদনশীল ডাটার ক্ষেত্রে ডাটাবেজ প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মনে হয় না। এক্ষেত্রে ডাটা এনক্রিপ্ট করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উপযুক্ত ডিসাইফার কোড বা ডিক্রিপ্ট পদ্ধতি জানা না থাকলে ঐ ডাটা কেউ অ্যাকসেস করতে পারবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ডাটাকে উৎস হতে গন্তব্যে প্রেরণের পূর্বে যে বিশেষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা হয় তাকে কি বলে?

ক) এনক্রিপশন খ) ডিক্রিপশন
গ) প্লেইন টেক্সট ঘ) সাইফার টেক্সট

২। ডাটা এনক্রিপশনের মূল অংশ কতটি?

ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

পাঠ-১০.৯ ব্যবহারিক (Practical)

ব্যবহারিক ১: MS-Access ব্যবহার করে ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ।

তত্ত্ব

মাইক্রোসফ্ট এ্যাক্সেস একটি ডাটাবেজ প্রোগ্রাম। এটি ব্যবহার করে ডাটাবেজ তৈরি করা, ফর্ম তৈরি করা, রির্পোট তৈরি করা, শর্তানুযায়ী কুয়েরি করা এবং এ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়।

যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঃ

যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্বাচন বা সিলেক্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে হার্ডওয়্যারের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যারও নির্বাচন করতে হয়।

হার্ডওয়্যার ঃ একটি কম্পিউটার।
সফ্টওয়্যার ঃ অপারেটিং সিস্টেম : Windows XP বা Windows 7 ।
এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার : মাইক্রোসফ্ট অফিস এ্যাক্সেস ২০০৭।

উপরিউক্ত পরীক্ষণটি সম্পন্ন করার জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে-

১. Computer এর Power Connection ভাল ভাবে Check করে CPU এর Power ON করতে হবে।
২. কিছুক্ষণের মধ্যেই Microsoft Windows এর ডেস্কটপ চলে আসবে।
৩. মাইক্রোসফ্ট অফিস (Microsoft Office) ইনস্টল আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে।
৪. মাইক্রোসফ্ট অফিস এর মাইক্রোসফ্ট অফিস এ্যাক্সেস ২০০৭ (Microsoft Office Access-2007) প্রোগ্রামটি চালু করতে হবে।
৫. পরীক্ষণটির কার্যক্রম সম্পন্ন হলে চালুকৃত প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামসমূহ বন্ধ করতে হবে এবং যথানিয়মে কম্পিউটারটি বন্ধ বা শাট ডাউন করতে হবে। প্রয়োজনে বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন করতে হবে।

ফলাফল উপস্থাপন ঃ

(১) প্রক্রিয়া অনুসরণ ঃ

উপরিউক্ত পরীক্ষণটির কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে-

১। ডেস্কটপের স্টার্ট বাটনে ক্লিক করে all programs ক্লিক করলে নতুন একটি মেনু আসবে, যেখানে অনেকগুলো অপশন থাকবে।

২। মাইক্রোসফ্ট অফিস হতে মাইক্রোসফ্ট অফিস এ্যাক্সেস ২০০৭ এ ক্লিক করলে এ্যাক্সেল প্রোগ্রামটি রান হবে। যা নিম্নরূপ-



চিত্র ১ : মাইক্রোসফ্ট অফিস এক্সেস ২০০৭ এর উইন্ডো

সংক্ষেপে ঃ Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

৩। Blank Database আইকন ক্লিক করলে একটি ডায়লগ বক্স আসবে।

৪। ডায়লগ বক্সের ফাইল নেম (File Name) ঘরে ডাটাবেজের জন্য একটি নাম টাইপ করে create বাটনে ক্লিক করলে ডাটাবেজটি উক্ত নামে সংরক্ষিত হবে।

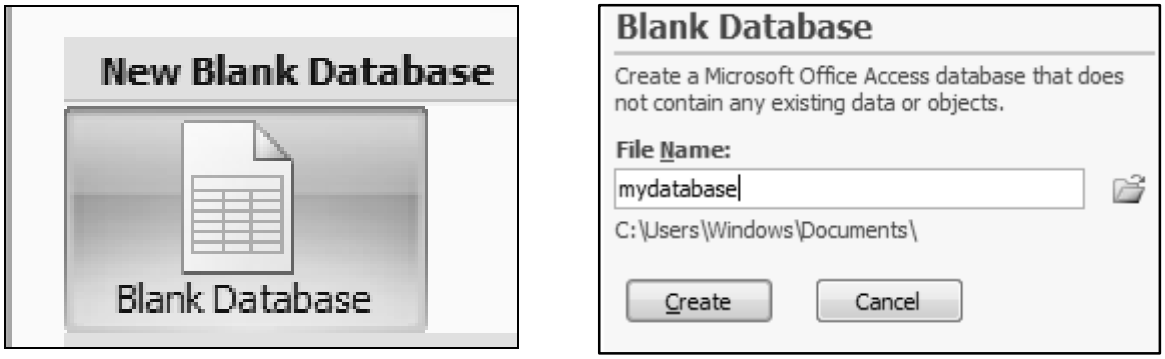

চিত্র ২

(২) ব্যাখ্যা ঃ

মাইক্রোসফ্ট এ্যাক্সেস প্রোগ্রামটি অন্যান্য ডাটাবেজ প্রোগ্রামের চেয়ে বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা প্রদান করে। Ms-Access Windows ভিত্তিক একটি শক্তিশালী রিলেশনাল ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যা দিয়ে ডাটাবেজের বিভিন্ন টেবিল, কুয়েরি, রিপোর্ট, ডাটা এন্ট্রি ফর্ম ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

(৩) ফলাফল ঃ

তৈরিকৃত ডাটাবেজটি নির্দিষ্ট লোকেশন হতে ওপেন করলে অথবা নির্দিষ্ট লোকেশনে প্রবেশ করে তৈরিকৃত ডাটাবেজটির সংরক্ষিত নামের উপর ডবল ক্লিক করলে Database Window পাওয়া যাবে (চিত্র ৩)।

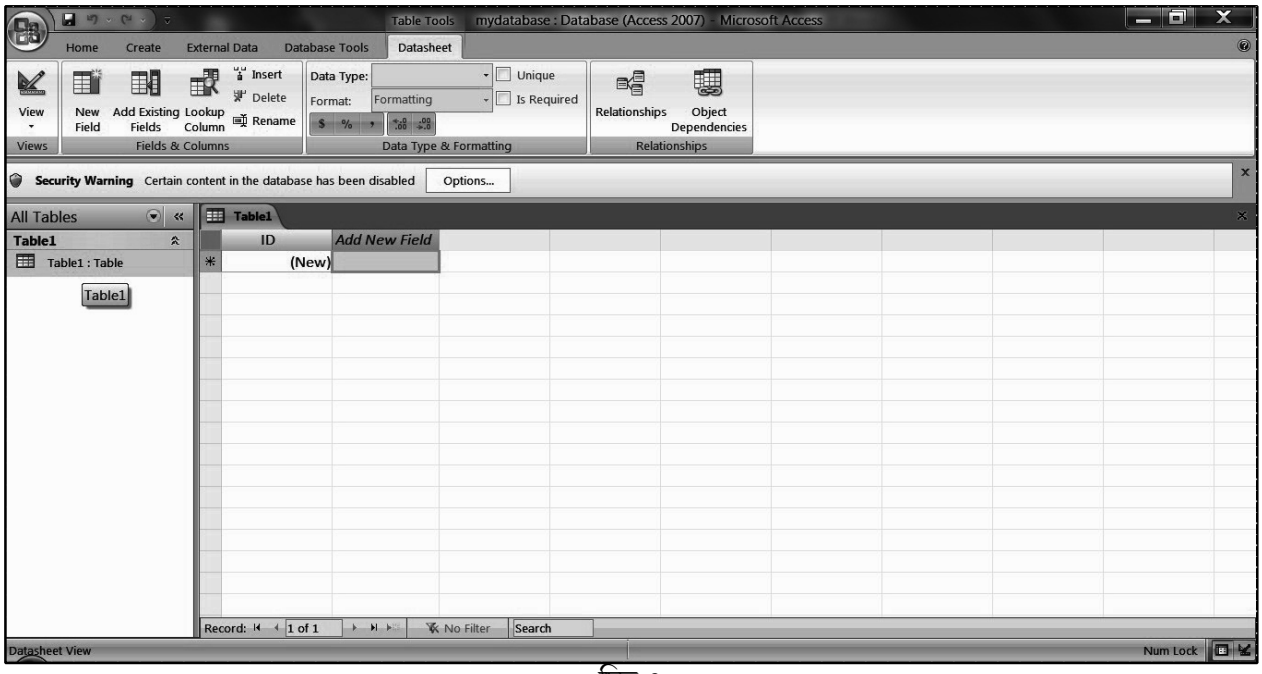

চিত্র ৩

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ১০

ক. জ্ঞান দক্ষতা স্তর

১। ডাটাবেজ কী?

২। ডাটাবেজ রিলেশন কী?

৩। কুয়েরি কী?

৪। এনটিটি কী?

৫। ডাটাবেস সিকিউরিটি কী?

৬। প্রাইমারি কী ফিল্ড কী?

খ. অনুধাবন দক্ষতা স্তর

১। ডাটা এনক্রিপশনের অংশগুলো ব্যাখ্যা করুন।

২। রেকর্ড অনুসন্ধানে প্রাইমারি কী ফিল্ডের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

৩। ডেটা সুরক্ষার পদ্ধতি-ব্যাখ্যা করুন।

৪। "প্রাইমারি কী ও ফরেন কী এক নয়"-বুঝিয়ে বলুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বর্ণ বা সংখ্যার অনুক্রম হিসেবে তথ্য বাছাই বিন্যাসকে বলা হয়-

ক. Arrange খ. Search

গ. Sort ঘ. Distribution

২। Encrypted ডাটাকে কে Decrypt করতে পারে?

ক. বৈধ ব্যবহারকারী খ. অবৈধ ব্যবহারকারী

গ. সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারী ঘ. সকল database ব্যবহারকারী

৩। Date/Time জাতীয় ডাটা কোনটি?

ক. Salary খ. Serial No

গ. Numeric ঘ. Date of Birth

৪। কোনটি Memo জাতীয় ডাটা?

ক. Description খ. Salary

গ. Date of Birth ঘ. Address

৫। DDL এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক. Data Design Language খ. Data Defination Language

গ. Data Domain Limit ঘ. Direct Data Limit

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। SQL এর ভাগ হলো—

i. DDL
ii. DML
iii. DQL
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। Entity এর অন্তর্ভুক্ত—

i. সত্তা
ii. জিনিস
iii. বিষয়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii ও iii

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১ ও ২ প্রশ্নের উত্তর দিন:

৪০ জন ছাত্র এবং ৬০ জন ছাত্রীর রেকর্ড রয়েছে। প্রত্যেক রেকর্ডে একটি ডেটাবেজে রোল, নাম, জন্মতারিখ এবং GPA নামক চারটি ফিল্ড রয়েছে।

১। উদ্দীপকে কতটি রেকর্ড এর উল্লেখ রয়েছে?

ক. ৪ খ. ৪০
গ. ৬০ ঘ. ১০০

২। প্রাইমারি কী হিসেবে কোনটি ব্যবহৃত হতে পারে?

i. Roll
ii. Name
iii. GPA
নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন:

একটি কলেজের ফলাফলের ডেটাবেজ থেকে একজন শিক্ষার্থীর তথ্য খোঁজার জন্য তিনজন ছাত্রকে নির্দেশ দেয়া হল। ১ম ছাত্র শর্ত সাপেক্ষে কমান্ড দিয়ে, ২য় ছাত্র ডেটাবেজের টেবিলের তথ্য সাজিয়ে এবং ৩য় ছাত্র ২য় ছাত্রের চেয়ে দ্রুততর কৌশল প্রয়োগে তথ্য খুঁজে বের করে।

ক. ডেটা এনক্রিপশন কী? ১
খ. জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সংবলিত ডেটাবেজের ধরণ ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রে ২য় ছাত্রটির কৌশল বর্ণনা করুন। ৩

ঘ. ১ম ও ৩য় ছাত্রের কৌশল দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? বিশ্লেষণপূর্বক আপনার মতামত দিন। ৪

২। উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ

Roll	Name	DOB
1001	Sawpnil	21-03-1998
1002	Tuhin	10-02-1999
1003	Tonmoy	19-03-2000

টেবিল-A

Roll	Fees	Remarks
1001	1570.00	Paid
1002	1300.00	Paid
1003	780.00	Due

টেবিল-B

ক. SQL কী? ১

খ. ইনডেক্স করা ফাইলে ডাটা এন্ট্রি করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়- বুঝিয়ে লিখুন। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত টেবিল-A এর ফিল্ডগুলোর ডাটা টাইপ বর্ণনা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত টেবিলদ্বয়ের মধ্যে কোন ধরনের রিলেশন তৈরি সম্ভব? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ইউনিট ১০

পাঠ - ১০.১ ১ ক ২ ঘ
পাঠ - ১০.২ ১ খ ২ ক
পাঠ - ১০.৩ ১ ঘ ২ ঘ
পাঠ - ১০.৪ ১ ঘ ২ খ
পাঠ - ১০.৫ ১ গ ২ ক
পাঠ - ১০.৬ ১ ক ২ গ
পাঠ - ১০.৭ ১ ঘ ২ ঘ
পাঠ - ১০.৮ ১ ক ২ গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

ক. সাধারণ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ গ ২ ক ৩ ঘ ৪ ক ৫ খ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ ক ২ ঘ

গ. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ গ ২ ঘ